মহাকাশের ঠিকানা

মহাকাশের ঠিকানা

অমল দাশগুপ্ত

লেখাপড়া । কলকাতা

উৎসর্গ

মহাকাশের প্রথম বাঙালী অভিযাত্রীকে

লেখকের নিবেদন

এই বইটির প্রথম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় (১৩৬২) তখন মহাকাশ-গবেষণা ও নভশ্চারণার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই বাংলায় সম্ভবত ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে বইয়ের তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। তারপরে নানা কারণে বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এই বিশেষ বইটির জন্য একটানা একটা চাহিদা থেকেই গিয়েছে। এতদিনে নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশিত হল।

কিন্তু পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে গিয়ে বোঝা গেল, পুরনো বইয়ের কিছুই রাখা চলে না। কয়েক বছরের মধ্যে মহাকাশ-গবেষণা এতই অগ্রসর যে পুরনো অনেক ধারণা বাতিল হয়েছে, প্রচুর অকল্পিতপূর্ব তথ্য জানা গিয়েছে। অতএব বইটি প্রায় নতুন করেই লিখতে হল।

সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি মহাকাশ গবেষণার সর্বশেষ অনুসন্ধান পর্যন্ত লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বইটিকে সর্বাধুনিক করে তুলতে—অবশ্যই শুধু বিবরণ দিয়ে নয়, তার কৃৎকৌশলের দিকটিও বিশদ করে তুলে। আশা রাখি, এই বইটি পড়ে পাঠক বিশ্ব ও মহাবিশ্বের আধুনিকতম রূপটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন এবং মহাকাশ-গবেষণা ও নভশ্চারণার শেষতম খবর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ জানতে পারবেন। এই আশা যদি পূরণ হয় তাহলেই লেখকের শ্রম সার্থক।

অমল দাশগুপ্ত

লেখকের অন্যান্য বিজ্ঞানের বই

মানুষের ঠিকানা।
পৃথিবীর ঠিকানা।
প্রাণের ইতিবৃত্ত।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

ভ্রম-সংশোধন

পৃঃ	লাইন	আছে	হবে
১৬২	২১	৩২ কোটি	২২ কোটি
১৬৩	২৩	১২,৭৫৬	১২,৭৫৭
১৮৩	২০	৮৩ লক্ষ ৪০ লক্ষ	৮৩ লক্ষ
১৯২	১৫	৯৬ লক্ষ	৯৭ লক্ষ

প্রথম খণ্ড

ইতিহাসের পথ

সূর্য বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং সূর্য স্থিতিশীল—এই বক্তব্য উদ্ভট, দার্শনিক বিচারে মিথ্যা ; এবং যেহেতু এই বক্তব্য ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্যের সরাসরি বিরোধী এতএব স্পষ্টতই ঈশ্বরবিরোধিতা।

পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয় এবং স্থিতিশীল নয়, এবং বার্ষিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আহ্নিক গতিও আছে—এই বক্তব্যও সমান উদ্ভট ও মিথ্যা···

গ্যালিলিওর বিচারে কার্ডিনালের রায়

আকাশের দিকে তাকিয়ে, আকাশভরা সূর্যতারার দিকে তাকিয়ে, আমরা কে-না অবাক হই ! তবে আমাদের অবাক হওয়াটা আগেকার কালের মানুষের মতো না-জেনে নয়, অনেকখানি জেনে। আমাদের চোখের ওপরেই গাগারিন থেকে স্ট্যাফর্ড পর্যন্ত এই পৃথিবীর শতাধিক মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন। চাঁদের মাটিতে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েছে, চাকাওলা যান চলেছে। মঙ্গল ও শুক্রের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে ভেনেরা ও মার্স, মেরিনার ও ভাইকিং পাঠিয়ে। এই দুটি গ্রহেও আগামী শতকের গোড়ার দিকেই মানুষের যাত্রা শুরু হবার সম্ভাবনা। এমনি চলতে চলতে একদিন তারার দেশেও মানুষের যাত্রা শুরু হতে পারে। তবুও আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক হই।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখনো সে আকাশ দেখে অবাক হত। কিন্তু সেই অবাক হওয়ার মধ্যে ছিল অনেকখানি ভয় ও আশঙ্কা। প্রাকৃতিক কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যা তার জানা ছিল না। সে ছিল অসহায় দর্শক মাত্র। অথচ সে বুঝতে পারত যে প্রকৃতি সদয় হলে পরেই তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব। যে রোদ ও

বৃষ্টির জন্য জমির ফলন, তারই জন্য খরা ও বন্যা। যেন একটা অমোঘ শক্তি কখনো তার ওপরে তুষ্ট, কখনো রুষ্ট। এই অমোঘ শক্তিকেই সে দেবতা বলে মেনে নিয়েছিল। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-বাতাস, সবকিছুকেই সে দেবতাজ্ঞানে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল। এ-থেকেই নানা ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলন, যাকে বলা হয় ম্যাজিক বা জাদুক্রিয়া। আমাদের দেশের যাগযজ্ঞের সূত্রপাতও এইভাবে। এমনিভাবে মানুষের কাছে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা হয়ে উঠেছিল এক-একজন দেবতা। তার কল্পনায় এই আকাশের ওপরেই ছিল দেবলোক বা স্বর্গ। নানা কাহিনী মুখে মুখে তৈরি হয়েছিল দেবতাদের নিয়ে। আকাশের তারায় তারায় ছবি এঁকে সে ভাবতে পারত,দেব-কাহিনীর অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। এমনি-ভাবে আকাশের তারার নামকরণে ও সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার ব্যাখ্যায় এক-একটি দেশের দেবদেবীদের নিয়ে তৈরি করা অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

বিশ্বের রূপ

কিন্তু এই দেবদেবীদের জগতেও প্রত্যেকের চলাফেরা কড়াকড়ি নিয়মে বাঁধা। দিনের পরে রাত্রি, শীতের পরে গ্রীষ্ম, পূর্ণিমার পরে অমাবস্যা —প্রত্যেকটি ঘটনাই ঠিক-ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক ভাবে ঘটে যাচ্ছে। কোনো অনিয়ম নেই, কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। যেন সকলের মাথার ওপরে একজন বিধাতা রয়েছেন, তাঁর নিয়মের রাজত্বে কোনো বেচাল নেই।

এই নিয়মের রাজত্বটির রূপ কেমন ? এই ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। সেকালের মানুষের হাতে দূরবীন ছিল না, শুধু চোখের দেখাই নির্ভর। তারই ওপরে ভিত্তি করে প্রাচীন ব্যাবিলনে, মিশরে, চীনে ও ভারতবর্ষে বিশ্বের রূপ সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা হয়েছিল।

ব্যাবিলনীয়রা ভাবত, এই বিশ্ব একটা শামুকের মতো, কঠিন মোড়কে ঢাকা। ওপরে জল, নিচে জল। শামুকটি আকারে গোল,

তার কেন্দ্রে রয়েছে ফাঁপা পর্বতের মতো এই পৃথিবী। পৃথিবী জলে ভাসছে। পৃথিবীর ওপরে রয়েছে কঠিন একটি গোলক, জলে ঢাকা। পৃথিবীর নিচের জল ফোয়ারা ও ঝরনা হয়ে উঠে আসে। পৃথিবীর ওপরের জল গোলকের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। গোলকে আছে দুটি দরজা—একটি পুবের, অপরটি পশ্চিমের। সূর্য, চন্দ্র ও তারা পুবের দরজা দিয়ে ঢোকে, পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মিশরীয়রা ভাবত, এই বিশ্ব একটা চৌকোনা বাক্সের মতো। বাক্সের মেঝে হচ্ছে পৃথিবী। আর আকাশ? আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর চার কোণে চারটি পা রেখে দাঁড়ানো একটি গোরু, বা, দুটি কনুই ও দুটি হাঁটু রেখে উবু হয়ে থাকা একটি রমণী, বা, লোহার পাতের গোল একটি ঢাক্না। বাক্সের ভিতরের দিকে দেওয়ালে রয়েছে একধরনের থাক্-দেওয়া গ্যালারি। এই গ্যালারি দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী। সূর্যদেবতা ও চন্দ্রদেবতা এই নদীর ওপর দিয়ে পানসি ভাসিয়ে যান। তাঁদের আসা ও যাওয়ার জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দরজা। স্থির নক্ষত্র-গুলো হচ্ছে বাতি, গোলক থেকে ঝোলানো বা এক-একজন দেবতার হাতে ধরা। গ্রহগুলো চলেছে নৌকো ভাসিয়ে, এক-একটি খালের ওপর দিয়ে। খালগুলো বেরিয়েছে আকাশরাজ্যের নীলনদ ছায়াপথ থেকে (ছায়াপথকে ভারতবর্ষে বলা হত আকাশগঙ্গা)। প্রতি মাসের পনেরো তারিখ নাগাদ চন্দ্রদেবতা হিংস্র এক শূকরীর দ্বারা আক্রান্ত হন। এই শূকরী পনেরো দিন ধরে একটু একটু করে চন্দ্রদেবতাকে গ্রাস করে। কখনো কখনো পনেরো দিনের তর সয় না, আস্তই গ্রাস করে বসে—তখন চন্দ্রগ্রহণ। তেমনি মাঝে মাঝে সূর্যকে গ্রাস করে একটি সাপ—তখন সূর্যগ্রহণ।

হিন্দুরা ভাবত বাসুকি নামে একটি সাপ তার ফণার ওপরে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। চন্দ্রগ্রহণ হয় রাহু নামে একটি রাক্ষসের গ্রাসে। চন্দ্রের কলা প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপে চন্দ্রের ক্ষয়রোগগ্রস্ত হওয়ার দরুন, ইত্যাদি। চীনারা ভাবত, হিংস্র একটি ড্রাগন সূর্যকে

গ্রাস করে বলেই সূর্যগ্রহণ। সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়ে তারা এই ড্রাগনকে তাড়াবার চেষ্টা করত।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রকে নিয়ে প্রত্যেকটি প্রাচীন দেশেই এমনি অজস্র কাহিনীর ছড়াছড়ি। প্রাচীনকালের রীতিনীতি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কাছে এই কাহিনীগুলোর দাম কম নয়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে আরো বেশি দামী সেকালের তথ্য-সংগ্রহ। যে তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাবিলন, মিশর, চীন ও ভারতবর্ষের পুরোহিত ও জ্যোতিষীরা অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করে গিয়েছেন।

সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব, পঞ্জিকা-প্রণয়ন বা দিন-মাস-বছরের হিসেব রাখার উপায় স্থির করা। প্রয়োজনটা ছিল জরুরী—চাষের ও সেচের। পঞ্জিকা না থাকলে কোনোটাই ঠিকভাবে করা যেত না। ব্যাবিলনীয়দের আরো একটি কৃতিত্ব, সপ্তাহ ও বার আবিষ্কার। আকাশের সাতটি গ্রহ থেকে তারা সাতটি বারের নাম দিয়েছিল। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ ছিল শনি, তারপরে বৃহস্পতি, তারপরে মঙ্গল, তারপরে রবি, তারপরে শুক্র, তারপরে বুধ, তারপরে চন্দ্র। ব্যাবিলনীয়দের পরেও বহুকাল পর্যন্ত এই সাতটিকেই গ্রহ বলে ধরা হত এবং এই সাতটি গ্রহের গতিবিধিকে ব্যাখ্যা করার জন্য নানা জটিল তত্ত্ব উপস্থিত করতে হয়েছিল। বৈদিক হিন্দুরা বছর গণনা করত ত্রিশ দিনের বারোটি মাসে বা ৩৬০ দিনে। হিসেবটি নির্ভুল নয় (পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৩৬৫.২৪২২ দিন)। দিনের হিসেবে এই ঘাটতিকে পূরণ করবার জন্য কোনো কোনো বছরের সঙ্গে একটি মলমাস যোগ করা হত। চীনদেশে কিন্তু অতি প্রাচীনকাল থেকেই ৩৬৬¼ দিনে বছর গণনা শুরু হয়েছিল।

রাশিচক্র

সেকালের আরেকটি বড়ো কৃতিত্ব, রাশিচক্রের (Zodiac) আবিষ্কার। রাশিচক্র ব্যাপারটা কী? সূর্য পুবে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। এই হচ্ছে সূর্যের আহ্নিক গতি, বা, বলা যেতে পারে আপাত আহ্নিক গতি

(কেননা আহ্নিক গতিটা আসলে পৃথিবীর)। সূর্যের উদয় কিন্তু সারা বছর ধরে আকাশের একই জায়গায় নয়। দেখে মনে হতে পারে আপাত আহ্নিক গতি ছাড়াও সূর্যের আরো একটি গতি আছে। এই গতিপথটিকে চিহ্নিত করা চলে নক্ষত্র বা তারামণ্ডল থেকে সূর্যের
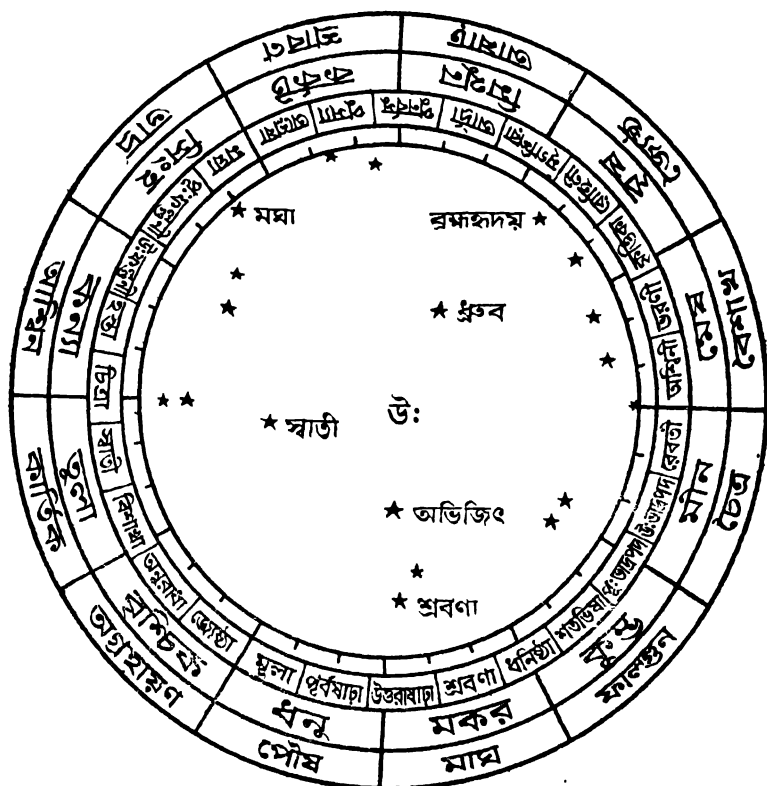
চিত্র ১। রাশিচক্র

অবস্থানের তুলনামূলক বিচার করে। ('আকাশের সূর্য ও পৃথিবী' পরিচ্ছেদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি।) মনে হতে পারে সূর্য যেন এই বিশেষ পথটি ধরেই বছরে একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এই পথটিকেই বলা হয় রাশিচক্র। বছরে বারোটি মাস—সেই হিসেবে রাশিচক্রকে সমান বারোটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সূর্য এক-

এক মাসে এক-একটি ভাগ পার হয়ে যায়। এবারে দেখা যেতে পারে রাশিচক্রের কোন্ ভাগটি কোন্ বিশেষ নক্ষত্র বা তারামণ্ডলে রয়েছে। এইসব নক্ষত্র বা তারামণ্ডলকে এক-একটি নাম দিলে পরেই সম্পূর্ণ রাশিচক্রের চেহারাটি বেরিয়ে আসে। ব্যাবিলনীয়রা তারামণ্ডলের নাম দিয়েছিল পরিচিত জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে মিল লক্ষ করে। কোনো ভাগের নাম বৃষ, কোনো ভাগের নাম কর্কট, কোনো ভাগের নাম বৃশ্চিক, ইত্যাদি। বৈদিক হিন্দুরাও রাশিচক্রকে বারোটি রাশিতে ভাগ করেছিল। এই বারোটি রাশি হচ্ছে—মেষ (বৈশাখ), বৃষ (জ্যৈষ্ঠ), মিথুন (আষাঢ়), কর্কট (শ্রাবণ), সিংহ (ভাদ্র), কন্যা (আশ্বিন), তুলা (কার্তিক), বৃশ্চিক (অগ্রহায়ণ), ধনু (পৌষ), মকর (মাঘ) কুম্ভ (ফাল্গুন), মীন (চৈত্র)। বারোটি রাশি ছাড়াও রাশিচক্রে আছে সাতাশটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। বৈদিক হিন্দুরা এই সাতাশটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাহায্যে রাশিচক্রকে ২৭ ভাগে ভাগ করেছিল। এই সাতাশটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম: অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরা-ষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপথ, উত্তরভাদ্রপথ ও রেবতী। চীনারা কিন্তু রাশিচক্রকে ভাগ করেছিল ২৮ ভাগে—আঠাশটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাহায্যে (চিত্র ১)।

রাশিচক্রের বিভিন্ন ভাগের নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে, এগুলো শুধুই নাম নয়—নামের সঙ্গে যুক্ত নানা কাহিনীও। দেবদেবী ও মুনি ঋষি প্রভৃতিরা ছিলেন এই সমস্ত কাহিনীর নায়ক। মানুষের ভাগ্যও এই রাশিচক্রের দ্বারা নির্ধারিত হত। এই কারণে, মানুষের ভাগ্য-গণনার জন্য সেকালে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করাটা জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাঁরা পর্যবেক্ষণ করতেন তাঁদের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলা চলে না—তাঁরা ছিলেন জ্যোতিষী। এই জ্যোতিষ থেকেই জ্যোতির্বিদ্যা।

এবারে আমরা যে-দেশটির দিকে তাকাব তা ব্যাবিলন নয়, মিশর

নয়, চীন নয়, ভারতবর্ষ নয়, তা হচ্ছে গ্রীস। তারপরে আর শুধু একটি দেশ নয়, গোটা ইউরোপ।

থালেস (খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৪-৫৪৭)

প্রথমেই যাঁর নাম পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন থালেস—মাইলেটাসের থালেস। তাঁর সম্পর্কে গল্প আছে, তিনি একদিন আকাশের তারা দেখতে দেখতে পথ চলতে গিয়ে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করেছিল একজন পরিচারিকা। সাধারণ মানুষ তাঁকে নিশ্চয়ই পাগল ভাবত। কিন্তু এই পাগলের মুখেই প্রথম শোনা গিয়েছিল সেকালের পক্ষে দুঃসাহসিক একটি উক্তি। তিনি বলেছিলেন বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ঈশ্বরকে টেনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই। জগৎ-ব্যাপারের মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা, আর তা জানবার জন্য প্রয়োজন শুধু সাধারণ জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি। আড়াই হাজার বছর আগে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে এভাবে কথা বলতে পারা বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। মানুষের ভাবনায় তিনি এনেছিলেন নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি।

তাঁর মতে সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে জল। বাতাসে জল, মাটিতে জল, গাছপালায় জল, জীবের শরীরে জল। এই জলই রয়েছে দৃশ্য অথবা অদৃশ্য নানা বস্তুর মধ্যে, নানা রূপে। চাকতির মতো আকারের এই পৃথিবীও ভাসছে জলেই। হয়তো এই জলেই পৃথিবীর লয়।

থালেসের এই ব্যাখ্যা অবশ্যই এখন আর গ্রাহ্য নয়। পরবর্তী কালের আরো অনেক ব্যাখ্যাই নয়। কিন্তু থালেস সম্পর্কে বড়ো কথাটা এই যে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈজ্ঞানিক। বিশ্বের রূপ ভাবতে গিয়ে তিনি অলৌকিকতার আশ্রয় নেননি, একটি যান্ত্রিক কাঠামো ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে গবেষণামূলক বিজ্ঞানের পথিকৃৎ বললেও ভুল বলা হয় না।

পিথাগোরাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭২-৪৯৭)

মাইলেটাসের উত্তর-পশ্চিমে সামোস নামে একটি দ্বীপ। গ্রীক দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ পিথাগোরাস-এর জন্ম এই দ্বীপে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পিথাগোরাস একটি স্মরণীয় নাম। তিনিই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান ও ধর্ম, গণিত ও সংগীত, ভেষজ ও বিশ্বতত্ত্ব, শরীর মন ও আত্মা, সবকিছুকে একটা সামগ্রিকতার মধ্যে ধরতে চেয়েছিলেন। অংশে অংশে আলাদা করে দেখা নয়, জোড়-বাঁধা নিটোল রূপটিকে পুরোপুরি দেখা। যেমন দেখতে হয় একটি গোলককে। যার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে কোথা দিয়ে যে শুরু করতে হবে তা স্থির করা কঠিন। পিথাগোরাস বলেছিলেন, প্রবেশ করার সবচেয়ে সহজ মাধ্যমটি হচ্ছে সংগীত। তিনি আবিষ্কার করে-ছিলেন, তারের বাদ্যযন্ত্রে সারগমের কোন্ সুরটি বেজে উঠবে তা নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের ওপরে। এই দৈর্ঘ্যগুলো এলোমেলো নয়, সুর থেকে সুরে নির্দিষ্ট অনুপাতে। সেকালের পক্ষে এটি একটি মস্ত আবিষ্কার। সংগীতের সুর (যা গুণবাচক) কিনা নির্ভর করছে সংখ্যার ওপরে (যা পরিমাণবাচক) ! এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই পিথাগোরাস ঘোষণা করলেন যে দর্শন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সংগীত, শ্রেষ্ঠ দর্শনের যোগ সংখ্যার সঙ্গে আর সংখ্যা হচ্ছে সকল বস্তুর সার। সহজ ভাষায় বললে কথাটার মানে দাঁড়ায় এই : আকার ছাড়া বস্তু হয় না, আকারই বস্তু আর আকারকে বুঝতে হলে সংখ্যা চাই। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ ইত্যাদি প্রত্যেকটি আকারের মূলে রয়েছে সংখ্যা। সংগীতের সুরের মূলেও সংখ্যা। একই সংখ্যা রয়েছে আয়তক্ষেত্রের বাহুর অনুপাতে ও বিভিন্ন সুরের জন্য প্রয়োজনীয় তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে। সংখ্যাই জগৎ।

বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যাতেও পিথাগোরাস এমনি সংখ্যার আশ্রয়ই নিয়ে-ছিলেন। তারের বাদ্যযন্ত্রে যেমন এক-একটি দৈর্ঘ্যে এক-একটি সুর, তেমনি এক-একটি সুর পৃথিবী থেকে চন্দ্রে, চন্দ্র থেকে বুধে, বুধ থেকে

শুক্রে, শুক্র থেকে রবিতে, রবি থেকে মঙ্গলে, মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিতে, বৃহস্পতি থেকে শনিতে, শনি থেকে স্থির নক্ষত্রের মণ্ডলে। এই সুর একমাত্র শুনতে পান বিধাতাপুরুষ। পৃথিবীর নশ্বর মানুষ এই সুর শুনতে পায় না। কিংবা, শুনতে পেলেও জন্ম থেকেই শুনে আসছে বলে উপলব্ধি করতে পারে না।

শামুক, নয়, বাক্সও নয়, পিথাগোরাসের ধারণায় বিশ্বের আকার ছিল গোলকের মতো। আর সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে কতকগুলো এককেন্দ্রীয় বৃত্তে। যা থেকে বিশ্বসংগীতের উদ্ভব। এক-একটি বৃত্ত বাদ্যযন্ত্রের এক-একটি তার, টানা নয়, গোলাকার। আর প্রত্যেকটি তার থেকে পৃথক পৃথক সুর। এমনিভাবে অনন্ত এক বিশ্বসংগীত নিত্য অনুরণিত হয়ে চলেছে।

ফিলোলাউস (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক)

পৃথিবীর আকার একটি গোলকের মতো—কথাটা শোনা যাচ্ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষদিক থেকে। কেউ কেউ বলছিলেন—উত্তরে, অনেক উত্তরে, এমন দেশও নাকি আছে যেখানকার মানুষ ছ-মাস ধরে ঘুমোয় (অর্থাৎ যেখানে ছ-মাস ধরে রাত্রি—তার মানে দেশটা হচ্ছে মেরু-অঞ্চল)। এই গল্প যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে পৃথিবী গোলাকার হলে কী কী ঘটতে পারে সে-সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা তৈরি হতে শুরু করেছিল।

তারপরে শোনা গেল আরো ভয়ানক একটি কথা: পৃথিবী যে শুধু গোল তাই নয়, গতিশীলও। কথাটা বলেছিলেন পিথাগোরাসের শিষ্য ফিলোলাউস। সম্ভবত পৃথিবীকে গতিশীল ভাবার প্রয়োজন হয়েছিল এই কারণে যে নইলে রাশিচক্রে সূর্যের ও গ্রহের বার্ষিক গতিকে ঠিক যেন ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। তাই বলে ফিলোলাউস কিন্তু ভাবেননি যে পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে, যা ভাবতে পারলে অনেক ব্যাখ্যাই সহজ হয়ে যেত। তার বদলে তিনি ভেবেছিলেন যে পৃথিবীও বিশেষ একটি গোলকে ঘুরছে। এই অবস্থায়

পৃথিবীর কোনো দর্শকের কাছে বিশ্বজগৎ প্রতীয়মান হয় ঘুরন্ত নাগর-দোলার দর্শকের কাছে মেলার মতো।

ফিলোলাউসের বিশ্ব-পরিকল্পনা সংক্ষেপে এই রকম : বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় অগ্নি। এই কেন্দ্রীয় অগ্নিকে ঘিরে বিভিন্ন এক-কেন্দ্রীয় গোলকে ঘুরে চলেছে প্রথমে একটি অদৃশ্য গ্রহ (যার নাম ফিলোলাউস দিয়েছিলেন বিপরীত পৃথিবী), তারপরে পৃথিবী, তারপরে চন্দ্র, তারপরে সূর্য, তারপরে পাঁচটি গ্রহ, আর সবার শেষে স্থির নক্ষত্র-মণ্ডল। কেন্দ্রীয় অগ্নিকে পৃথিবী থেকে দেখা যায় না, কারণ পৃথিবীর যে-এলাকায় মানুষের বসবাস (অর্থাৎ গ্রীস ও তার আশেপাশের অঞ্চল), তা থাকে সবসময়েই কেন্দ্রীয় অগ্নির বিপরীত দিকে। বিপরীত-পৃথিবীর কল্পনা সম্ভবত এই কারণে যে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, পাঁচটি গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলের গোলকের মোট সংখ্যাটি দাঁড়ায় নয় ; অথচ পিথাগোরাসের মতে দশ হচ্ছে পবিত্র সংখ্যা ; এই নয়কে দশ করবার জন্যই সম্ভবত বিপরীত-পৃথিবী নামে অদৃশ্য একটি গ্রহের কল্পনা।

হেরাক্লিডিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৮–৩১৫)

এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীকে মনে করা হত বিশ্বের কেন্দ্র এবং পৃথিবী অনড়। ফিলোলাউসই প্রথম বলেছিলেন পৃথিবী গতিশীল। যদিও এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি যে তত্ত্বটি উপস্থিত করেছিলেন তা অনেক দিক থেকেই উদ্ভট। তবুও একটি কৃতিত্ব তাঁকে দিতেই হবে। দিনের পরে রাত্রি আসে, রাত্রির পরে দিন, এ-ব্যাপারটির মূলে রয়েছে আহ্নিক গতি। কিন্তু এই আহ্নিক গতিই সব নয়, তাছাড়াও আছে বার্ষিক গতি। দুটি যে পৃথক গতি, তা এতদিন পর্যন্ত ভাবা হত না। ফিলোলাউসের বিশ্বতত্ত্বেই এই ভাবনার প্রথম আভাস। নইলে, ফিলোলাউস যে কেন্দ্রীয় অগ্নি বা বিপরীত-পৃথিবীর কথা বলেছিলেন, তা কিছুদিনের মধ্যেই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। কারণ ইতিমধ্যে গ্রীক নাবিকদের যাতায়াত শুরু হয়েছিল পৃথিবীর দূর দূর অঞ্চলে। তারা

কোনো অঞ্চল থেকেই ফিলোলাউসের কেন্দ্রীয় অগ্নি বা বিপরীত-পৃথিবীর আভাসমাত্র দেখতে পায়নি।

কিন্তু ফিলোলাউসের বিশ্বতত্ত্বে আহ্নিক গতির যে ধারণাটি পাওয়া যাচ্ছে তাকে অনুসরণ করে পরবর্তী কালের একজন গ্রীক জ্যোতির্বিদ আরো উন্নত ভাবনাচিন্তার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম হেরাক্লিডিস, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মানুষ তিনি। শিক্ষালাভ করে-ছিলেন প্লেটো এবং সম্ভবত অ্যারিস্টটলের কাছেও। তিনি বলতে পেরে-ছিলেন, পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে লাট্টুর মতো ঘুরছে। পৃথিবীর এই আহ্নিক গতি আছে বলেই মনে হয় গোটা আকাশটা ঘুরছে।

অন্যদিকে বার্ষিক গতির ব্যাপারটাও বড়ো রকমের সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। আকাশে রয়েছে অজস্র নক্ষত্র। কিন্তু পারস্পরিক অবস্থানের দিক থেকে সারা বছর তারা স্থির। আইন ও শৃঙ্খলার রাজত্বে তো এমনটিই হওয়া উচিত। পৃথিবীই ঘুরুক বা আকাশের গোলকটিই ঘুরুক—নক্ষত্রের পিন ফোটানো কুশনের মতো গোটা আকাশকেই মনে হবে যেন একসঙ্গে ঘুরছে। তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই থাকে না। কিন্তু সমস্যা বাধল গ্রহগুলোকে নিয়ে। সারা বছর ধরে এই গ্রহগুলোর চলাফেরা কেমন যেন একটু এলোমেলো—যদিও মোটামুটি রাশিচক্রের পথ ধরেই। এই ভবঘুরে গ্রহগুলোর চলাফেরাকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না।

হেরাক্লিডিস একটা আংশিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। সরল ভাষায় তাঁর ব্যাখ্যাটি এই রকম শোনায়: চন্দ্রকে নিয়ে কোনো গোলমাল নেই, চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকেই ঘুরুক। বুধ ও শুক্রের চলাফেরা বড়োই এলোমেলো, বড়োই গোলমেলে—এই দুটি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরুক আর ঘূর্ণ্যমান গ্রহ দুটি সমেত সূর্য ঘুরুক পৃথিবীর চারদিকে। চারটির ব্যবস্থা এই। বাকি তিনটে—অর্থাৎ মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—পৃথিবীর চারদিকেই পৃথক পৃথক গোলকে ঘুরতে থাকুক।

হেরাক্লিডিসের এই বিশ্বতত্ত্বে আংশিক সত্য রয়েছে। তিনি অন্তত দুটি গ্রহকে সূর্যের চারদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

অ্যারিস্টার্কাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০-২৩০)

এতক্ষণ যাঁদের নাম করা হল তাঁরা সকলেই পিথাগোরীয় চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। এই ধারার শেষ নামটি হচ্ছে অ্যারিস্টার্কাস। তাঁকে বলা হয় প্রাকযুগের কোপার্‌নিকাস। অনেকের মতে তিনি প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক।

তাঁর লেখা একটিমাত্র গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'সূর্য ও চন্দ্রের আকার ও দূরত্ব বিষয়ক নিবন্ধ' (On the Sizes and Distances of the Sun and Moon)। নাম থেকেই সেকালের পক্ষে বিষয়টির দুরূহতা বোঝা যাচ্ছে। এই দুরূহ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি উন্নত ধরনের সূর্যঘড়ি ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁর পদ্ধতিও ছিল নিজস্ব ও মৌলিক। পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানী হতে হলে যে-সব গুণ থাকা দরকার তা সবই ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর দুর্ভাগ্য যে দূরবীন আবিষ্কার হবার দু-হাজার বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন। তাই পৃথিবীর তুলনায় সূর্য ও চন্দ্রের আকার এবং পৃথিবী থেকে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব স্থির করতে গিয়ে তাঁর হিসেব অবশ্যই নির্ভুল হতে পারেনি—কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে কোনো ভুল ছিল না।

তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়ো। এ থেকেই বোধহয় তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছিল: এই বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবী, না, সূর্য? এ-বিষয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, যার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের লেখায় গ্রন্থটির উল্লেখ আছে। আর্কিমিডিসের লেখা থেকে জানা যায়—অ্যারিস্টার্কাস-এর সিদ্ধান্ত ছিল যে সূর্য এই বিশ্বের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্ব নয়—সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব। পিথাগোরাস থেকে অ্যারিস্টার্কাস পর্যন্ত ধারাটিকে অনুসরণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোই

স্বাভাবিক। অ্যারিস্টার্কাস এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন। কিন্তু অ্যারিস্টার্কাসে এসেই ধারাটি শেষ, তারপরে আর অগ্রসর হয়নি। কোপার্নিকাস এই সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকেই পুনরায় আবিষ্কার করেছিলেন অ্যারিস্টার্কাসের সতেরো শতক পরে।

প্লেটো (খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৮) ও
অ্যারিস্টটল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, অ্যারিস্টার্কাসের পরের ধাপটিই হওয়া উচিত ছিল কোপার্নিকাস। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি তার ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ অবশ্যই আছে। সে-আলোচনায় আমরা যাব না। তবে মহাকাশের ঠিকানা জানতে হলে ইতিহাসের ধারাটি আমাদের আরো কিছুদূর অনুসরণ করতে হবে। কেননা, অ্যারিস্টার্কাস ও কোপার্নিকাসের মাঝখানে রয়ে গিয়েছে সতেরোটি শতক, যখন আবার সেই ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বেই বিশ্বাস অটুট ছিল। এই পুরনো তত্ত্বটিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন টলেমি আর তার ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন প্লেটো ও অ্যারিস্টটল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সকলেরই ধারণা, অন্তত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের প্রভাব শুভ হয়নি।

প্লেটো বলতেন, এই বিশ্বের আকার হবে নিটোল একটি গোলক, গতি হবে সমান বেগসম্পন্ন, আর গতিপথটি হবে নিখুঁত বৃত্তাকার। কারো ক্ষেত্রেই এই সূত্রের কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না।

প্লেটোর মতে গোলক হচ্ছে ত্রুটিহীনতার নিদর্শন। এই কারণেই পৃথিবী গোল, চন্দ্র গোল, আকাশের প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কই গোল। বিশ্বসৃষ্টিতে কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। আর সবার ওপরে রয়েছেন সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্ব ত্রুটি থেকে পরম মুক্ত।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ-ধরনের একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করলে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কোনো প্রয়োজন অতঃপর আর থাকে না।

প্লেটোর এই তত্ত্বকেই আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন অ্যারিস্টটল।

অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যায় বিশ্বের যে রূপটি পাওয়া যায় তা এই : বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে অনড় পৃথিবী। আর এই পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে নয়টি এককেন্দ্রীয় স্বচ্ছ গোলক, একটির ওপরে আরেকটি, অনেকটা পেঁয়াজের খোসার মতো। সবচেয়ে ভিতরের দিকের গোলকে রয়েছে চন্দ্র ; তারপরে যথাক্রমে সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ; সবচেয়ে বাইরের দিকের দুটি গোলকে স্থির নক্ষত্র। তারও বাইরের গোলকে রয়েছেন এই সমস্ত গোলককে যিনি চালিত করেন সেই পরম চালক বা ঈশ্বর।

ইউডক্সাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৮-৩৫৫)

বিশ্বজগতের যে-চেহারাটি অ্যারিস্টটল উপস্থিত করলেন তা খুবই আঁটোসাঁটো। এই জগতে কোনো বেয়াড়াপনা থাকা উচিত নয়। কিন্তু দেখা দেখা গেল, পরম চালকের এই জগৎটিতেও গ্রহদের চলাফেরা একটু যেন বেয়াড়া—এক-একটি গ্রহের জন্য এক-একটি গোলক নির্দিষ্ট করে দিয়েও তাদের চালচলনকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না।

তখন ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন প্লেটোর শিষ্য ইউডক্সাস। গণিতে ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা আর এই দক্ষতাকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন।

ইউডক্সাস প্রত্যেকটি গ্রহের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন একটি নয়, কয়েকটি করে গোলক। অতি জটিল এই গোলকগুলোর বিন্যাস। প্রথমে কল্পনা করতে হবে, গ্রহটি রয়েছে কোনো একটি গোলকের বিষুবরেখায়। আর এই গোলকটি অক্ষদণ্ডের চারদিকে ঘুরছে। আবার এই অক্ষদণ্ডটি আটকানো রয়েছে আরো-বড়ো একটি এককেন্দ্রীয় গোলকের ভিতরে। দ্বিতীয় গোলকটিও পৃথক একটি অক্ষদণ্ডের চারদিকে ঘুরছে। আবার এই দ্বিতীয় অক্ষদণ্ডটি

আটকানো রয়েছে, তৃতীয় একটি আরো-বড়ো গোলকের ভিতরে। এমনি গোলকের পর গোলক। সবকটি গোলকই ঘুরছে। আর এই সবকটি ঘূর্ণ্যগতির মোট ফল লক্ষ করা যাবে গ্রহের চলাফেরায়।

ইউডক্সাসের হিসেবে সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল তিনটি করে গোলক, গ্রহগুলোর জন্য চারটি করে। মোট সাতাশটি।

কিন্তু তারপরেও দেখা গেল, এই সাতাশটি গোলকের ফাঁস ঝুলিয়েও গ্রহগুলোর বেয়াড়াপনাকে শায়েস্তা করা যাচ্ছে না। তখন আরো সাতটি গোলক যোগ করা হল। সব মিলিয়ে চৌত্রিশটি। তারপরে বাড়তে বাড়তে গোলকের সংখ্যা এসে দাঁড়াল চুয়ান্নতে। সে এক অতি জটিল ব্যাপার।

চুয়ান্নটি গোলক! কেন? না, কয়েকটি গ্রহের বেয়াড়া চাল-চলনকে ব্যাখ্যা করার জন্য। বেয়াড়া কেন বলা হচ্ছে? বেয়াড়া এই কারণে যে গ্রহগুলো কখনো সামনে চলে, কখনো পিছিয়ে আসে, কখনো থেমে থাকে। অন্তত চোখের দেখায় তাই মনে হয়। অথচ প্লেটো বলেছেন যে জ্যোতিষ্ক মাত্রেরই গতি হবে চক্রাকার—পৃথিবীর অবস্থান যার কেন্দ্রে। চক্রাকার গতির সাহায্যে গ্রহ-গুলোর বেয়াড়া চালচলনকে ব্যাখ্যা করার জন্যই বাধ্য হয়ে এতগুলো গোলকের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় মৌলিকত্ব আছে সন্দেহ নেই, গাণিতিক দক্ষতার পরিচয়ও যথেষ্ট, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান সামান্যই। তাছাড়া, শুধু গোলকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেই যে সবকিছুর ব্যাখ্যা করা গিয়েছিল তাও নয়। সারা বছরে গ্রহগুলোর উজ্জ্বলতা সমান থাকে না, কখনো বেশি কখনো কম। যতোই জটিল বিন্যাসের গোলক পরিকল্পিত হোক না কেন, গ্রহ-গুলোর উজ্জ্বলতা বেশি-কম হওয়ার কোনো ব্যাখ্যা তার মধ্যে নেই। অথচ, এই পরিকল্পনাই, যা পুরোপুরি উন্মত্ততার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, মানুষকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছিল। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের এমনই প্রতিপত্তি ও প্রভাব যে জ্যোতিষ্কের

গতিবিধিকে অন্য কোনো সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার কথা ভাবাই যেত না।

ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জ্যামিতিক আঁক কষার সামিল, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের কোনো বালাই ছিল না। তা সত্ত্বেও এই গোলক-ভিত্তিক পরিকল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। পরবর্তী পনেরো-শো বছর ধরে যে পরিকল্পনাটি বেঁচে ছিল, তা এই গোলক-ভিত্তিক পরিকল্পনারই একটু রকমফের—তাকে বলা চলে চক্র-ভিত্তিক পরিকল্পনা—যার প্রবর্তক ছিলেন টলেমি। ক্লডিয়াস টলেমি। টলেমি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেই প্রাচীন যুগের আলোচনা আমরা শেষ করছি।

টলেমি (খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতক)

টলেমির প্রতিভা ছিল বহুমুখী। গণিত, পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলেও তাঁর দান সামান্য নয়। তবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন জ্যোতিষীয় গবেষণার জন্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘অ্যালমাজেস্ট’ (Almagest) নামে একটি জ্যোতিষীর গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থটি ছিল প্রাচীন জ্যোতিষের বিশ্বকোষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক। টলেমির সময় থেকে কোপারনিকাসের সময় পর্যন্ত—অর্থাৎ পনেরো-শো বছর ধরে গ্রন্থটিকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

গ্রন্থে তেরোটি খণ্ড। প্রথম তিনটি খণ্ডের আলোচ্য বিষয় সূর্য-চন্দ্র-গ্রহের গতি, বছরের পরিমাপ, পঞ্জিকা, ইত্যাদি।

চতুর্থ খণ্ডের মূল আলোচ্য বিষয় চন্দ্রের গতি ও গ্রহণ। টলেমি বললেন যে চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে একটি উৎকেন্দ্রিক (eccentric) বৃত্তে। অর্থাৎ, এমন একটি বৃত্তে, পৃথিবীর অবস্থান যার ঠিক কেন্দ্রে নয়—কেন্দ্র থেকে খানিকটা দূরে। এখানেই শেষ নয়, চন্দ্রের আরো একটি গতি আছে। এই উৎকেন্দ্রিক বৃত্তে চন্দ্র ঘুরছে একটি পরিবৃত্তে (epicycle) ঘুরতে ঘুরতে। পরের পৃষ্ঠার ছবিতে (চিত্র ২) পরিবৃত্তের ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

E হচ্ছে পৃথিবী, O কেন্দ্র, M চন্দ্র। ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে পরিবৃত্তে ঘূর্ণ্যমান চন্দ্রকে দেখানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করতে হবে যে এই পরিবৃত্তের কেন্দ্রটিও (M´) বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে। এই বৃত্তপথটিকে (M´PQ) বলা হয় ডেফারেন্ট। টলেমি বললেন যে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের যে গতি আমাদের চোখে পড়ে তা এই উভয় গতির ফল।
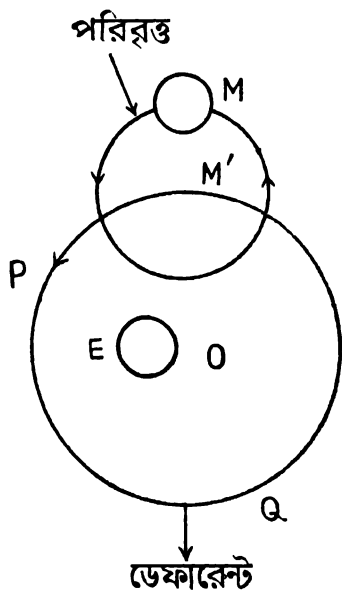
চিত্র ২। চন্দ্রের গতি : টলেমির ব্যাখ্যা

অর্থাৎ, ব্যাপারটি যেন এই যে একটি ছোট চাকা ঘুরছে, যার কেন্দ্র আরেকটি ঘুরন্ত বড়ো চাকার পরিধির ওপরে। আগেকার পরিকল্পনায় ছিল গোলকের মধ্যে গোলক, এবারে চাকার সঙ্গে চাকা। দুই-ই সমান জটিল।

পঞ্চম খণ্ডের আলোচ্য বিষয় চন্দ্রের ও সূর্যের দূরত্বের অনুপাত। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে নক্ষত্র পরিচয়। নবম থেকে ত্রয়োদশ খণ্ডে গ্রহের গতি ও বিশ্বের গড়ন।

আগে বলেছি, এই গ্রহগুলোকে নিয়ে সেকালের জ্যোতির্বিদরা বড়ো মুশকিলে পড়েছিলেন। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে আকাশ-

পথে গ্রহগুলোর চলাফেরাকে মনে হত বড়োই এলোমেলো ও গোলমেলে। সেগুলো কখনো এগিয়ে চলে, কখনো পিছিয়ে পড়ে, কখনো বা স্থির হয়ে থাকে। টলেমি মুশকিল আসান করতে চাইলেন পরিবৃত্তের সাহায্য নিয়ে। বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী আর গ্রহগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে পরিবৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে। দৃষ্টান্ত দিতে হলে নাগরদোলার কথা বলতে হয়। মস্ত একটি চাকার মতো নাগরদোলা ঘুরছে। চাকার রিম থেকে ঝুলছে দর্শকদের বসবার আসন। এখন কল্পনা করতে হবে যে নাগরদোলার চাকাও ঘুরছে, সঙ্গে সঙ্গে এই আসনগুলোও ছোট ছোট চক্রে ঘুরে চলেছে। ঘুরন্ত চাকার রিমের সঙ্গে বাঁধা ঘুরন্ত আসনের দর্শকের গতিকে ঘুরন্ত চাকার কেন্দ্র থেকে যেমন ধারা দেখাবে, পৃথিবী থেকে তাকিয়ে গ্রহের গতিও তেমনি ধারা।

মূল কথাটি হচ্ছে চক্রগতি। কখনো ছোট আকারে, কখনো বড়ো আকারে। পৃথক পৃথক ভাবে নয়, একই সঙ্গে। বিশ্বের রহস্য নিহিত রয়েছে এই চক্রের মধ্যেই। নানা আকারের চক্রের সঠিক বিন্যাসেই রহস্যের চাবিকাঠি।

আর্থার কোয়েস্‌লার তাঁর 'দ্য স্লীপ ওয়াকার্স' গ্রন্থে এ-ব্যাপারটিকে তুলনা করেছেন কিউবিস্ট ছবির সঙ্গে। কিউবিস্ট শিল্পীরা ভাবতেন, দৃশ্যবস্তু সঠিকভাবে উপস্থিত হতে পারে ঘনক (cube), শঙ্কু (cone) ও বেলনের (cylinder) বিশেষ বিশেষ বিন্যাসের মধ্যে। যেমন, পিকাসোর ছবি 'দর্পণের সম্মুখে রমণী'। এই ছবিতে রমণীর চোখ ঠোঁট ইত্যাদির স্থলে বসানো হয়েছে কতকগুলো গোলক, পিরামিড, ঘনক ও এমনিধারা জ্যামিতিক ক্ষেত্র। মনে হতে পারে, ইউডক্সাসের গোলকের মতোই পিকাসোর এই ছবিও পুরোপুরি উন্মত্ততার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। ব্যাপারটা চলতে থাকলে একজন আনাড়ীও ভাবতে পারত যে হাতে একটা কম্পাস থাকলেই ছবি আঁকা যেতে পারে। ছবির জগতে ব্যাপারটা বেশিদিন চলেনি, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার জগতে ব্যাপারটা চলেছিল দু-হাজার বছর ধরে। ফলে, সতেরো শতক পর্যন্ত

শুধু গোলক ও চক্রের সংখ্যা ও জটিলতা বাড়ানো ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যার আর বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। এমনকি, কারও কারও ধারণা হয়েছিল যে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ব্যাখ্যা করার জন্য হাতে কাগজ-কলম থাকাই যথেষ্ট, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখারও কোনো প্রয়োজন নেই।

কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)

জ্যোতির্বিদ্যার এই অচলায়তনটিকে ভাঙার কাজে প্রথম যিনি হাত দিয়েছিলেন তাঁর নাম কোপারনিকাস। নিকোলাস কোপারনিকাস। তাঁর জন্মস্থান পোল্যাণ্ডের ভিশ্চুলা নদীতীরের থর্ন। শিক্ষালাভ প্রথমে ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে ইতালিতে। এই ইতালিতে থাকার সময়েই জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হন।

জীবনের শেষ একত্রিশটি বছর তাঁর কেটেছিল ফ্রাউয়েনবুর্ক গির্জার ক্যাননের পদে। অবসর সময়ে জ্যোতিষ ও গণিত চর্চা করতেন। পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁর স্থান খুব উঁচুতে নয়—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের দিকে তাকিয়ে কখনো তাঁর জীবন কাটেনি। তাঁর গ্রন্থে সবসুদ্ধ মাত্র সাতাশটি পর্যবেক্ষণের উল্লেখ আছে যা তাঁর নিজস্ব। তিনি ছিলেন প্রধানত ও মূলত তত্ত্বজ্ঞানী (theorist)। তাঁর অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য ছিল এতাবৎকালের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সৌরমণ্ডলের একটি যুক্তিগ্রাহ্য কাঠামো গড়ে তোলা।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনা কোপারনিকাসের মাত্র একটি। তার নাম 'স্বর্গীয় গোলকদের আবর্তন বিষয়ে' (On the Revolutions of the Heavenly Spheres)। কোপারনিকাস গ্রন্থটির রচনা শেষ করেছিলেন ১৫৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে আর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালের মাঝামাঝি। ১৫৪৩ সালের ২৪শে মে তারিখে কোপারনিকাসের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত কপিটি তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছিল।

এই গ্রন্থে একটি ভূমিকা আছে। ভূমিকায় বলা হয়েছে যে কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনের জন্য গ্রন্থটি রচিত নয়—গ্রন্থটি নিতান্তই কল্পনাবিলাস। এই ভূমিকা সম্পর্কে কোপারনিকাস নিজে কোনো মন্তব্য করে যেতে পারেন নি। পণ্ডিতমহলের ধারণা, এই ভূমিকার বেনামী লেখক হচ্ছেন কোপারনিকাসের বন্ধু অ্যাণ্ডিয়া ওসিয়াণ্ডার, যাঁর ওপরে বইটি ছেপে বার করার দায়িত্ব পড়েছিল। কিন্তু আর্থার কোয়েস্‌লার তাঁর বইয়ে নানা দলিলপত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে ভূমিকাটি সম্ভবত কোপারনিকাসের জ্ঞাতসারেই লেখা। ভূমিকা সম্পর্কে কোন মতটি ঠিক তা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। তবে একথাটি ঠিক যে জীবিতকালে কোপারনিকাস কোনো সময়েই খুব জোরের সঙ্গে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে চাননি। গ্রন্থটি প্রকাশ করতে বরাবরই তিনি ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধার কারণ সম্ভবত তাঁর এই ভয় যে সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে বিশেষ মতাবলম্বী একদল ধর্মযাজকের রোষদৃষ্টিতে তিনি পড়বেন। সম্ভবত এই কারণেই রচনা শেষ হবার পরেও প্রায় একযুগ ধরে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁর সিন্দুকে তোলা ছিল। যদিও এই সময়ের মধ্যে ছোটখাটো তু-একটি সংশোধন করা ছাড়া নতুন কোনো পর্যবেক্ষণ তিনি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। গেওর্গ ইওয়াখিম (ল্যাটিন নাম রেটিকাস) নামে একজন তরুণ গবেষকের পীড়াপীড়িতেই শেষ পর্যন্ত তিনি গ্রন্থটি প্রকাশ করতে রাজী হয়েছিলেন।

গ্রন্থে ছ'টি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে আছে তত্ত্বের বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে জ্যোতিষ সংক্রান্ত গাণিতিক সূত্র, তৃতীয় খণ্ডে পৃথিবীর গতি, চতুর্থ খণ্ডে চন্দ্রের গতি, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে গ্রহের গতি।

এই গ্রন্থে বিশ্বের যে কাঠামোটি পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে এই : এই বিশ্বের পরিসর সীমিত, তার সীমানা হচ্ছে স্থির নক্ষত্রদের গোলক। বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। স্থির নক্ষত্রদের গোলক আর সূর্য অনড়। গ্রহগুলো ঘুরছে সূর্যের চারদিকে—সূর্য থেকে

সবচেয়ে কাছে বুধ, তারপরে শুক্র, তারপরে পৃথিবী, তারপরে মঙ্গল, তারপরে বৃহস্পতি, তারপরে শনি। চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের অক্ষের চারদিকেও পাক খাচ্ছে। পৃথিবীর এই আহ্নিক আবর্তনের দরুনই মনে হয় যেন গোটা আকাশটাই আবর্তিত হচ্ছে। আর পৃথিবীর বার্ষিক আবর্তনের দরুনই মনে হয় যেন সূর্য রাশিচক্রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই একই কারণে গ্রহগুলোকে দেখে মনে হয়, কখনো কখনো তারা যেন গতিহীন, কখনো কখনো তাদের গতি যেন পিছনের দিকে। আরো কিছু কিছু সামান্য ধরনের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে থাকে পৃথিবীর অক্ষের দোলনের জন্য (বিষয়টি নিয়ে 'পৃথিবী ও তার নিত্য সহচর' পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি)।

তত্ত্বটি অবশ্যই বৈপ্লবিক। কিন্তু তত্ত্বটিকে দাঁড় করাতে গিয়ে কোপারনিকাস কিন্তু খুব একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারেন নি। গতি সম্পর্কে সেই যে প্লেটো বলে গিয়েছিলেন যে গতি হবে বৃত্তাকার ও সমবেগসম্পন্ন, তা তাঁর কাছে ছিল প্রশ্নাতীত সত্য। ফলে, পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তত্ত্বের মিল ঘটাবার জন্য শেষপর্যন্ত তিনি সূর্যকে সরিয়ে এনেছিলেন বিশ্বের কেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে। গ্রহদের গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রায় টলেমির মতোই চৌত্রিশটি পরিবৃত্তের সাহায্য নিয়েছিলেন।

তা সত্ত্বেও, প্রায় দু-হাজার বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে যে অচলায়তনটি খাড়া হয়েছিল, কোপারনিকাসের হাতেই তার ভাঙন শুরু। শুধু ভাঙনই নয়, নতুন একটি দিগন্তকে আভাসিত করাও। এই ভাঙনটি যিনি পুরোপুরি ঘটিয়েছিলেন ও এই নতুন দিগন্তকে চোখের সীমানায় এনেছিলেন তাঁর নাম কেপ্‌লার। তবে কেপ্‌লার সম্পর্কে বলার আগে আরো একজন জ্যোতির্বিদের নাম উল্লেখ করা দরকার। তিনি টাইকো ব্রাহে।

টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০৬)

কোপারনিকাসের মৃত্যুর তিন বছর পরে টাইকো ব্রাহের জন্ম। জন্মস্থান ডেনমার্ক। শিক্ষালাভ প্রথমে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপরে লাইপ্‌ৎসিক ও রোস্টোক বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তিনি টলেমির 'অ্যালমাজেস্ট' গ্রন্থটি পড়ে শেষ করেছিলেন। এবং নিজের চেষ্টায় প্রায় সবটাই বুঝতে পেরেছিলেন। চোদ্দ বছরের বালকের পক্ষে এ-ঘটনা অসাধারণ। বাবা জর্জ ব্রাহে ছেলেকে রাষ্ট্রনেতা করতে চেয়েছিলেন। টাইকো ব্রাহে তা হননি। একেবারে ছেলেবেলা থেকে জ্যোতির্বিদ্যায় এতবেশি আগ্রহ ছিল যে অন্য কিছু হবার চেষ্টা করলে তিনি বোধহয় কিছুই হতে পারতেন না।

মানুষটি ছিলেন একটু রগচটা ও অসহিষ্ণু প্রকৃতির। রোস্টোকে থাকার সময়ে একটা বিবাদের সূত্র ধরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পর্যন্ত নেমেছিলেন। ফলে তাঁর নাকের খানিকটা অংশ খোয়া গিয়েছিল। প্লাস্টিক সার্জারির যুগ সেটা নয়। কিন্তু তিনি নিজের নাকটি নতুন করে গড়ে নিয়েছিলেন সোনা, রুপো ও মোম দিয়ে। যতোদূর জানা যায়, এই নাক নিয়ে বাকি জীবনে তিনি কখনো নাকাল বোধ করেননি।

টাইকো ব্রাহেকে বলা হয়ে থাকে আধুনিক পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিদ্যার জনক। গণিতে ও জ্যামিতিতে তাঁর জ্ঞান খুব গভীর ছিল না। তত্ত্বজ্ঞানী হিসেবে তাঁর স্থান উঁচুতে নয়। কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল নিখুঁত ও নির্ভুল। তথ্যসংগ্রহ ছিল বিপুল। তাঁর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই কেপ্‌লার গ্রহদের গতি-সংক্রান্ত নীতি ও সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। কেপ্‌লার একা নয়, পরবর্তীকালের অনেক জ্যোতির্বিদকেই টাইকো ব্রাহের তথ্যের ওপরে নির্ভর করতে হয়েছিল।

কোপারনিকাসের তত্ত্বে টাইকো ব্রাহের বিশ্বাস ছিল না। পৃথিবী

সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এমনি ধরনের চিন্তাকে তিনি পাপ মনে করতেন। অথচ তিনি ভালো করেই জানতেন যে টলেমির তত্ত্ব দিয়েও গ্রহের গতি ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন তিনি নিজস্ব একটি তত্ত্ব খাড়া করলেন। তিনি বললেন যে গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকেই ঘুরছে আর ঘুর্ণ্যমান গ্রহগুলো সমেত সূর্য ও চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীর চারিদিকে। তত্ত্বটি আনকোরা নতুন নয়। তাঁর নিজের নিশ্চয়ই এই তত্ত্বে বিশ্বাস অটুট ছিল। কিন্তু কোপারনিকাসের পরে আবার নতুন করে এই তত্ত্ব শুনতে অন্যরা বিশেষ রাজী ছিলেন না।

টাইকো ব্রাহের সঙ্গে কেপ্‌লারের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে ১৬০০ সালের ৪ঠা ফেব্রুআরি তারিখে। কেপ্‌লারকে তিনি তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন। আর ১৬০১ সালের ২৭শে অক্‌টোবর তারিখে টাইকো ব্রাহের মৃত্যু। ব্যক্তিগত যোগাযোগ পুরো দু'বছরেরও নয়। কিন্তু যতো অল্প সময়ের জন্যই হোক, এই দুটি মানুষের সাক্ষাৎকার ও যোগাযোগ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের পথ রচনা করেছিল।

টাইকো ব্রাহে অবশ্য চেয়েছিলেন যে তাঁর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কেপ্‌লার তাঁর তত্ত্বটিকেই দাঁড় করাবেন। কেপ্‌লারও শুরু করেছিলেন এই লক্ষ্য সামনে রেখেই। কিন্তু বছরের পর বছর অঙ্ক কষেও তিনি তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের মিল ঘটাতে পারেননি। তখন তিনি নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন। এই ভাবনারই ফল গ্রহদের গতি সংক্রান্ত তাঁর নীতি ও সূত্র।

টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণ যে কতখানি নির্ভুল ছিল তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। অঙ্ক কষতে কষতে কেপ্‌লার একসময়ে এমন একটি ফলে পৌঁছেছিলেন যার সঙ্গে টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণের ফলের গরমিল ছিল মাত্র আট মিনিটের (ষাট মিনিটে এক ডিগ্রি)। কেপ্‌লার সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছিলেন যে ভুল আছে তাঁর অঙ্কে, টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণে নয়।

কেপ্‌লার (১৫৭১-১৬৩০)

পুরো নাম যোহান কেপ্‌লার, জার্মান উচ্চারণে ইওহানেস কেপ্‌লার। জন্ম জার্মানির স্টুটগার্টের কাছে ভ্যুরস্টেম্‌বের্কের ভীল ডেয়ার স্টাট্‌-এ। দরিদ্র পরিবারে মানুষ। চার বছর বয়সে এমন মারাত্মক অসুখে পড়েছিলেন যে জন্মের মতো বাঁ হাতটি খানিকটা অবশ ও চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে তিনি নিজে অতি সামান্যই পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন। টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণই ছিল তাঁর পুঁজি।

শিক্ষালাভ ট্যুবিন্‌গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ধর্মযাজক হবেন ভেবেছিলেন। তা হন নি, তার বদলে ১৫৯৪ সালে গ্রেৎস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। আরো দু-বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। গ্রহদের পারস্পরিক দূরত্বের মধ্যে কোনো জ্যামিতিক সম্বন্ধ আছে কিনা তাই ছিল এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়। গ্রন্থের দুটি কপি তিনি পাঠিয়েছিলেন টাইকো ব্রাহে ও গ্যালিলিওর কাছে। এই গ্রন্থ ছিল টাইকো ব্রাহের সঙ্গে কেপ্‌লারের যোগাযোগের সূত্র।

টাইকো ব্রাহের সংগৃহীত তথ্যগুলো কেপ্‌লারের হাতে আসার পরেই শুরু হল তাঁর আসল জীবন। বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহের পরিক্রমা-সংক্রান্ত তথ্যগুলোর ওপরে ভিত্তি করে তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করলেন। তাঁর ভাবনাকে দুটি প্রশ্নের আকারে উপস্থিত করা চলে: কোপারনিকাস বলেছেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে —আসল ঘটনা কি তাই? নাকি, অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে?

এতকাল পর্যন্ত সমস্ত জ্যোতির্বিদই এক জায়গায় এসে ঠেকছিলেন। আকাশ-পথে গ্রহদের চলাফেরা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি নয়, খানিকটা অনিয়মিত। এই অনিয়মিত চলাফেরাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই কখনো চক্রের মধ্যে চক্র, কখনো ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্ব কখনো সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব। তবুও যেন ব্যাপারটাকে

(ক) সাবেকী ভূ-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা (খ) হেরাক্লিডিস-এর পরিকল্পনা
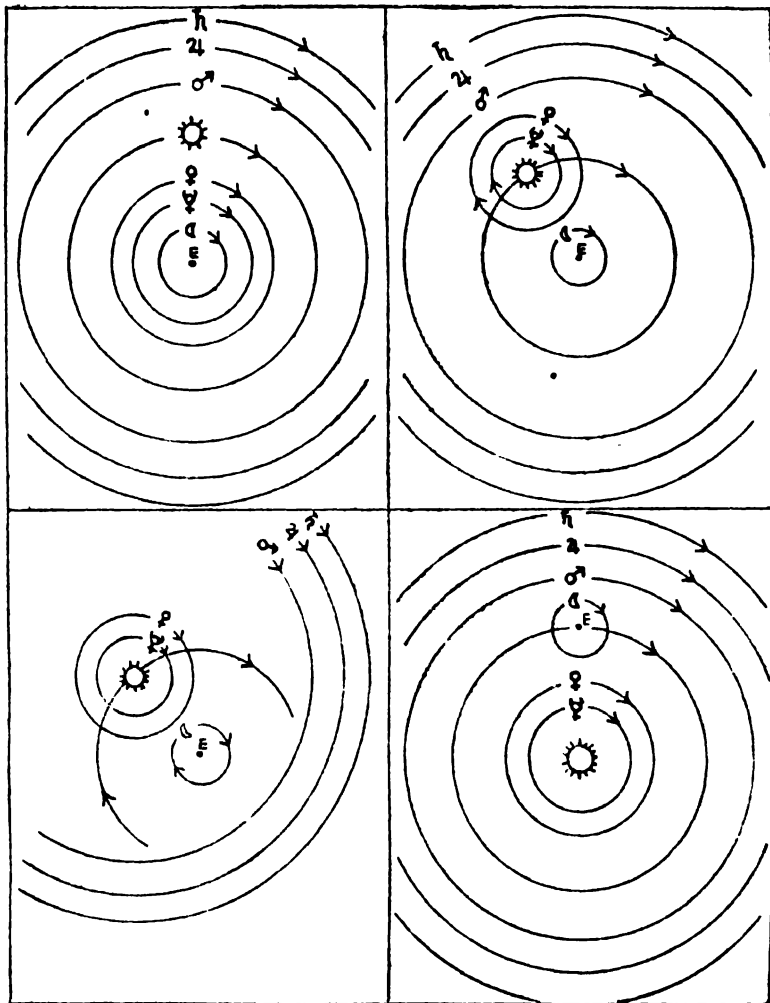
(গ) টাইকো ব্রাহের পরিকল্পনা (ঘ) অ্যারিস্টার্কাস-এর সূর্য-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা

☼ = সূর্য ☾ = চন্দ্র E = পৃথিবী ☿ = বুধ, ♀ = শুক্র

♂ = মঙ্গল ♃ = বৃহস্পতি ♄ = শনি

চিত্র ৩। ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা—নানা সময়ে

ঠিক ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কোপারনিকাসও এই ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, তাঁকে শেষ পর্যন্ত পরিবৃত্তের সাহায্য নিতে হয়েছে। আসল বাধাটা কোথায়? এতকাল পর্যন্ত কোনো জ্যোতির্বিদই ভাবতে পারেননি যে আকাশের জ্যোতিষ্কের গতি বৃত্তাকার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে, কেননা চেহারার দিক থেকে বৃত্তই হচ্ছে সবচেয়ে সুসম্পূর্ণ (Nature's own curve)। কেপ্‌লারও গোড়ায় তাই ভেবেছিলেন। তারপরে অঙ্ক কষতে গিয়ে দেখলেন, অঙ্কের ফলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফল কিছুতেই মিলছে না। কোপারনিকাসের তত্ত্বেও নয়, টাইকো ব্রাহের তত্ত্বেও নয়, কোনো তত্ত্বেই নয়। এই মিল ঘটাবার আপ্রাণ চেষ্টা আটটি বছর ধরে করবার পরে তিনি প্রথম ভাবতে পারলেন, বৃত্ত না হয়ে উপবৃত্তও তো হতে পারে! তারপরে অঙ্ক কষতে গিয়ে দেখলেন, আশ্চর্য, এবারে অঙ্কের ফল আর পর্যবেক্ষণের ফল পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। বৃত্তের ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার বাধাটিই ছিল সবচেয়ে বড়ো বাধা।

এই বাধাটি কেটে যাবার পরে কেপ্‌লারের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো খুব একটা শক্ত ব্যাপার ছিল না।

তিনটি সূত্রের সাহায্যে কেপ্‌লার গ্রহদের গতি ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রথম দুটি সূত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৬০৯ সালে, তৃতীয় সূত্রটি আরও দশ বছর পরে। এই তিনটি সূত্রের মূল কথাটি এই: পৃথিবী সমেত সবক'টি গ্রহই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ঘোরাটা বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার। সূর্য রয়েছে এই উপবৃত্তের ফোকসে। তাছাড়া, গ্রহের বেগ ও সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব কোনো ক্ষেত্রেই অনির্দিষ্ট নয়, বিশেষ গাণিতিক সূত্রের দ্বারা নির্ধারিত। এই তিনটি সূত্র সম্পর্কে পরে আবার আমরা আলোচনা তুলব।

প্রায় দু-হাজার বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে একটি অচলায়তন খাড়া হয়ে উঠেছিল—টলেমির তত্ত্ব ছিল যার শেষ আশ্রয়। কেপ্‌লার এই অচলায়তনটিকেই একেবারে ধূলিসাৎ করলেন, সেই সঙ্গে টলেমির তত্ত্বকেও। কাজটি অবশ্য শুরু হয়েছিল কোপারনিকাসের

হাতে, তবে দ্বিধার সঙ্গে। টাইকো ব্রাহে এ-কাজে সহায় হয়েছিলেন তথ্যসমৃদ্ধ একটি ভিত্তি রচনা করে। তারপরে কাজটি সম্পূর্ণ করলেন কেপ্‌লার। জ্যোতির্বিদ্যাকে তিনি মুক্তি দিলেন নতুন এক দিগন্তে। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরু কোপারনিকাস থেকে। তবে কোপারনিকাস শুধুই শুরু, তার পথটি রচনা করার কৃতিত্ব যাঁর তিনি হচ্ছেন কেপ্‌লার। তারপরে যিনি এই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে গতিশীল করেছিলেন, যাঁর দুঃসাহসী অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিভূমিতেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম—সেই গ্যালিলিও সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে ইতিহাসের পথে আমাদের যাত্রা শেষ করছি।

গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)

পুরো নাম গ্যালিলিও গ্যালিলি। শেক্‌সপীয়র ও তাঁর জন্ম একই বছরে। নিউটনের জন্ম ও তাঁর মৃত্যু একই বছরে। যেদিন তাঁর জন্ম (১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুআরি) ঠিক সেদিনই যুগস্রষ্টা ইতালীয় চিত্র-শিল্পী মিকেলাঞ্জেলো মৃত্যুশয্যায়। সাল-তারিখের এই সমস্ত যোগা-যোগের কিছুটা তাৎপর্য অবশ্যই আছে। সতেরো শতকটি শুধু বিজ্ঞানের ইতিহাসে নয়, শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় যুগ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকে তাকালেও এই শতকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতেই পাওয়া যাচ্ছে তিনজন অসাধারণ বিজ্ঞানীর নাম। টাইকো ব্রাহে, কেপ্‌লার ও গ্যালিলিও। এমন যোগাযোগও সচরাচর ঘটে না। টাইকো ব্রাহের বয়স যখন পঞ্চাশ, কেপ্‌লারের একত্রিশ ও গ্যালিলিওর সাঁইত্রিশ। প্রথমজন আকাশের জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করেছেন, দ্বিতীয়জন সেই জ্যোতিষ্কের গতিপথের গাণিতিক সূত্রটি অঙ্ক কষে বার করতে চেষ্টা করেছেন, তৃতীয়জন তৈরি হচ্ছেন দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে।

এক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্যালিলিওর দান কতখানি তা বুঝতে হলে

আরো কয়েকটি কথা বলা দরকার। সতেরো শতকের প্রথম ত্রিশটি বছরে পুরনো বিশ্বাসের কাঠামো প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা সত্ত্বেও ভেঙে পড়েনি। কোপারনিকাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালে। কিন্তু এই নতুন তত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে তেমন আলোড়ন তুলতে পারেনি। তার পরেও আশি বছর ধরে সাবেকী বিজ্ঞানে বিশ্বাসটাই অটুট ছিল। আগেকার দু-হাজার বছরে যেমন, তখনো তেমনি অ্যারিস্টটল ও টলেমিকে মনে করা হত জ্ঞানবিজ্ঞানের শেষ কথা। এমনকি কেপ্‌লারের সূত্রও এই বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। ১৬২০ সালের আগে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাসীর সংখ্যা এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলেও ছিল একেবারেই নগণ্য।

পুরনো বিশ্বাসকে যিনি টলিয়েছিলেন, শুধু টলাননি, একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন এবং কোপারনিকাসের তত্ত্বের সপক্ষে নতুন বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিলেন—তিনি গ্যালিলিও। তাঁর গবেষণাকে কেন্দ্র করেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাবেকী ধারণার সঙ্গে আধুনিক ধারণার সংঘর্ষ প্রচণ্ড একটি হিংস্র রূপ নিয়ে ফেটে পড়েছিল।

এই সংঘর্ষের অবশ্যই একটি ইতিহাস আছে। সঠিকভাবে বলতে গেলে দশ বছরের ইতিহাস—১৬০৯ থেকে ১৬১৯। গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনের মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে প্রথম তাকিয়েছিলেন ১৬০৯ সালে। এই ঘটনাকে নতুন একটি যুগের সূত্রপাত বলা চলে। এতদিন পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হত শুধু চোখের দেখার ওপরে। শুধু চোখে তাকিয়ে আকাশের নক্ষত্রকেও দেখাত বিন্দুর মতো, গ্রহকেও তাই। দুয়ের তফাত বোঝা যেত না। এই প্রথম দূরবীনের সাহায্যে আকাশকে যেন বিজ্ঞানীর চোখের সামনে নামিয়ে আনা গেল।

গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে যে জ্যোতিষ্কটিকে প্রথম পর্যবেক্ষণ করলেন—সেটি চন্দ্র। তিনি আবিষ্কার করলেন, চন্দ্রের উপরতলটি অসমান, সেখানে যেমন আছে গহ্বর তেমনি পর্বত।

তারপরে পর্যবেক্ষণ করলেন নক্ষত্র। এবারে একটি নতুন অভিজ্ঞতা হল। দূরবীনের মধ্যে দিয়ে তাকিয়েও নক্ষত্রকে তেমনি একটি বিন্দুর মতোই দেখলেন। তবে অবশ্যই এমন আরো অনেক নক্ষত্র দেখতে পেলেন যা শুধু চোখে দেখা যায় না। কিন্তু কোনটাই বিন্দুর চেয়ে বড়ো নয়। আমরা এখন জানি নক্ষত্রকে বিন্দুর চেয়ে বড়ো দেখা গ্যালিলিওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনকি হালের বহুগুণ শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে তাকিয়েও তা দেখা যায় না। নক্ষত্র এত দূরের যে তাকে বড়ো করার ক্ষমতা মানুষের তৈরী দূরবীনের নেই।

তারপরে পর্যবেক্ষণ করলেন ছায়াপথ। আবিষ্কার করলেন, ছায়াপথটা আকাশের গায়ে আলোর পোঁচ নয়, ভিড় করে থাকা অসংখ্য তারা। চোখের দেখায় মনে হয় তারাগুলো যেন গায়ে গায়ে লেগে আছে।

তারপরে পর্যবেক্ষণ করলেন গ্রহ। আবিষ্কার করলেন, বৃহস্পতির আছে চারটি উপগ্রহ ; চন্দ্র যেমন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এই চারটি উপগ্রহও তেমনি ঘুরছে বৃহস্পতির চারদিকে।

বৃহস্পতির পরে পর্যবেক্ষণ করলেন শুক্র। এবারে তাঁর আবিষ্কার চাঞ্চল্যকর। দেখলেন, চন্দ্রের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি আছে, যাকে বলা হয় চন্দ্রের কলা, তেমনি আছে শুক্রেরও। শুক্রকে কখনো দেখায় পরিপূর্ণ চাকতির মতো, কখনো ফালির মতো।

এই আবিষ্কারের পরেই গ্যালিলিও নিঃসন্দেহ হলেন যে কোপারনিকাসের তত্ত্ব সঠিক, টলেমির তত্ত্ব ভুল। টলেমির তত্ত্বে বলা হয়েছে যে শুক্র ও সূর্য দুটি জ্যোতিষ্কই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। শুক্র পৃথিবীর কাছে, সূর্য দূরে। শুক্রের কিন্তু নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলো শুক্র থেকে প্রতিফলিত। তাই যদি হয় তো পৃথিবী থেকে তাকিয়ে কোনো সময়েই শুক্রের পরিপূর্ণ চাকতিটি দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি অর্ধ-চাকতিও নয়। কোপারনিকাসের তত্ত্বকে সঠিক বলে মেনে নিলেই এ-ব্যাপারটির ব্যাখ্যা সম্ভব।

সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত। শুক্রের কলা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে

টলেমির তত্ত্বটিকে কোনো ক্রমেই টিকিয়ে রাখা চলে না। সেক্ষেত্রে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বই গ্রাহ্য। একমাত্র এই তত্ত্বের সাহায্যেই পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে।

গ্যালিলিওর আরো একটি আবিষ্কার, সূর্যের কালো ছোপ। এতদিন পর্যন্ত সূর্যকে মনে করা হত অকলঙ্ক। গ্যালিলিও দেখলেন, সূর্যেরও কলঙ্ক আছে। তিনি আরো দেখলেন যে সূর্যকলঙ্ক পুব থেকে পশ্চিমে সরে সরে যায়। এ থেকে তিনি প্রমাণ করলেন যে সূর্য আবর্তনশীল।

প্রত্যেকটি আবিষ্কারই বড়ো ভয়ানক। রোমান ক্যাথলিক গির্জার পক্ষে হজম করা খুবই শক্ত। কোপারনিকাস ও কেপলারকে অগ্রাহ্য করা গিয়েছিল কারণ তাঁদের কথায় বিশেষ আলোড়ন ওঠেনি। কিন্তু কোপারনিকাসের তত্ত্বের পক্ষে গ্যালিলিওর ঘোষণা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলল। আর তখনই গির্জার কর্তারা নড়েচড়ে বসলেন।

ফলে গ্যালিলিওকে গির্জার কার্ডিনালের কাছে প্রচণ্ড একটি ধমক খেতে হল। কার্ডিনাল ডিক্রি জারি করলেন যে "সূর্য বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং সূর্য স্থিতিশীল—এই বক্তব্য উদ্ভট···" গ্যালিলিওর ওপরে হুকুম জারি করা হল যে অতঃপর তিনি সূর্য-গ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে নির্বাক থাকবেন। শোনা যায় কার্ডিনালের রায় শোনার পরেও গ্যালিলিও চাপা গলায় বলে উঠেছিলেন, 'তবুও পৃথিবী ঘুরছে।' ('Eppur si muove'—But the earth does move) কার্ডিনাল খুব সহজেই ব্যাপারটা সেরে ফেললেন। যেন তাঁর অন্য-মনস্কতার সুযোগ নিয়ে একদল গ্রহ দুষ্টু ছেলের মতো সূর্যের চারদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল—টের পেয়ে তিনি কান মলে দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিলেন।

কিন্তু এই কানমলাটা কাজের হয়েছে বলতে পারা যেত যদি গ্যালিলিও তারপরে সত্যি সত্যিই তাঁর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে বিরত থাকতেন। তা তিনি থাকেননি। এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাকও থাকতে পারলেন না।

১৬৩২ সালে প্রকাশিত হল গ্যালিলিওর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'টলেমীয় ও কোপারনিকাসীয়—দুটি মুখ্য বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কিত কথোপকথন' (Dialogue Concerning the Two Chief World Systems—Ptolemaic and Copernican)। গ্রন্থটি কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা। প্রধান চরিত্র তিনটি—স্যালভিয়াতি, সাগ্রেদো ও সিমপ্লিসিও। প্রথমজন কোপারনিকাসের তত্ত্বে বিশ্বাসী, তৃতীয়জন টলেমির এবং দ্বিতীয়জন নিরপেক্ষ হলেও কোপারনিকাসের তত্ত্বের দিকেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব। স্যালভিয়াতিকেই বলা যেতে পারে নায়ক। তাঁকে আশ্রয় করেই গ্যালিলিও এই গ্রন্থে সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের পক্ষে অকাট্য যুক্তিতর্ক উপস্থিত করলেন।

ধর্মসংস্থার পক্ষে এই বক্তব্য হজম করা খুবই শক্ত। বিশেষ করে যেক্ষেত্রে অপরাধীকে পূর্বেই একবার সতর্ক করা হয়েছিল! এবারে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তলব এসে হাজির, ১৬৩৩ সালের ২০শে জুন তারিখে। তাঁকে বলা হল যে পরীক্ষা ও বিচারের জন্য পরদিন, অর্থাৎ ২১শে জুন, তিনি যেন রোমের ইনকুইজিশনের (রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিচারকমণ্ডলী—অপরাধী ও পাপীদের যাঁরা সমুচিত শাস্তি দিয়ে থাকেন) সামনে উপস্থিত থাকেন। গ্যালিলিওর বয়স তখন সত্তর, শরীর ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তবুও তিনি রেহাই পেলেন না। নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা তাঁকে হাজির হতে হল। ইনকুইজিশনের শাস্তি-ঘরে সেই যে তিনি প্রবেশ করলেন, সেই যে দরজা বন্ধ হল—তার পরে তিনটি দিন তিনি একেবারে নিখোঁজ। সেকালে ইনকুইজিশনের শাস্তি-ঘরের নাম শুনলেই লোকে ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠত। শাস্তি-ঘর থেকে জীবিত যারা বেরিয়ে আসতে পারত তারা কখনো তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারত না। বললেই আবার শাস্তি-ঘর। গ্যালিলিও বেরিয়ে এলেন ২৪শে জুন তারিখে। এই তিনটি দিন তাঁকে যে কী নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তার কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ বা দলিলপত্র নেই, থাকা সম্ভবও নয়, শুধু অনুমান করা চলে।

গ্যালিলিও পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেন। লিখিত ভাবে তাঁকে ঘোষণা করতে হল যে তিনি তাঁর গ্রন্থে যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন তা ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ—এই তত্ত্ব তিনি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করছেন!

গ্যালিলিওর বাকি জীবনটা কেটেছিল প্রথমে রোমের কারাগারে, পরে ফ্লোরেন্সের কাছে একটি জায়গায় নজরবন্দী অবস্থায়।

তিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তবু, এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, জীবনের এই শেষভাগে তিনি যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গ্রন্থটি বলবিদ্যা সম্পর্কিত, নাম 'দুটি নতুন বিজ্ঞান সম্পর্কিত কথোপকথন' (Dialogues Concerning Two New Sciences)।

গ্যালিলিও এই গ্রন্থের রচনা শেষ করেন ১৬৩৬ সালে, যখন তাঁর বয়স বাহাত্তর। পরের বছর প্রথমে তাঁর ডানচোখটি, পরে দুটি চোখই অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি তাঁর শেষ গ্রন্থের দুটি অধ্যায় মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গোপনে পাঠানো হয়েছিল হল্যাণ্ডে। সেখানেই গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৬৪২ সালে তাঁর মৃত্যু। এই ১৬৪২ সালেই নিউটনের জন্ম। সাধারণত বলা হয়ে থাকে, আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু নিউটন থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হয় নিউটনের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি যে-বিরাট পুরুষের স্কন্ধে দাঁড়াবার সুযোগ পাবার ফলে তিনি হচ্ছেন গ্যালিলিও। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের জন্য যে দুঃসাহসী অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূতিকাগারটির প্রয়োজন ছিল—তা গ্যালিলিওর সৃষ্টি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণার বিকাশলাভের জন্য যে বিদ্রোহী শঙ্খধ্বনির প্রয়োজন ছিল—তা গ্যালিলিওর রচনা।

আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন আরো তিনজন বিরাট পুরুষ: কোপারনিকাস, টাইকো ব্রাহে ও কেপ্‌লার। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা যে চারটি প্রধান খুঁটির ওপর, তাদের নাম করতে হলে এই চারটি নামই উচ্চারণ করতে হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রহ ও বিশ্ব

সতেরো শতকের শুরু পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করতাম পৃথিবী রয়েছে এই বিশ্বের কেন্দ্রে এবং পৃথিবী স্থির। বিশ্বকে ভূ-কেন্দ্রিক ভাবাটা যে ভুল তা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল গ্যালিলিওর কাছ থেকে। তিনিই প্রথম ছোট একটি দূরবীন নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। গ্যালিলিওর পরে প্রায় ৩৭০ বছর পার হয়েছে। এই এই সময়ে তৈরি হয়েছে আরো অনেক বড়ো দূরবীন! সেই দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে আকাশের তারা ইত্যাদি সম্পর্কে, অর্থাৎ বিশ্ব সম্পর্কে, আমরা অনেক খবর জানতে পেরেছি। তবুও কিন্তু, আমরাই রয়েছি বিশ্বের কেন্দ্রে, এই ধারণাটি সহজে দূর করা যায়নি। পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা ভাবতাম যে আমাদের সৌরমণ্ডল রয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রে। তবে পৃথিবী সম্পর্কে ভাবতাম সূর্যের আরও সব গ্রহের মতো পৃথিবীও একটি গ্রহ মাত্র, এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই ধারণায় ভুল ছিল না। আর সূর্য সম্পর্কেও সঠিকভাবে ভাবতাম, আকাশের অন্য অনেক তারার মতো সূর্যও একটি তারা। তবে সূর্য সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবতাম, সূর্য রয়েছে তারা দিয়ে গড়া এই বিশ্বের মাঝখানে। বিশ্বটা কত বড়ো, বিশ্বের বাইরে আরো বিশ্ব আছে কিনা, এসব আমরা কিছুই জানতাম না।

জানতে পারি ১৯২০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মাউন্টউইলসন-এ ২½ মিটার বা ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের প্রকাণ্ড একটি দূরবীন বসিয়েছিলেন। এই দূরবীন দিয়ে আকাশের দিয়ে তাকিয়ে বিশ্বের চেহারা সম্পর্কে প্রথম খানিকটা ধারণা পাওয়া গেল।

আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী হারলো শাপ্‌লী (Harlow Shapley) এই দূরবীনের সাহায্যে বিভিন্ন তারামণ্ডলের অবস্থান নির্ণয় করেন এবং তা থেকে দেখান যে সূর্য ও সৌরমণ্ডলের অবস্থান কিছুতেই তারা দিয়ে গড়া এই বিশ্বের কেন্দ্রে হতে পারে না। মোটা-মুটি বিশ্বের একটি চেহারাও তিনি দাঁড় করান। তারা দিয়ে গড়া এই বিশ্বটিকে আমরা বলি ছায়াপথ (Milky Way)। এই ছায়াপথে তারা আছে ১০,০০০ কোটি (দশহাজার-কোটি বা একের পরে পরে এগারোটি শূন্য বসিয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো সংখ্যক)। তারাগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা মোটেই নয়। এখন আমরা জানি, এই দশহাজার-কোটি তারা নিয়ে আমাদের এই বিশ্বের চেহারাটি দাঁড়িয়েছে চ্যাপ্‌টা একটি চাকতির মতো আর সূর্য রয়েছে এই চাকতির কেন্দ্র থেকে অনেকখানি দূরে। আবার এই তারাগুলো গোটা চাকতি বরাবর সমানভাবে ছড়ানো রয়েছে তাও নয়। তারাগুলো এমনভাবে ছড়ানো যে মনে হয় চাকতির কেন্দ্র থেকে একাধিক কুণ্ডলী-পাকানো বাহু বেরিয়ে এসেছে। সূর্য রয়েছে এমন একটি বাহুতে কেন্দ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আর এই চাকতির আকার সম্পর্কে যদি কোনো ধারণা দিতে হয় তাহলে বলা যেতে পারে, চাকতির ব্যাসের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে পৌঁছতে আলোর সময় লাগে একলক্ষ বছর।

ধারণাটা পরিষ্কার করা দরকার। বলা হচ্ছে, চাকতির ব্যাস এমন একটা দূরত্ব যা পার হতে আলোর সময় লাগে একলক্ষ বছর। এই আলো প্রতি সেকেণ্ডে পার হয় প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বা ১,৮৬,০০০ মাইল। অর্থাৎ, একটি বিশেষ বিন্দু থেকে আলো রওনা হলো তো একসেকেণ্ড পরেই তা চলে যাচ্ছে তিনলক্ষ কিলোমিটার দূরে। এমনি বেগে যদি একলক্ষ বছর ধরে চলে তাহলেই চাকতির ব্যাসের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে পৌঁছতে পারে। এ থেকে চাকতির বেড় সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। আর শুধু তো বেড় নয়, চাকতির চেহারা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে আরও জানা

দরকার, চাকতিটা কতখানি পুরু। বলা যেতে পারে, কেন্দ্রের কাছে চাকতির একদিক থেকে অপরদিকে পৌঁছতে আলোর সময় লাগে ২০,০০০ বছর, আর বেড়ের কাছে ১,০০০ বছর।

চাকতিটি স্থির নয়, পাক খাচ্ছে। পাক খাচ্ছে, চাকতির কেন্দ্রের চারদিকে, চাকতির ভিতরকার দশহাজার কোটি তারা—সেই সঙ্গে আমাদের সূর্যও। চাকতির যে-অংশে সূর্য রয়েছে, চাকতির কেন্দ্র থেকে সেখানে পৌঁছতে আলোর সময় লাগে ২৫,০০০ বছর। আর চাকতির কেন্দ্রের চারদিকে একবার পাক খেতে সূর্যের সময় লাগে ২০ কোটি বছর।

এই হচ্ছে আমাদের বিশ্ব, যাকে আমরা বলি ছায়াপথ। দশ-হাজার কোটি তারা নিয়ে কুণ্ডলী-পাকানো বাহুবিশিষ্ট বিরাট একটি চাকতি। এমনই বিরাট যে চাকতির ব্যাস পার হতে আলোর সময় লাগে একলক্ষ বছর। আর এমনই পুরু যে কেন্দ্রের কাছে চাকতির একদিক থেকে অপরদিকে পৌঁছতে আলোর সময় লাগে ২০,০০০ বছর।

শাপ্‌লীর পরে এলেন অপর একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী —এডউইন হাব্‌ল (Edwin Hubble)। মাউন্ট উইলসনের দূরবীনের সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করেন যে আমাদের বিশ্বের বাইরে রয়েছে আরো অনেক বিশ্ব — চেহারায় আমাদেরই বিশ্বের মতো।

আমাদের ছায়াপথের নানা জায়গায় যে-সব আবছা আলোর ছোপ দেখা যায়, যেগুলোকে এতকাল মনে করা হত নীহারিকার গ্যাস, তাদের অনেকগুলোই হচ্ছে আমদের বিশ্বের বাইরে পৃথক এক-একটি বিশ্ব বা তারাজগৎ। ইংরেজিতে বলা হয় গ্যালাক্‌সি (Galaxy)। আমাদের বিশ্ব বা ছায়াপথও (Milky Way) একটি গ্যালাক্‌সি। আমাদের বিশ্বের সবচেয়ে কাছের বিশ্বকে (এম ৩১) দেখা যায় অ্যান্‌ড্রোমিডা তারামণ্ডলের এলাকায় আবছা একটি ছোপের মতো। কিন্তু দূরবীনে তোলা ছবি দেখলে বোঝা যায় এটি একটি পৃথক তারাজগৎ, আমাদের তারাজগতের মতোই বিরাট এক

চাকতি, আর এই চাকতির মধ্যে তারাগুলো ছড়ানো রয়েছে। কুণ্ডলী-পাকানো বাহুর মতো। সবচেয়ে কাছের এই বিশ্ব থেকে আমাদের এই বিশ্বে আলো পৌঁছতে সময় লাগে কুড়িলক্ষ বছর।

হাব্‌ল-এর আবিষ্কার থেকে জানা যায়, দশহাজার-কোটি তারা নিয়ে আমাদের এই যে নিজস্ব তারাজগৎ, সূর্য যার মধ্যে সামান্য একটি তারা মাত্র, পৃথিবী যার মধ্যে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলা আরও সামান্য একটি গ্রহ মাত্র—সেই তারাজগৎও কিন্তু অসাধারণ বা অদ্বিতীয় কিছু নয়। আমাদের তারাজগতের বাইরে রয়ে গিয়েছে আরো অনেক তারাজগৎ—সংখ্যায়, এখন আমরা জেনেছি, কোটি-কোটি।

আমাদের তারাজগতের নাম দিয়েছি ছায়াপথ (Milky Way)। এই আমাদের বিশ্ব। ছায়াপথের বাইরে রয়েছে আরো কোটি কোটি বিশ্ব।

আর এই কোটি কোটি বিশ্বকে নিয়ে যা পাওয়া যাচ্ছে তাকে কী বলব? বলতে পারি মহাবিশ্ব। (Universe)।

পৃথিবী, বিশ্ব ও মহাবিশ্ব

পৃথিবী থেকেই শুরু করা যাক।

পৃথিবী একটি গোলক, পুরোপুরি গোলক নয়, দুই মেরুদেশে খানিকটা চাপা আর বিষুব-এলাকায় ফুলে ওঠা! কোনো ফলের সঙ্গে
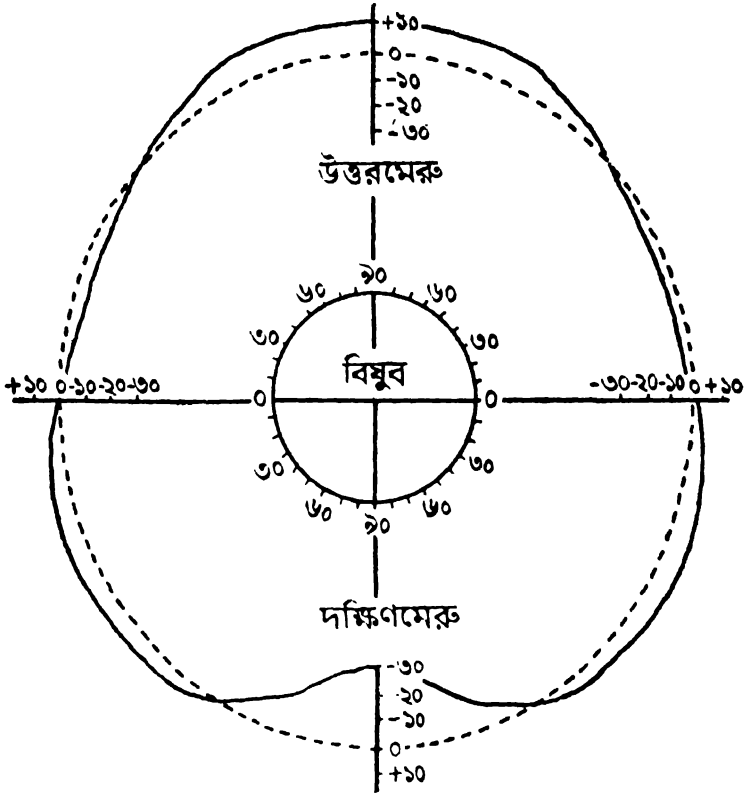
চিত্র ৪। পৃথিবীর আকার। ১৯৫৭ সালে মহাকাশ গবেষণার যুগ শুরু হবার আগের পৃথিবীর আকার সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা দেখানো হয়েছে ভাঙা লাইনে। ১৯৫৭ সালের পরে স্পুৎনিক ও অন্যান্য উপগ্রহের সাহায্যে হিসেব করে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়েছে তা আস্ত লাইনে। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তর মেরুর দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ মেরুর দূরত্বের চেয়ে ৪০ মিটার বেশি। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য এই মাপ অনেক বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

তুলনা করতে হলে বলা হয় কমলালেবুর মতো। কিন্তু কৃত্রিম উপ-গ্রহের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ শুরু হবার পরে জানা গিয়েছে পৃথিবীর দুই মেরুদেশ সমান মাত্রায় চাপা নয়। উত্তর মেরুর দিকে কম-চাপা, দক্ষিণ মেরুর দিকে বেশি-চাপা। ফলের সঙ্গে তুলনা করতে হলে বলা উচিত নাশপাতির মতো। তবে ভূপৃষ্ঠের চেহারা নাশপাতির গায়ের মতো মসৃণ নয়—সমুদ্রতল ও পর্বতচুড়ো ছাড়াও গোটা ভূপৃষ্ঠ জুড়ে রয়েছে কোথাও কোথাও উঁচু কুঁজ ও কোথাও কোথাও নিচু খাদ। যার তুলনা হতে পারে এবড়ো-খেবড়ো আলুর গায়ের সঙ্গে।

পৃথিবীর মাপ

পৃথিবীর গোলকটি কত বড়ো?

বিষুবের দিকে এই গোলকের ব্যাস ১২,৭৫৭ কিলোমিটার (৭,৯২৭ মাইল)। বিষুবের দিকে পরিধি ৪০,০৭৫ কিলোমিটার (২৪,৯০২ মাইল)। মেরুর দিকে ব্যাস ১২,৭১৪ কিলোমিটার (৭,৯০০ মাইল)। মেরুর দিকে পরিধি ৪০,০০৮ কিলোমিটার (২৪,৮৬০ মাইল)।

পৃথিবীকে নিয়ে এমনি ন-টি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

চন্দ্র বা চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর উপগ্রহ। চাঁদের ব্যাস ৩,৪৭৬ কিলোমিটার (২,১৬০ মাইল)। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,৫৪৪ কিলোমিটার (২,৩৯,০০০ মাইল)। আকাশের রাজ্যে এই দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। কলকাতা থেকে দিল্লী যতোটা দূরে তার প্রায় আড়াই-শো গুণ।

সৌরমণ্ডলের মাপ

সূর্যকে আপাতত ধরে নেওয়া যাক গ্যাসের একটি গোলক হিসেবে, পৃথিবী থেকে ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ কিলোমিটার (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল) দূরে। সূর্যের ব্যাস ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার কিলোমিটার (৮ লক্ষ ৬৫ হাজার মাইল)।

দূরত্বের হিসেব নিতে যাওয়াটা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। সূর্য থেকে পৃথিবী খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু তাও প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার। আমরা যদি বলি আকাশ-পথে কলকাতা থেকে বোম্বাই প্রায় দু-হাজার কিলোমিটার দূরে তাহলে মোটামুটি ধারণা করা চলে কোথায় বোম্বাই আর কোথায় কলকাতা। কিন্তু যদি বলি কয়েক কোটি কিলোমিটার তাহলে কোনোরকম ধারণাই করা যায় না।

মোটামুটি একটা ধারণা করার জন্য অন্য একটা মাপকাঠি নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, একটি জেট-বিমান ঘণ্টায় ১৬০০ কিলো-মিটার (১০০০ মাইল) বেগে উড়ে চলেছে। বিমানটি কলকাতা থেকে বোম্বাই পৌছবে একঘণ্টার কিছু বেশি সময়ে। যদি বিষুব-রেখা বরাবর উড়তে শুরু করে তাহলে পৃথিবীকে পুরো একটি বেড় দিয়ে যাত্রা শুরু করার স্থানে ফিরে আসবে ২৫ ঘণ্টা পরে। যদি জেট-বিমানটির পক্ষে এই বেগে চাঁদের দিকে যাত্রা করা সম্ভব হত তাহলে চাঁদে পৌছতে সময় নিত প্রায় ১০ দিন। যদি সূর্যের দিকে যাত্রা করা সম্ভব হত তাহলে সূর্যে পৌছতে সময় নিত ৩,৮৭৫ দিন বা সাড়ে-দশ বছরের কিছু বেশি। পৃথিবীর বেলাতেই এই। তাহলে সৌরমণ্ডলে সবচেয়ে বাইরের দিকের গ্রহ প্লুটোর বেলায় কী হতে পারে? এই বিমানটির প্লুটো থেকে সূর্যে পৌছতে সময় লাগার কথা ৪২৭ বছর।

তাহলে সৌরমণ্ডল সম্পর্কে একটা ধারণা করতে হলে গোটা ছবিটাকে ছোট স্কেলে ভাবা দরকার। যেমন ভাবা হয় মানচিত্রে। একটি গোটা মহাদেশের মানচিত্র একটি পৃষ্ঠার মধ্যে এঁকে দেখানো হয়, সেখানে শুধু নির্দেশ থাকে মানচিত্রের কতখানি দূরত্ব বাস্তবের কতখানি দূরত্বের সমান। যেমন, যদি বলা হয় মানচিত্রের এক-সেন্টিমিটার বাস্তবের এক কিলোমিটারের সমান তাহলে বুঝতে হবে বাস্তবের মাপ ১,০০,০০০ ভাগ ছোট করে দেখানো হয়েছে (কেননা ১,০০,০০০ সেন্টিমিটারে এক-কিলোমিটার)। অঙ্কের ভাষায় লেখা

হয় ১ ঃ ১,০০,০০০। এদিক-ওদিক ৯০ সেন্টিমিটারের মাপে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকলে সেখানে স্কেলটি দাঁড়ায় ১ ঃ ৪,২০,০০,০০০। অর্থাৎ মানচিত্রের পৃথিবী বাস্তবের পৃথিবীর চেয়ে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ভাগ ছোট।

এবারে তাহলে এদিক-ওদিক আট কিলোমিটারের মাপে সৌরমণ্ডলের একটি ছবি তৈরি করা যাক। এখানে স্কেলটি দাঁড়াবে ১ ঃ ১৫০,০০,০০,০০০। অর্থাৎ ছোট করার মাত্রা দেড়শো-কোটি ভাগ।

এই স্কেলে ১,৩৮,৪০০ কিলোমিটার ব্যাসের সূর্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৯০ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি গোলক। পৃথিবীকে দেখাচ্ছে একটি মটরদানার মতো, সূর্য থেকে ৯৪½ মিটার (একটি ফুটবল মাঠের দৈর্ঘ্য) দূরে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ভিতরের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে থাকছে আরো দুটি গ্রহ—মটর-দানার মতো শুক্র (Venus) ও পেঁপের বিচির মতো বুধ (Mercury)। সূর্য থেকে শুক্র ৬৩ মিটার দূরে, বুধ ৩১½ মিটার দূরে।

এই হচ্ছে তিনটি গ্রহ। সূর্য থেকে ৩১½ মিটার দূরে পেঁপের বিচির মতো বুধ, ৬৩ মিটার দূরে মটরদানার মতো শুক্র, ৯৪½ মিটার দূরে মটরদানার মতো পৃথিবী। সূর্য রয়েছে কেন্দ্রে, তারপরে পর-পর এই তিনটি গ্রহ। আমরা রয়েছি পৃথিবীগ্রহে তাই আমাদের কাছে বুধ ও শুক্র ভিতরের দিকের গ্রহ।

এবারে দেখা যাক বাইরের দিকে কী। পৃথিবী ছাড়িয়ে আরো ৪৯½ মিটার দূরে (অর্থাৎ সূর্য থেকে ১৪৪ মিটার দূরে) রয়েছে পেঁপের বিচির মতো মঙ্গল।

মনে রাখা দরকার ছবিটি আঁকা হচ্ছে সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে। গ্রহগুলো কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। মঙ্গল রয়েছে সূর্য থেকে ১৪৪ মিটার দূরে, তার মানে মঙ্গলের কক্ষের ব্যাস দাঁড়াচ্ছে ১৪৪ মিটারের দ্বিগুণ বা ২৮৮ মিটার। তার মানে, এদিক-ওদিক ২৮৮

মিটার এলাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র চারটি—পেঁপের বিচির মতো দুটি, মটরদানার মতো দুটি।

তারপরে বৃহস্পতি (Jupiter), সৌরমণ্ডলে সবচেয়ে বড়ো গ্রহ। ৪৯৫ মিটার দূরে থেকে কমলালেবুর মতো এই গ্রহটি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

তারপরে শনি, আকারে সবেদার মতো, সূর্য থেকে ৯০০ মিটার দূরে। শনিগ্রহের বলয় আছে, সেটিও দেখানো দরকার। আমাদের স্কেলে বলয়টি হবে সবচেয়ে পাতলা টিস্যুকাগজে ১৬½ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি বৃত্ত।

প্রাচীনদের কাছে এই ছিল সৌরমণ্ডল, শনিগ্রহের বাইরে অন্য কোনো গ্রহের সন্ধান তাঁদের জানা ছিল না। জানা সম্ভবও ছিল না, কেননা তাঁরা আকাশ দেখতেন খালি চোখে। ১৭৮১ সাল পর্যন্ত এই ছিল সৌরমণ্ডলের বিস্তার। তারপরে এই ১৭৮১ সালে, অর্থাৎ দূরবীন হাতে আসার ১৭২ বছর পরে, ইউরেনাস (Uranus) গ্রহটি আবিষ্কার করেন স্যার উইলিয়ম হার্শেল (Sir William Herschel)। সঙ্গে সঙ্গে সৌরমণ্ডলের বিস্তার দ্বিগুণ হয়ে যায়। আমাদের ছবিতে ইউরেনাস হয়ে উঠছে একটি বড়ো বাদামের মতো, সূর্য থেকে ১,৮০০ মিটার দূরে।

আরো পঞ্চাশ বছর পরে আবিষ্কৃত হয় নেপচুন (Neptune), আরো বাইরের একটি গ্রহ। আমাদের ছবিতে নেপচুনকে দেখাতে হচ্ছে একটি সুপুরির আকারে, সূর্য থেকে ২,৮৩৫ মিটার দূরে।

তারপরে প্লুটো (Pluto), সৌরমণ্ডলে সবচেয়ে বাইরের গ্রহ। মাত্র ১৯৩০ সালে এই গ্রহটির অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে জানা যায়। আমাদের ছবিতে এই গ্রহটির চেহারা দাঁড়াচ্ছে আরেকটি পেঁপের বিচির মতো, সূর্য থেকে মোটামুটি চার কিলোমিটার দূরে। তবে প্লুটো যদিও সবচেয়ে বাইরের গ্রহ কিন্তু তার কক্ষটি এত বেশি চ্যাপটা যে কক্ষ-পথে চলতে চলতে প্লুটো কখনো কখনো নেপচুনের চেয়েও ভিতরে

চলে আসে, আবার কখনো কখনো চলে যায় আমরা যে সীমানা নির্দিষ্ট করেছি তারও বাইরে।

আরো একটি কথা। এই ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা ধরে নিয়েছি পৃথিবীর কক্ষ আর অন্য সমস্ত গ্রহের কক্ষ একই তলে, সাদা একটি
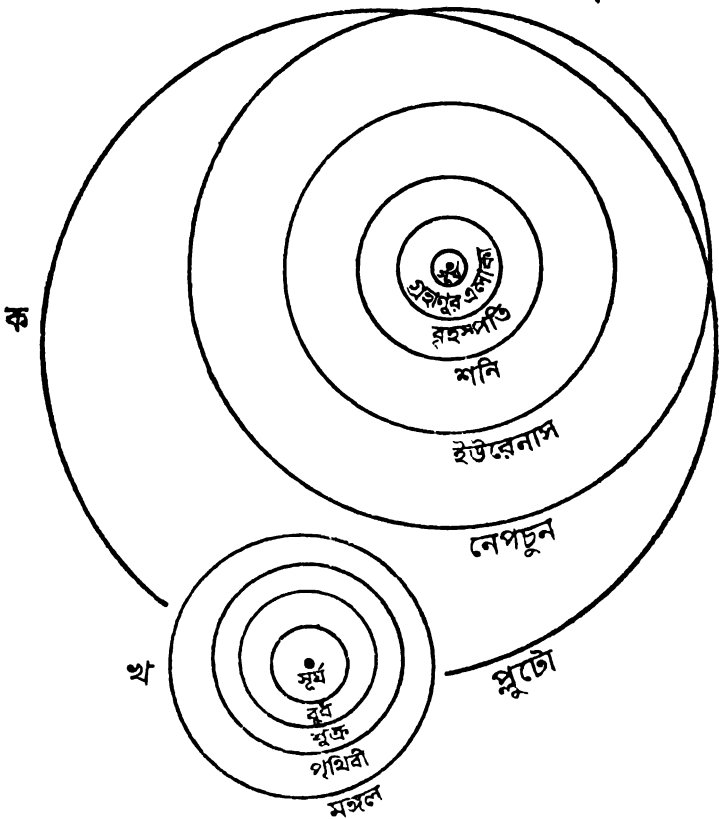
চিত্র ৫। সৌরমণ্ডলের ছক। 'ক' অংশে দেখানো হয়েছে বাইরের দিকের গ্রহগুলোর কক্ষ, মঙ্গলের কক্ষকেও সেই অনুপাতে ছোট করে। 'খ' অংশে মঙ্গল, পৃথিবী ও ভিতরের দুটি গ্রহের কক্ষ। 'ক' অংশের মাত্রায় ছোট করে দেখাতে হলে পৃথিবী শুক্র ও বুধের কক্ষ দেখতে না পাওয়ার মতো ছোট হয়ে যায়, তাই মঙ্গলের কক্ষ সহ আলাদা করে দেখানো হল।

কাগজের ওপরেও বুঝি এঁকে দেখানো চলে। কথাটা ঠিক নয়। পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে অন্যান্য গ্রহের কক্ষতল রয়েছে খানিকটা

করে কোনাকুনি অবস্থায়। সবচেয়ে বেশি কোনাকুনি প্লুটোর কক্ষ, তারপরে বুধের, বাদবাকি গ্রহের যৎসামান্য। কাগজের ওপরে ছবি আঁকলে বিভিন্ন কক্ষের বিভিন্ন তল দেখানো সম্ভব নয়। অতএব ছবি না এঁকে আমাদের স্কেলে সৌরমণ্ডলের একটি মডেল তৈরি করা যাক। এবারে দেখা যাবে পৃথিবীর কক্ষতল থেকে শুক্রগ্রহের সরে যাওয়ার মাত্রা মাত্র ৩½ মিটার, মঙ্গলগ্রহের মাত্র ৫ মিটার, এবং প্লুটোকে বাদ দিলে কোনো গ্রহেরই ৯০ মিটারের বেশি নয়। মডেলটি আরো ছোট করে দেখানো যেতে পারে, মনে করা যাক একটি আধুলির মাপে। তাহলে কিন্তু এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহের সরে যাওয়ার মাত্রা কখনো এত বেশি হয় না যে আধুলি যতোটা চওড়া তার অর্ধেক ছাড়িয়ে যেতে পারে। মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে সূর্যের চারদিকে এই নয়টি গ্রহ প্রায় একই তলে ঘুরছে।

মডেলটি কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এই সঙ্গে যোগ করা দরকার বিরাট একদল ধূমকেতু ও গ্রহাণু। তবে আমাদের মডেলে যতোখানি ছোট করে দেখাতে হচ্ছে তারপরে আর এগুলোকে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। কতকগুলো ধূমকেতুর কক্ষ গ্রহগুলোর সাধারণ তল থেকে বড়ো বেশি কোনাকুনি, আর এত বেশি চ্যাপ্‌টা যে দূরে যখন যায় তখন প্লুটোকে ছাড়িয়েও বহুদূর চলে যায়। তবে যেহেতু সূর্যের টানেই চলাফেরা অতএব কোনো না কোনো সময়ে ফিরেও আসে। গ্রহাণুগুলোর চলাফেরা অবশ্য এতটা এলোমেলো নয়। গ্রহাণু-গুলোকে পাওয়া যাচ্ছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে, সংখ্যায় লাখ-খানেক। সবচেয়ে বড়ো গ্রহাণুটির নাম সিরিজ (Ceres), আড়াআড়ি মাপে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার। আমাদের মডেলে এটির চেহারা দাঁড়াচ্ছে একটি বিন্দুর মতো।

তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সৌরমণ্ডলের মডেল। এমন একটি আকারে যা আমাদের পক্ষে ধারণায় আনা সম্ভব। কিন্তু আট কিলোমিটার ব্যাসের একটি গোলকের জায়গা নিয়ে তৈরি করা এই মডেলে কী দেখা যাচ্ছে? প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, আশ্চর্য-

রকমের ফাঁকা। চোখে পড়ার মতো রয়েছে একমাত্র সূর্য—তাও ৯০ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি গোলক। বাদবাকি আর যা-কিছু আছে সমস্তই ছোট একটি ঠোঙায় ভরে নেওয়া চলে। অথচ জায়গা রয়েছে বিস্তর, এমন যে সূর্য তার জন্যও জায়গা লেগেছে আট কিলোমিটারের মধ্যে মাত্র ৯০ সেন্টিমিটার। তাই গোটা এলাকাটাই যেন একেবারে ফাঁকা।
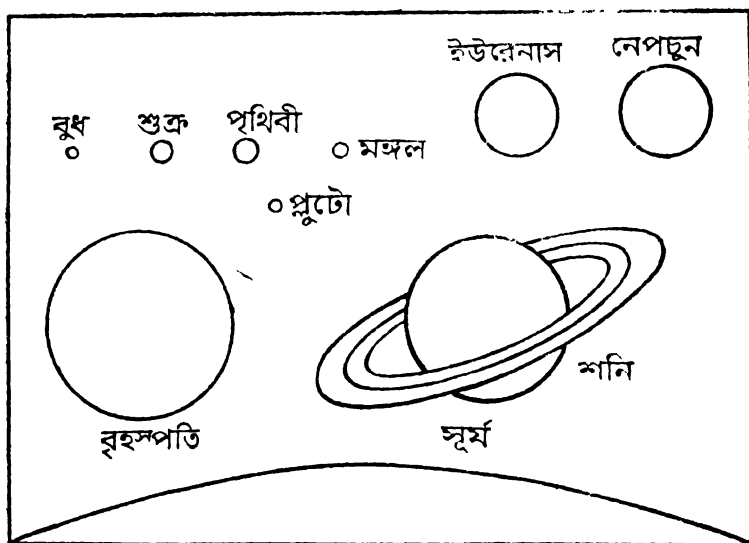
চিত্র ৬। সূর্যের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রহের তুলনাগত আকার।

আমাদের এই মডেলে পৃথিবীটা একটা মটরদানার মতো। সেই মটরদানার গায়ে আমরা মানুষরা তাহলে কী ? আণুবীক্ষণিক অ্যামিবা বললেও বাড়িয়ে বলা হয়। সেই আমরাই কিনা পরিকল্পনা করছি ব্যোমযানে চেপে পেঁপের বিচির মতো অন্য যে এক গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সেইখানে গিয়ে হাজির হব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এমনই আশ্চর্য অগ্রগতি যে এই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বোমযান শুক্রগ্রহে ও মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে দিয়েছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীদের একটি ব্যোমযান তো বৃহস্পতি ছাড়িয়ে প্লুটোর দিকে যাত্রা করেছে।

তারাজগৎ ছায়াপথ

এবারে দেখা যাক সৌরমণ্ডলের বাইরে কী। মনে রাখা দরকার, আট কিলোমিটার জায়গা নিয়ে তৈরি করা আমাদের মডেলটি শুধুই সৌরমণ্ডলের—সূর্য ও সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলা নয়টি গ্রহ এবং ধূমকেতু ও গ্রহাণু নিয়ে তৈরী যে সৌরমণ্ডল। এই যে সব নানা আকারের বস্তু নানা কক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তাদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, যেমন নেই চাঁদের। চাঁদের গা থেকে যেমন সূর্যের আলো ঠিকরে আসে, এই সমস্ত বস্তুর গা থেকেও তাই। নিজস্ব আলো আছে তারাদের। সূর্য কী? সূর্যও একটা তারা, যেমন তারা আছে আরো কোটি কোটি। তারা কিসে বড়ো? বড়ো তার উজ্জ্বলতায়, তার আকারে। এদিক থেকে আমাদের এই সূর্য কিন্তু মোটেই বড়ো তারা নয়।

জানার কৌতূহল হতে পারে, আট কিলোমিটার ব্যাসের পরিসরে তৈরি করা আমাদের এই মডেলে সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারাটিকে যদি দেখাতে হয় তাহলে এই পরিসরকে আরো কতখানি বাড়ানো দরকার? এই স্কেলে, অর্থাৎ দেড়শো-কোটি ভাগ ছোট করে ধরলে, আরো অন্তত ১৯,২০০ কিলোমিটার। এই হচ্ছে সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের তারার দূরত্ব। আর শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে সবচেয়ে দূরের যে-সব তারা দেখা যায় সেগুলো রয়েছে সবচেয়ে কাছের তারার চেয়ে আরো পঞ্চাশলক্ষ গুণ বেশি দূরে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই তারার জগৎকে একটি মডেলে আনতে হলে অন্য স্কেল নেওয়া দরকার। আগেকার মডেলে স্কেল ছিল ১ঃ ১৫০,০০,০০০০০। অর্থাৎ সমস্ত দূরত্ব দেড়শো-কোটি ভাগ ছোট করে দেখানো হয়েছিল। এবারে তারা অনেক অনেক ছোট করে দেখাতে হবে। এবারের স্কেল নেওয়া যাক ১ঃ১৫০,০০,০০,০০০ × ৩,৩০,০০,০০০। অর্থাৎ আগের মডেলে যতো ছোট করে দেখানো হয়েছে, সেই ছোট এবারের মডেলে আরও ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ভাগ ছোট। মোট হিসেবে ৪৯৫-কোটি কোটি (৪৯৫ সংখ্যাটির পরে চোদ্দটি শূন্য) ভাগ ছোট।

আগের মডেলে যে সৌরমণ্ডল ছিল আট কিলোমিটার ব্যাসের একটি গোলক, এই নতুন মডেলে তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটি ফুটকি মাত্র —আড়াআড়ি মাপেএক-সেন্টিমিটারের চল্লিশভাগের প্রায় একভাগ। যে সূর্যের ব্যাস আগের মডেলে ছিল ৯০ সেণ্টিমিটার, এখানকার মডেলে এক-সেণ্টিমিটারের পঁচিশলক্ষ ভাগের একভাগ। এক-সেণ্টিমিটারের পঁচিশলক্ষ ভাগের একভাগ! বিন্দুর চেয়েও ছোট। বলা বাহুল্য, এই মডেলে পৃথক পৃথক গ্রহ দেখানো একেবারেই অসম্ভব। তবে, মনে রাখা দরকার, গ্রহগুলো রয়েছে, তার মধ্যেই আছে পৃথিবী, আর পৃথিবীতে আছে জীবন। আমরা মানুষরা এই পৃথিবী থেকেই বিশ্বকে অবলোকন করছি। সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারাকে আমাদের এই নতুন মডেলে দেখতে পাচ্ছি প্রায় ৭৫ সেণ্টিমিটার দূরে।

এই মডেলের যে চেহারাটি কল্পনা করতে হবে তা আগে আমরা দেখেছি, পেটের দিক মোটা, ধারের দিক সরু একটা চাকতির মতো। এই চাকতির ব্যাস, আমাদের মডেলে, ১৬ কিলোমিটার, পেটের দিক তিন-কিলোমিটারের মতো পুরু। আমাদের মডেলে এই চাকতিটিতে বসাতে হবে দশহাজার কোটি বিন্দু—এক-একটি বিন্দু এক-একটি তারা। এই হচ্ছে একটি গ্যালাক্সি বা তারাজগৎ, আমাদের পৃথিবী যে-তারাজগতের মধ্যে। আগে বলেছি, এই তারাজগৎটিকে ইংরেজিতে বলা হয় মিল্কি ওয়ে (Milky Way), বাংলায় ছায়াপথ। দশ-হাজার কোটি তারা দিয়ে গড়া এই বিরাট তারাজগতে আমাদের সূর্যও একটি তারা মাত্র, বড়োদরের যদিও নয়। এই দশহাজার কোটিতে আছে নানা আকারের তারা—সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড়ো ও বহুগুণ উজ্জ্বল তারার সংখ্যাও অনেক। তবুও আমাদের এই মডেলে এক-একটি বিন্দু বসিয়েই এক-একটি তারাকে বোঝাতে হচ্ছে। অর্থাৎ, দশহাজার-কোটি বিন্দু নিয়ে ষোল-কিলোমিটার ব্যাসের এই চাকতি। আবার বলি, এই আমাদের ছায়াপথ যেখানে এক-একটি বিন্দু এক-একটি তারা, যেমন তারা আমাদের সূর্য। তাহলে এমনও তো হতে

পারে এই দশহাজার-কোটি তারার মধ্যে বহু তারার আছে সূর্যের মতো গ্রহমণ্ডল। সূর্যের যদি গ্রহমণ্ডল থাকতে পারে, অন্য তারার না-থাকার কোনো কারণ নেই। তাই যদি হয় তাহলে সূর্যের গ্রহমণ্ডলে যেমন আছে পৃথিবী, যেমন সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে জীবন, তেমনি জীবন অন্য তারার অন্য গ্রহমণ্ডলের অন্য গ্রহেও তো থাকতে পারে? স্বীকার করতেই হয়, পারে।

যে স্কেলে আমরা মডেলটি তৈরি করেছি সেখানে দশহাজার-কোটি বিন্দু বসালে মনে হতে পারে বিন্দুগুলো বুঝি গায়ে গায়ে লাগানো। মোটেই তা নয়। আরো বড়ো স্কেলে ভাবতে পারলে দেখা যাবে পাশাপাশি দুই বিন্দু যেন চল্লিশ-কিলোমিটার তফাতে তফাতে দুটি সরষের দানা, বা ১,৬০০ কিলোমিটার তফাতে তফাতে দুটি টেনিসবল বা ৩,২০০ কিলোমিটার তফাতে তফাতে দুটি ফুটবল। দুই তারার মধ্যবর্তী মহাশূন্য এতই ফাঁকা।
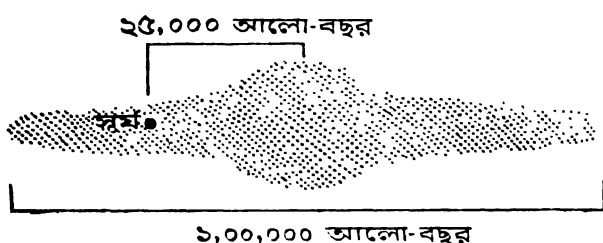
চিত্র ৭। আমাদের ছায়াপথের চেহারা। সূর্য রয়েছে ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে। এত দূরে যে কেন্দ্র থেকে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছতে আলোরও সময় লাগে ২৫,০০০ বছর। চিত্রটি এত ছোট করে আঁকা যে সূর্য ও পৃথিবীকে আলাদা করে দেখানো চলে না ধরে নিতে হয় যেখানে সূর্য সেখানেই পৃথিবী।

ছায়াপথ নামে এই যে আমাদের তারাজগৎ, যেটিকে আমাদের মডেলে দেখছি ষোল কিলোমিটার ব্যাসের একটি চাকতির মতো—সেটিকে "উপর" থেকে দেখলে কেমন দেখায়? প্রকাণ্ড একটা কুণ্ডলী-পাকানো চাকার মতো। চাকাটি ঘুরছে। আমাদের সূর্য রয়েছে একটি কুণ্ডলীতে, কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে দুই-তৃতীয়াংশ দূরে। চাকার

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সূর্যও ঘুরছে এবং চাকার কেন্দ্রের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় নিচ্ছে প্রায় ২০ কোটি বছর।

আমাদের ছায়াপথের এই যে দশহাজার-কোটি তারা, সেগুলো কি সবই আমরা দেখতে পাই? না, খালি চোখে দেখতে পাই বড়ো জোর হাজার চারেক। ১৬ কিলোমিটার ব্যাসের আমাদের মডেলে সূর্যের ৪৫০ মিটার দূরত্বের মধ্যে যে-সব তারা রয়েছে, দেখতে পাই মাত্র সেগুলোকেই। তার বাইরে? দূরবীন হাতে আসার আগে এই 'বাইরে' সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কতদূর বিস্তার আমাদের এই ছায়াপথের? কী আছে আমাদের এই ছায়াপথেরও বাইরে?

মহাবিশ্ব

দূরবীন হাতে আসার পরেই আমরা প্রথম জানতে পারলাম কী বিরাট আমাদের এই ছায়াপথ। আরো জানতে পারলাম এই ছায়াপথই শেষ কথা নয়, এই ছায়াপথ যেমন এক তারাজগৎ তেমনি তারাজগৎ রয়েছে ছায়াপথের বাইরেও। একটি দুটি নয়—হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি তারাজগৎ। চেহারায় ও আকারে নানারকম। তবে মোটামুটি বলা চলে আমাদের এই ছায়াপথেরই মতো—তেমনি একটি চাকতি, তেমনি দশহাজার-কোটি তারা। দূরত্বের হিসেব যদি নিতে হয় তাহলে দেখতে পাব দুই পাশাপাশি তারাজগতের মধ্যেও দূরত্ব বিরাট। যেমন, ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের তারাজগৎটির কথা বলা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে অ্যানড্রোমিডার তারাজগৎ। যে স্কেলে আমাদের তারাজগতের মডেল তৈরি করেছি সেই স্কেলে অ্যানড্রোমিডার তারাজগতের মডেল তৈরি করলে সেটি হয়ে দাঁড়ায় আরেকটু বড়ো আকারের একটি চাকতি।

কিন্তু দুয়ের মাঝে দূরত্ব—আমাদের স্কেলে? তা প্রায় ৩২০ কিলোমিটার। অতঃপর আমাদের এই ছায়াপথ ছেড়ে বাইরের দিকে যেদিকেই যাই না কেন এক-একটি চাকতির দেখা মিলবেই মিলবে। এক-একটি চাকতি মানে দশহাজার-কোটি তারা নিয়ে এক-একটি

পৃথক তারাজগৎ—এক-একটি পৃথক বিশ্ব। মহাশূন্যে রয়েছে এমনি কোটি কোটি তারাজগৎ—কোটি কোটি বিশ্ব। এর কি শেষ নেই? বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন না। আমেরিকার মাউণ্ট পালোমারের ২০০-ইঞ্চি প্রতিফলক দূরবীনে এমন সমস্ত তারাজগতের ছবি তোলা হয়েছে যার দূরত্ব, আমাদের মডেলে, ছায়াপথ থেকে ৩,২০,০০০ কিলোমিটার। এই দূরত্ব কল্পনা করাও শক্ত। আমরা এমন একটা স্কেলে মডেল খাড়া করেছি যেখানে আমাদের সূর্য একটা বিন্দুর শামিল। এমনকি এই স্কেলে তৈরি করা মডেলেও দূরের তারাজগৎ (এখনো পর্যন্ত যতোটা দূর পর্যন্ত সন্ধান চালানো গিয়েছে) রয়েছে পৃথিবী থেকে চাঁদ যতোটা দূরে প্রায় ততোটা দূরে। রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন, রেডিও-দূরবীনের সাহায্যে তাঁরা আরও অনেক অনেক দূরের তারা-জগতের সন্ধান পাচ্ছেন। এ-আলোচনায় আমরা পরে আসব।

পুরো মডেলটি আরো একবার চোখের সামনে তুলে ধরা যাক। গোড়াতেই পরিষ্কারভাবে মনে রাখা দরকার যে ৪৯৫কোটি কোটি (৪৯৫ সংখ্যাটির পরে চোদ্দটি শূন্য) ভাগ ছোট করে মডেলটি তৈরি। মডেলে যে দূরত্ব এক-কিলোমিটার, বাস্তবে তা ৪৯৫কোটি কোটি কিলোমিটার। এই মডেলে আমাদের সূর্য হয়ে গিয়েছে একটি বিন্দুর মতো। এই বিন্দুর চারদিকে ঘুরছে (কল্পনা করে নিতে হবে, মডেলে দেখানো সম্ভব নয়) সূর্যের গ্রহমণ্ডলের সামান্য এক গ্রহ—পৃথিবী। এই সূর্যও তারা হিসেবে সামান্য—আমাদের এই তারাজগতে যে দশহাজার-কোটি তারা রয়েছে তাদের তুলনায়। এই তারাজগৎ আমাদের মডেলে চেহারা ধারণ করেছে একটি চাকতির—১৬ কিলো-মিটার ব্যাস, পেটের কাছে তিন-কিলোমিটার পুরু। পৃথিবী থেকে দূরবীনের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই আমাদের তারাজগতের বাইরে মহাশূন্যে ছড়ানো রয়েছে আরো কোটি কোটি তারাজগৎ। দূরবীন দিয়ে যতোদূর পর্যন্ত দেখা যায় তাতে, আমাদের মডেলের স্কেলে, ৩,২০,০০০ কিলোমিটার দূরেও চারদিকে তারাজগতের সন্ধান মেলে। রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, তারাজগতের সন্ধান তাঁরা পাচ্ছেন আরো অনেক অনেক দূর পর্যন্ত।

এই হচ্ছে আমাদের মহাবিশ্ব, এখনো পর্যন্ত যতোটা জানতে পেরেছি।

রাতের আকাশে তারা

অন্ধকার পরিষ্কার রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় সারা আকাশ তারায় ভরে আছে। কত তারা, কত তারা। অবশ্য এইসব তারার মধ্যে গোটাকতক গ্রহও থাকতে পারে। থাকলে চিনে নেওয়া অসম্ভব নয়। তারা ঝিকমিক করে, গ্রহ করে না। যাই হোক, এই সমস্ত তারাই কিন্তু আমাদের নিজস্ব তারাজগতের—ছায়াপথের। অন্য সব তারাজগতের দু-একটিকে আমরা আবছা আলোর একটা ছোপ হিসেবে দেখতে পাই মাত্র। কিন্তু ছায়াপথের সব তারাকেই কি দেখতে পাই? না। খালি চোখে দেখি বড়ো জোর হাজার চারেক, দূরবীন দিয়ে অবশ্যই আরো বেশি। কিন্তু ছায়াপথের দশহাজার-কোটি তারাকে একসঙ্গে কখনোই নয়।

যে হাজার চারেক তারা দেখতে পাই তাদের চিনে রাখার কি কোনো উপায় আছে? তারাভরা রাতের আকাশের দিকে তাকালে এমনিতেই তো দিশেহারার মতো অবস্থা হয়। সেখানে এমন কোনো বিশেষ লক্ষণ কি আছে যা দিয়ে অন্তুতপক্ষে চোখে দেখতে পাওয়া তারাগুলোকে আলাদা আলাদা চিহ্নিত করা চলে?

তারামণ্ডল

ঘন একটা জঙ্গলকে চিনে রাখতে হলে আমরা কী করি? চিনে রাখি সেখানকার বিশেষ বিশেষ গাছ, বিশেষ বিশেষ ঝোপ, গাছের ও ঝোপের বিশেষ বিশেষ জটলা, ইত্যাদি। আকাশের বেলাতেও তাই করা যেতে পারে। আকাশের কতকগুলো চিহ্ন কি খুঁজে বার করা যায় না?

তাহলে দেখতে হয় আকাশের দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে আগে কার ওপরে চোখ পড়ে—কোন তারার ওপরে, বা, কোন তারার ঝাঁকের

ওপরে। কোনো তারা যদি অন্য সব তারার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয় তাহলে সেই তারার ওপরে চোখ পড়ে। তারার একটি ঝাঁক যদি বিশেষ চেহারার হয় তাহলে সেই ঝাঁকের ওপরে চোখ পড়ে। এমনি বিশেষ চেহারা নিয়ে ফুটে ওঠা তারার ঝাঁককে বলা হয় তারামণ্ডল (Constellation)। তবে মনে রাখা দরকার, তারার ঝাঁক বলতে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে চোখে যা দেখা যাচ্ছে তারই একটা ধারণা দেবার চেষ্টা মাত্র। তাই বলে এই তারাগুলো সত্যি সত্যিই ঝাঁক বাঁধেনি, যে অর্থে ঝাঁক বলা হয় বিশেষ চেহারা নিয়ে উড়ে যাওয়া একদল পাখিকে। ঝাঁক বললে মনে হতে পারে এই তারাগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি। কিন্তু শুধু চোখের দেখায় তারার দূরত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই হয় না। উজ্জ্বলতা সম্পর্কে ধারণা হতে পারে বটে কিন্তু সেটাও নির্ভরযোগ্য ধারণা নয়।

যাই হোক, তারামণ্ডলের চেহারা কিন্তু বজায় থাকে এবং সেগুলোকে সহজেই চেনা যায়। মহাকাশের ঠিকানা জানতে হলে এমনি কতকগুলো তারামণ্ডল ও তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা চিনে নিতে হবে এবং সেইসব চেনা চিহ্ন ধরে ধরে এগোতে হবে। কাজটা শক্ত নয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করলে গোটা পনেরো তারামণ্ডল চিনে নেওয়া সম্ভব। সেজন্য বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন নেই—একজোড়া চোখ, একটি আকাশের তারার মানচিত্র ও সেই মানচিত্র দেখার জন্য একটি ছোট টর্চ থাকলেই কাজ চলে যায়।

সপ্তর্ষি

প্রথমে একটি বিশেষ তারামণ্ডলকে চিনতে হবে, তারপরে সেখান থেকে শুরু করে অন্যান্য তারামণ্ডলকে। উত্তর গোলার্ধের আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। উত্তরাকাশের এই তারামণ্ডলের দিকে সহজেই চোখ পড়ে। চেহারা খানিকটা প্রশ্নচিহ্নের মতো, কিংবা আগেকার কালের লাঙলের মতো (এজন্য

ইংরেজিতে সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক নাম 'প্লাউ'), কিংবা, কল্পনা করা চলে, সাতটি তারায় যেন একটি ভালুকের মূর্তি (এজন্য ইংরেজিতে বলে 'গ্রেট বেয়ার' বা 'উরসা মেজর')। হিন্দু জ্যোতিষে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি উজ্জ্বল তারার নাম সাতজন আর্য ঋষির নামে—যথা, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। বশিষ্ঠের পাশে একটি ছোট তারা আছে, তার নাম অরুন্ধতী (বশিষ্ঠের স্ত্রী)। একটি জিনিস লক্ষ করার মতো—তারামণ্ডলের নাম দেওয়া হয়ে থাকে জন্তুজানোয়ারের নামে কিংবা পৌরাণিক চরিত্রের নামে। ব্যাপারটা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। এই নামের সূত্র ধরে তারামণ্ডলকে চিনতে বিশেষ কোনো সহায়তা হয় না।

ধ্রুবতারা

প্রশ্নচিহ্নের মতো চেহারার সপ্তর্ষিমণ্ডলের মাথার দুটি তারাকে (পুলহ ও ক্রতু) বলা হয় নির্দেশক। এই দুটি তারাকে একটি রেখার দ্বারা যুক্ত করলে এবং সেই রেখাটি বাড়িয়ে দিলে একটি উজ্জ্বল তারায় পৌঁছানো চলে। শেষোক্ত এই উজ্জ্বল তারাটির নাম ধ্রুবতারা (Polaris বা Pole Star)। 'ধ্রুব' নামটি অতি যথার্থ। কেননা, উত্তর গোলার্ধের আকাশে একমাত্র এই তারাটি স্থির ও অনড় থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল—শুধু সপ্তর্ষিমণ্ডল কেন, অন্য সমস্ত তারামণ্ডল ও তারা—এই ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করেই ঘোরে। কেন? আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার, নইলে মহাকাশের ঠিকানা অস্পষ্ট থেকে যাবার সম্ভাবনা।

আহ্নিক আবর্তন

পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে, যাকে বলা হয় পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তন। এই ঘোরা পশ্চিম থেকে পুবে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘুরছি। এই ঘুরন্ত অবস্থায় আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই তখন আমাদের কী মনে হতে পারে? আমরা নিজেরাই যে

ঘুরছি তা তো আর টের পাই না—মনে হয় আকাশটাই ঘুরছে, অর্থাৎ আকাশের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ইত্যাদি। ঘুরছে পুব থেকে পশ্চিমে। তাই চন্দ্র সূর্য ও গ্রহকে আমরা দেখি পুবদিকে উদয় হতে ও পশ্চিমদিকে অস্ত যেতে। কিন্তু তারাগুলো রয়েছে পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে। এত বেশি দূরে যে সূর্যের চারদিকে ঘোরার জন্য মহাশূন্যে পৃথিবীকে যতোখানি জায়গা বদলাতে হয় (শীত থেকে গ্রীষ্মে—এই ছ' মাসের সূর্য-প্রদক্ষিণে ৩০ কোটি কিলোমিটার) তার দরুন পৃথিবী থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে তাকিয়েও তারাগুলোকে জায়গা বদলাতে দেখা যায় না। অর্থাৎ তারাগুলো যেন সারা বছর ধরেই স্থির। কিন্তু পৃথিবী যে নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে, তার দরুন পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে ঘুরছে যেন তারাগুলোই। কি-ভাবে? না, পৃথিবীরই অক্ষের চারদিকে—পুব থেকে পশ্চিমে। অর্থাৎ, পৃথিবীর অক্ষটিকে বাড়াতে বাড়াতে যদি আকাশের গায়ে ঠেকানো যায় তাহলে আকাশের যে বিন্দুটিতে গিয়ে এই অক্ষ ঠেকছে, সেই বিন্দুটিরই চারদিকে তারাগুলো ঘুরছে মনে হবে। আর এই বিন্দুটির খুব কাছাকাছি একটি তারা পাওয়া যাচ্ছে, তারই নাম ধ্রুবতারা। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে এই ধ্রুবতারাকে ঘিরে অন্য তাবৎ তারা ঘুরছে। ধ্রুবতারার কিন্তু নড়নচড়ন নেই, ধ্রুবতারা স্থির।

ক্যাসিওপিয়া

কল্পনা করা যাক ধ্রুবতারা রয়েছে একটি ঘড়ির ডায়ালের কেন্দ্রে আর সপ্তর্ষির মাথার দুটি তারা থেকে টানা লাইনটি এসেছে ঘণ্টা ছয় দিয়ে। এবারে ঘণ্টা এক দিয়ে একটি লাইন টানলে অপর একটি তারামণ্ডলে পৌঁছনো চলে। ইংরেজি W অক্ষরের মতো চেহারার এই তারামণ্ডলে আছে পাঁচটি উজ্জ্বল তারা, নাম ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia) বা কাশ্যপী। কল্পনা করা হয়েছে এক মহীয়সী মহিলা (ক্যাসিওপিয়া) কৌচে উপবিষ্টা, তিনি তাঁর কন্যা অ্যানড্রো-

চিত্র ৮। সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা ও ক্যাসিওপিয়ার অবস্থান
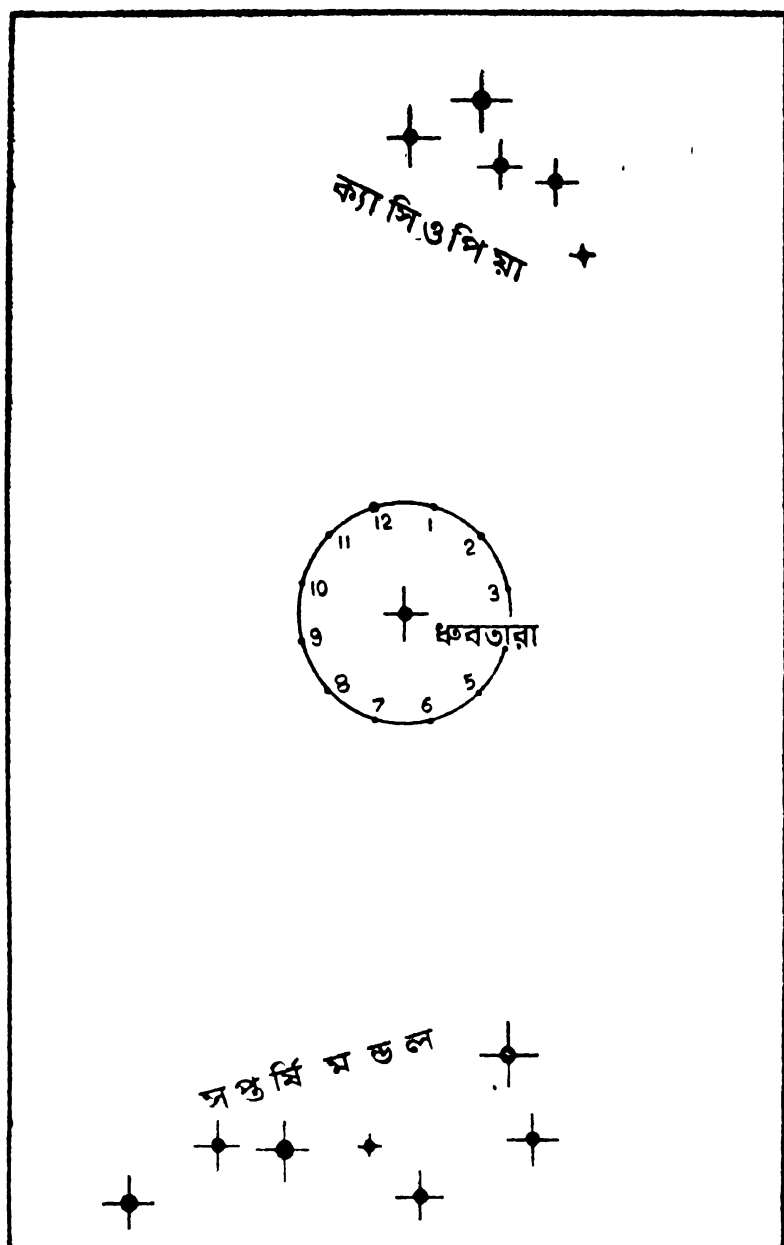
মিডার বলিদান দেখছেন। পাঁচটি তারায় মহিলার অবয়বের বিভিন্ন অংশ কল্পিত।

অ্যান্‌ড্রোমিডা

ধ্রুবতারা থেকে যে রেখাটি ধরে ক্যাসিওপিয়ার প্রান্তে পৌঁছনো গিয়েছে সেই রেখা ধরে আরও অগ্রসর হলে পাওয়া যায় লম্বা একটি বৃত্তচাপের মতো ছড়ানো একটি তারামণ্ডল, নাম অ্যান্‌ড্রোমিডা
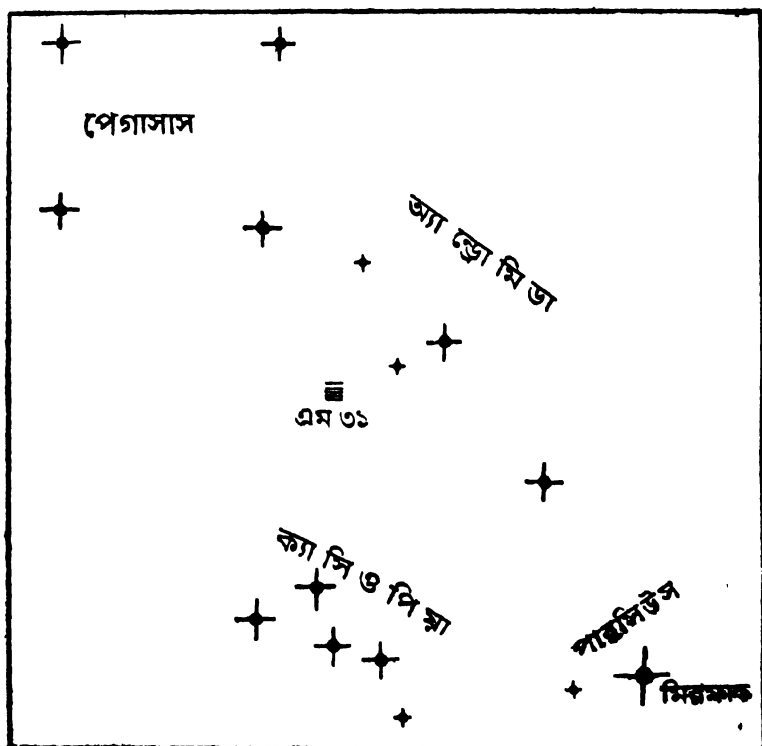
চিত্র ৯। অ্যান্‌ড্রোমিডা ও বিখ্যাত তারাজগৎ এম ৩১

(Andromeda)। এই তারামণ্ডলের ভিতরের দিকে তাকালে আবছায়া আলোর একটা ছোপ চোখে পড়ে। এই হচ্ছে বিখ্যাত 'এম ৩১' নীহারিকা। খালি চোখে তাকালে আবছায়া আলোর একটা ছোপ মাত্র, কিন্তু শক্তিশালী যন্ত্রে বহুক্ষণ ধরে তোলা

ছবিতে ধরা পড়ে এটি একটি পৃথক তারাজগৎ (গ্যালাক্সি) বা বিশ্ব, ছায়াপথ নামক আমাদের তারাজগৎ বা বিশ্বের বাইরে। অ্যান্ড্রো-মিডার তারাজগতের একটি ছবি এই বইয়ে দেওয়া হল। বিজ্ঞানীরা বলেন, অ্যান্ড্রোমিডার তারাজগৎ থেকে আমাদের তারাজগতের একটি ছবি যদি তোলা হয় তাহলে ঠিক এই রকমটিই দেখাবে। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে অ্যান্ড্রোমিডা হচ্ছে রাজা সিফিউস (Cepheus) ও রানী ক্যাসিওপিয়ার কন্যা, একটি পাথরের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে তাকে সামুদ্রিক দানবের কাছে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তাকে উদ্ধার করে পারসিউস (Perseus)।

পেগাসাস

ধ্রুবতারার ঘড়ির ঘণ্টা বারো দিয়ে টানা রেখা ধরে এগিয়ে এলে অ্যান্ড্রোমিডা বৃত্তাংশের প্রান্তে পাওয়া যায় চারটি তারার একটি বর্গক্ষেত্রাকার তারামণ্ডল, নাম পেগাসাস (Pegasus)। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে পেগাসাস হচ্ছে পক্ষিরাজ ঘোড়া। লক্ষ করবার বিষয় এই যে এই বর্গক্ষেত্রের এককোণের একটি তারা অ্যান্ড্রোমিডা তারামণ্ডলেরও অন্তর্ভুক্ত। এই তারার অপর নাম আল্‌ফা-অ্যান্ড্রোমিডী।

পারসিউস

একই ভাবে, অ্যান্ড্রোমিডা বৃত্তচাপের অপর প্রান্তে যে তারাটি তা অপর একটি তারামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, তার নাম পারসিউস (Perseus)। গ্রীক পুরাণের এই বীর মেডুসার ছিন্ন মাথা দেখিয়ে জল-দানবকে পাথরে পরিণত করে এবং অ্যান্ড্রোমিডাকে উদ্ধার করে। মিরফাক-এর অপর নাম আল্‌ফা-পারসিয়াই।

আল্‌ফা হচ্ছে গ্রীক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। তারপরে বিটা, তারপরে গামা, ইত্যাদি। তারামণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটিকে বোঝানো হয় আল্‌ফা অক্ষর দিয়ে, দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারাটিকে

বিটা অক্ষর দিয়ে, তৃতীয় উজ্জ্বল তারাটিকে গামা অক্ষর দিয়ে, ইত্যাদি। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। যেমন সপ্তর্ষি-

চিত্র ১০। পারসিউস, মিরফাক ও এল্‌গল
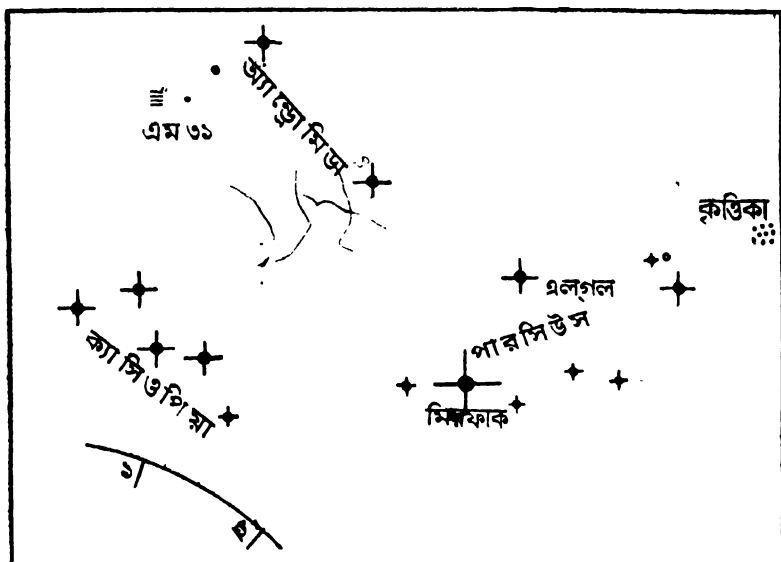
মণ্ডলের তারাগুলো আল্‌ফা বিটা গামা ইত্যাদি লাভ করেছে ক্রমানুসারে। ফলে দ্বিতীয় উজ্জলতম হওয়া সত্ত্বেও প্রথম তারাটিকে বলা হয় আল্‌ফা, দ্বিতীয়টিকে বিটা, উজ্জ্বলতম হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয়টিকে গামা।

প্লাইয়াড

পারসিউস তারামণ্ডলের যেদিকে ধ্রুবতারা তার অন্যদিকে কিছুদূরে পাওয়া যায় একগুচ্ছ আবছা তারা, নাম প্লাইয়াড (Pleiades) বা কৃত্তিকা। এই প্লাইয়াডরা হচ্ছে অ্যাটলাস ও প্লাইওনের সাত মেয়ে। বলা হয়, খালি চোখে আটটি তারা দেখা যেতে পারে—কিন্তু ছটির বেশি সাধারণত দেখা সম্ভব হয় না। তবে দূরবীনে অনেকগুলো দেখা যায়।

পারসিউস বৃত্তচাপের জ্যা হিসেবে একটি রেখা কল্পনা করে নিলে তার মাঝামাঝি জায়গায় পাওয়া যায় এমনএকটি তারা যার উজ্জ্বলতা বাড়ে কমে, নাম এল্‌গল (Algol) বা বিটা পারসিআই।
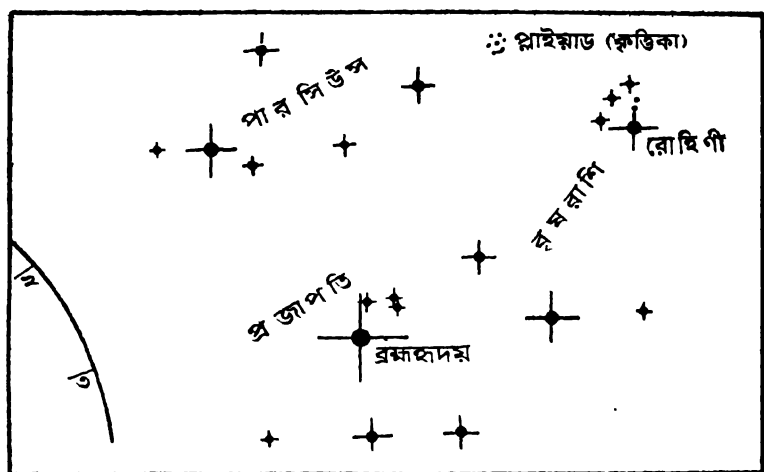
চিত্র ১১। প্লাইয়াড (কৃত্তিকা), ব্রহ্মহৃদয়, প্রজাপতি, বৃষরাশি ও রোহিণী

বৃষরাশি

ধ্রুবতারার ঘড়ির ঘণ্টা তিন বরাবর রেখা টানলে আমরা প্রথমে পাই উজ্জ্বল একটি তারা, নাম ব্রহ্মহৃদয় (Capella)। তারাটি যে তারামণ্ডলে রয়েছে তার নাম প্রজাপতি (Auriga)। এই রেখা ধরে আরো এগিয়ে গেলে পাই বৃষরাশি (Taurus)। ত্রিভুজাকার পাঁচটি তারায় বৃষের মাথা আর উজ্জ্বল লাল একটি তারায় (রোহিণী বা Aldebaran) বৃষের একটি চোখ।

কালপুরুষ

ধ্রুবতারার ঘড়ির ঘণ্টা চার বরাবর রেখা টেনে ধ্রুবতারা থেকে বেশ খানিকটা দূরে পাওয়া যায় অত্যন্ত চোখে পড়ার মতো একটি তারা-মণ্ডল—কালপুরুষ বা ওয়ারন (Orion)। গ্রীক পুরাণে ওরায়ন এক

শিকারী। কল্পনা করা হয়েছে বিরাট এক পুরুষ যেন মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে, অন্য হাতে ধনুক কিংবা ঢাল, কোমরে কোমরবন্ধ, কোমরবন্ধ থেকে ঝুলন্ত তলোয়ার। তিনটি তেরছা তারায় কল্পিত এই কোমরবন্ধ দেখেই কালপুরুষকে সবচেয়ে সহজে চেনা যায়।

চিত্র ১২। কালপুরুষ, লুব্ধক ও বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডল
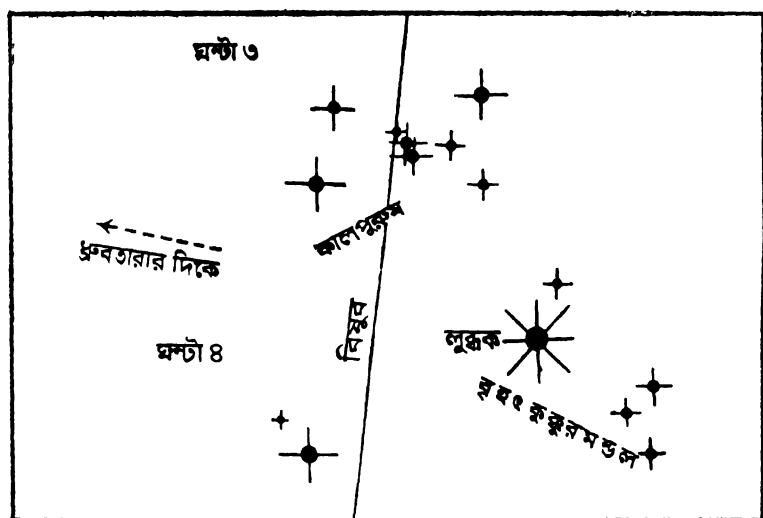
কালপুরুষ ধ্রুবতারা থেকে এত দূরে যে ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে হলে অনেকখানি বড়ো বেড় দিতে হয়। তার ফলে এমনকি নাতি-শীতোষ্ণ মণ্ডলের অক্ষাংশেও কালপুরুষ অনেকখানি সময় দিগন্তের নিচে থাকে। অর্থাৎ কালপুরুষের উদয় ও অস্ত আছে। অক্টোবর মাসে কালপুরুষের উদয় রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে এবং সারা শীতকাল ধরে এই তারামণ্ডলটি আকাশে বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে থাকে। মার্চমাস নাগাদ কালপুরুষ মধ্যরাতের আগেই অস্ত যায়। গ্রীষ্মকালে কালপুরুষকে দেখা যায় না।

ধ্রুবতারাকে ঘিরে তারার ঘোরার ব্যাপারটা আরো একবার পরিষ্কার করতে চাই। ধ্রুবতারাকে কোন বিন্দু হিসেবে ধরা হচ্ছে? না, পৃথিবীর অক্ষকে বাড়াতে বাড়াতে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে এলে যে

বিন্দুতে ছেদ করে সেই হচ্ছে ধ্রুবতারা। পৃথিবীর অক্ষ কী? পৃথিবীর দুই মেরু দিয়ে বিদ্ধ একটি শলাকা যেন, যার চারদিকে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তন হয়ে চলেছে। তাহলে মেরু অঞ্চলের আকাশে ধ্রুবতারা কোথায় থাকবে? আকাশের ঠিক মধ্যরেখায় অর্থাৎ ঠিক মাথার ওপরে। তাহলে মেরু-অঞ্চলের এই আকাশে উত্তর গোলার্ধের কোনো তারাই অস্ত যাবে না, বা, বলা হয়ে থাকে
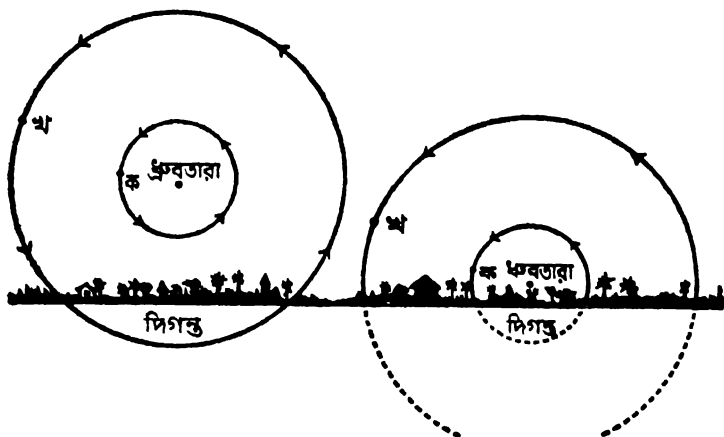
চিত্র ১৩। অনস্তগ ও অস্তগ তারা। উত্তর গোলার্ধের আকাশ দেখানো হয়েছে। বাঁদিকের ছবিতে 'ক' তারাটি ধ্রুবতারা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এই তারাটি অনস্তগ, অর্থাৎ, কোনো সময়েই অস্ত যায় না। 'খ' তারাটি অস্তগ। দৈনিক আবর্তনে এই তারাটি কিছু সময়ের জন্য দিগন্তের নিচে চলে যায়। ডানদিকে দেখানো হয়েছে আরো দক্ষিণের একটি অঞ্চল। এখানে ধ্রুবতারা আরো নিচে। 'ক' ও 'খ' কোনো তারাই এখানে অনস্তগ নয়, দুটি তারাই অস্ত যায়।

সমস্ত তারাই অনস্তগ (circumpolar)। তারপরে মেরু-অঞ্চল থেকে যতোই বিষুব-অঞ্চলের দিকে নামা যাবে ততোই ধ্রুবতারাও আকাশের মধ্যরেখা থেকে দিগন্তরেখার দিকে নামতে থাকবে। নামতে নামতে অবশেষে বিষুব অঞ্চলে একেবারে দিগন্তরেখায়। এখানকার আকাশে কোনো তারাই অনস্তগ নয়। মাঝামাঝি অঞ্চলে কিছু তারা অনস্তগ, কিছু তারা অস্তগ।

লুব্ধক

ঘড়ির ঘণ্টা চার বরাবর টানা রেখা ধরে অনেকখানি এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি—লুব্ধক বা সিরিয়াস (Sirius)। এটি যে তারামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত তার নাম বৃহৎ কুকুরমণ্ডল (Canis Major)। ধ্রুবতারা থেকে এতই দূরে যে উত্তরের অক্ষাংশে লুব্ধক কখনো আকাশের খুব উঁচুতে ওঠে না।
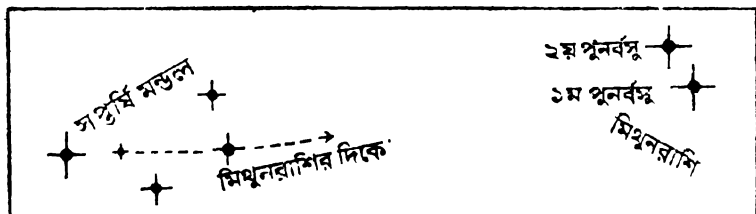
চিত্র ১৪। সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে মিথুনরাশি

আকাশে লুব্ধকের পরে দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা হচ্ছে অগস্ত্য (Canopus)। এটিও ধ্রুবতারা থেকে অনেক দূরে।

মিথুনরাশি

ঘড়ির ঘণ্টা সাড়ে-চ. ্র বরাবর রেখা টেনে ধ্রুবতারা থেকে পেগাসাস যতোটা দূরে ততোটা দূরে গেলে পাওয়া যায় দুটি উজ্জ্বল তারা—প্রথম পুনর্বসু (Pollux) ও দ্বিতীয় পুনর্বসু (Castor)। এই যুগল তারা রয়েছে মিথুনরাশিতে (Gemini)।

সিংহরাশি

ঘড়ির সংখ্যা ছয় বরাবর রেখা টানলে, অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ক্রতু ও পুলহকে যুক্ত করে যেদিকে ধ্রুবতারা তার বিপরীত দিকে বাড়িয়ে দিলে পাওয়া যায় সিংহরাশি (Leo বা Lion)। সিংহরাশির দুটি সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হচ্ছে উত্তরফাল্গুনী (Pleonis বা Denebola)

এবং মঘা (Leonis বা Regulus)। উত্তরফাল্গুনী রয়েছে সিংহের লেজে, মঘা অন্যদিকে।

এই তো গেল ধ্রুবতারা-কেন্দ্রিক আমাদের কল্পিত ঘড়ির ডায়ালে বারোটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত দিকের বিভিন্ন তারা ও তারামণ্ডল। এবারে
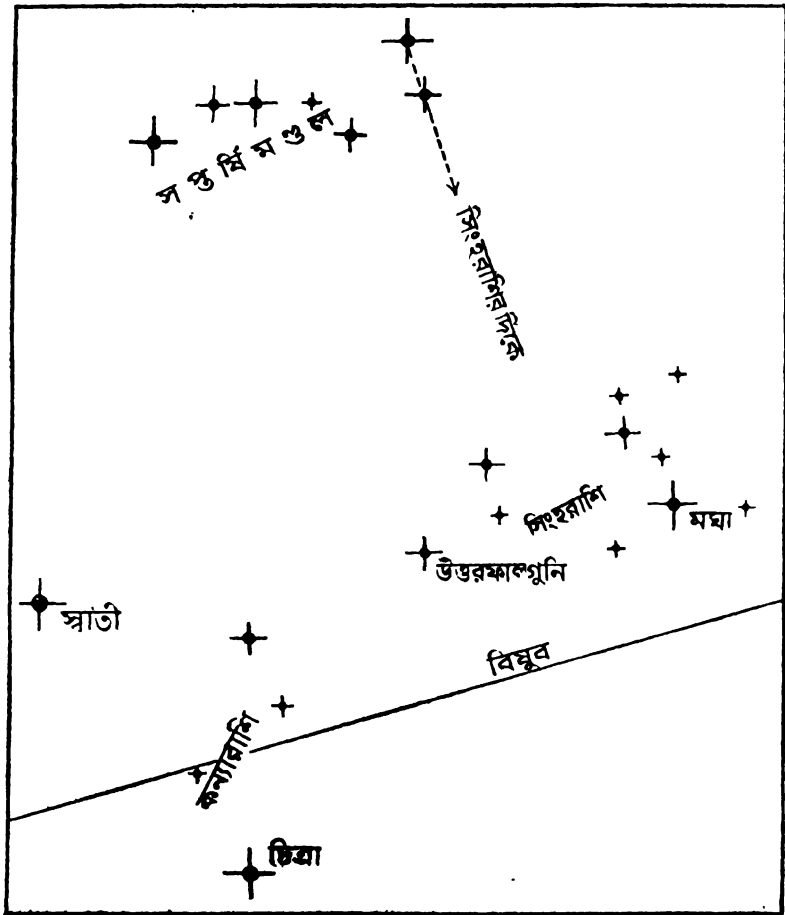
চিত্র ১৫। সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে সিংহরাশি, কন্যারাশি, চিত্রা ও স্বাতী

আমরা তাকাব ছ'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত দিকের তারা ও তারামণ্ডলের দিকে।

ঘড়ির ঘণ্টা আট বরাবর রেখা টেনে এগিয়ে গেলে সপ্তর্ষিমণ্ডলের

প্রশ্নচিহ্নের নিচের দিকে পাওয়া যায় বুয়েটিস তারামণ্ডল। এই তারামণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হচ্ছে স্বাতী (Booetis বা Arcturus)।

বৃশ্চিকরাশি ও অন্যান্য

এই রেখা ধরে আরো দক্ষিণের দিকে গেলে যে তারামণ্ডলটি পাওয়া যায় তার নাম বৃশ্চিকরাশি (Scorpio)। এই বৃশ্চিকরাশির মধ্যেই রয়েছে একটি লাল তারা—জ্যেষ্ঠা (Antares)।
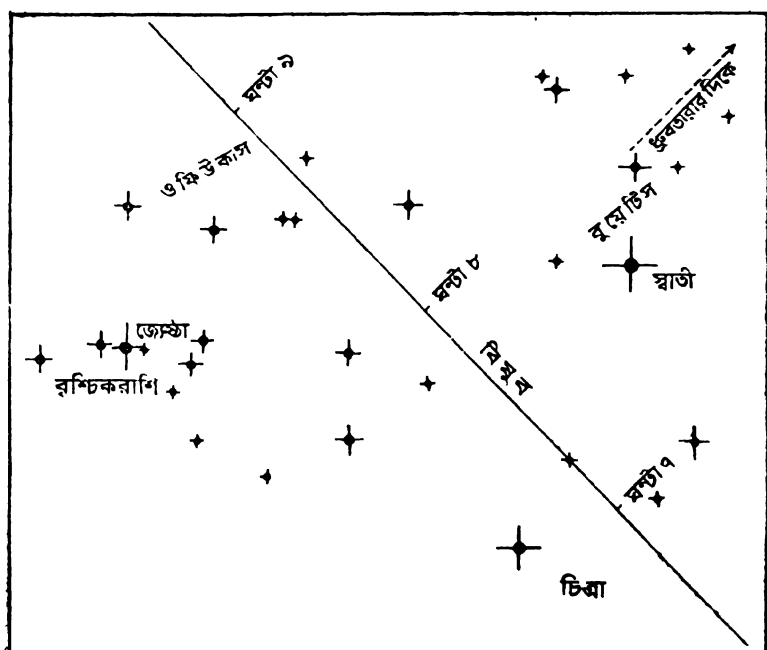
চিত্র ১৬। বুয়েটিস, স্বাতী, বৃশ্চিকরাশি ও জ্যেষ্ঠা

ঘড়ির দশ ও এগারোর দিকে রয়েছে তিনটি উজ্জ্বল তারা—বীণা-মণ্ডলের (Lyra) অভিজিৎ (Vega), হংসমণ্ডলের (Cygnus বা Swan) দেনেব (Deneb, এটি একটি আরবী শব্দ যার অর্থ লেজ),

শ্যেনমণ্ডলের (Aquila বা Eagle) শ্রবণা (Altair)। হংসমণ্ডলে আছে পাঁচটি তারা—এই পাঁচটি তারার সাহায্যে উড়ন্ত হাঁসের মূর্তি সহজেই কল্পনা করা চলে।
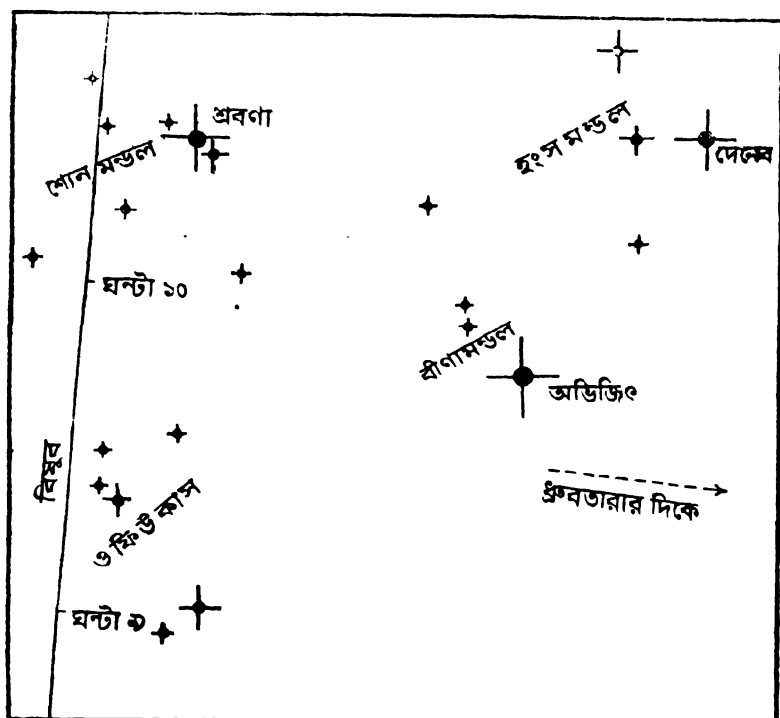
চিত্র ১৭। বীণামণ্ডল, হংসমণ্ডল ও শ্যেনমণ্ডল

উত্তর গোলার্ধের আকাশে গোটা পনেরো তারামণ্ডলের পরিচয় দেওয়া হল। এই পনেরোটি তারামণ্ডল চিনে নেওয়া ও তাদের উজ্জ্বলতম তারার নাম মনে রাখা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। মোটা-মুটি এই পনেরোটি তারামণ্ডল চিনে নিতে পারলে মহাকাশের ঠিকানার কতকগুলো দিক্‌চিহ্নের হদিশ পাওয়া যায়। অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দিশেহারা হবার আর কোনো কারণ থাকে না।

আকাশের সূর্য ও পৃথিবী

রাশিচক্রের কথা আগে বলেছি। লক্ষ করবার বিষয়, রাশিচক্রের সবকটি তারামণ্ডলের নাম আগের আলোচনায় উল্লিখিত পনেরোটির মধ্যে আসে নি। বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা তোলার আগে কতকগুলো ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার।

প্রকৃত ও প্রতীয়মান

আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাদের কী মনে হয়? আকাশটা যেন একটা গোলক যার ঠিক মাঝখানটিতে আমাদের এই পৃথিবী—আমরা অবশ্য গোলকের আধখানা দেখি। কি সূর্য কি চন্দ্র, কি গ্রহ কি নক্ষত্র, সমস্ত জ্যোতিষ্কই যেন চলাফেরা করছে এই গোলকের ভিতরদিকের গায়ে গায়ে। এমনটি যে আমরা দেখি তার কারণ আমাদের চোখের দৃষ্টির পাল্লা খুব একটা বেশি নয়—দূরের জিনিসের কোনটা বেশি-দূরে আর কোনটা কম-দূরে তা আমরা ধরতে পারি না। দিগন্তে যদি গাছপালা থাকে তাহলে কি আমরা শুধু চোখের দেখায় বুঝতে পারি কোন গাছ সামনে আর কোন গাছ পিছনে? পারি না, সামনের পিছনের সমস্ত গাছ মিলেমিশে দিগন্তরেখায় অরণ্যের একটি ছোপ হয়ে ফুটে ওঠে। তেমনি আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ককে দেখি একটি গোলকের গায়ে স্থিত অবস্থায়—চন্দ্রকে, সূর্যকে, গ্রহকে, নক্ষত্রকে। তার মানে, এই যে গোলকটি দেখছি তা হচ্ছে আমাদের চোখের দেখার সীমানা—যেদিকেই তাকাই এই সীমানা পর্যন্ত দৃষ্টি। তার মানে, এই যে আমি, যার চোখ দিয়ে দেখা চলছে, তার চোখের দেখার সীমানাটাই হয়ে উঠছে একটা ঘের। পায়ের তলায় মাটি থাকার জন্য নিচের দিকে দৃষ্টি যায় না, বাকি সমস্ত দিকেই এই ঘের তৈরি হয়ে যায়। তাই চোখের দেখায় মনে হয়

পৃথিবীর মাটির ওপরে একটা গোলক যেন উপুড় করা, অর্থাৎ গোল আকাশ। গোলকটি প্রকৃত নয়, প্রতীয়মান (apparent)।

হোক প্রতীয়মান, কিন্তু এই প্রতীয়মানকেই প্রকৃত ধরে নিয়ে যদি সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের চলাফেরার হিসেব রাখতে যাই তাহলে কোনো ভুল নয় না। যেমন, ছুটন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকানো যাত্রীর মনে হয় সে নিজে স্থির কিন্তু সামনের মাঠঘাট পিছনদিকে ছুটছে। মাঠঘাটের এই পিছু-ছুট প্রকৃত নয়, প্রতীয়মান। কিন্তু এই প্রতীয়মান ছুটকেই প্রকৃত ছুট ধরে নড়াচড়ার হিসেব করলে কোনো ভুল হয় না। তেমনি আকাশের তারাগুলো যে ধ্রুবতারাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে, তাও প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে পাক খাচ্ছে পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে। সূর্য পুবে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়—নিত্যদিনের সূর্যের এই ছুটও প্রতীয়মান।

কিন্তু পৃথিবী তো শুধু নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খায় না, কক্ষপথে সূর্যের চারদিকেও ঘোরে। পৃথিবীর এই যে কক্ষ-পরিক্রমা তার দরুনও কিছু না কিছু নড়াচড়া অবশ্যই প্রতীয়মান হওয়া উচিত।

তারাগুলো পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে পৃথিবী যখন তার কক্ষ-পথের এক মাথা থেকে অপর মাথায় পৌঁছয় (যেমন ধরা যাক, গ্রীষ্ম-কালের অবস্থান থেকে শীতকালের অবস্থানে), বা বলা যেতে পারে, মহাশূন্যের এক বিন্দু থেকে ত্রিশকোটি কিলোমিটার দূরের অপর এক বিন্দুতে সরে আসে, তখনো কিন্তু কোনো তারার দিকে তাকিয়ে মনে হয় না কোনোরকম নড়াচড়া ঘটেছে। যেমন ছিল তাই যেন আছে, আশেপাশের অন্য সমস্ত তারা থেকে কোনোদিকেই সরে যায় নি। সপ্তর্ষির এই প্রশ্নচিহ্নের মতো চেহারা মহেন-জো-দাড়োর আমলে ঠিক এই রকমটিই ছিল। তবে মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক তারারই নিজস্ব গতি আছে, তার দরুন অবশ্যই কিছুটা নড়াচড়া হওয়া উচিত—কিন্তু তার প্রতীয়মান চেহারা এতটা দূর থেকে কখনোই এমন মাত্রার নয় যে হাজার কয়েক বছরের মধ্যে চোখে পড়ার মতো হতে পারে।

সূর্যের বেলায় কিন্তু চোখে পড়ার মতো। পৃথিবীর এই যে কক্ষ-

পরিক্রমা তার দরুন সূর্যের একটা প্রতীয়মান চলা ঘটে যায়। আমরা জেনেছি, পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তনের দরুন সূর্য পুবে ওঠে আর পশ্চিমে অস্ত যায়। সূর্যের এই চলা এক্ষেত্রে আমরা বিবেচনা করব না—কেননা সেটা ঘটছে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তনের দরুন। এ-ছাড়া সূর্যের আর কী চলা আছে? সেটা এই যে সূর্য কখনো দক্ষিণদিকে সরতে থাকে, কখনো উত্তরদিকে। যেমন, ২২শে ডিসেম্বর থাকে সবচেয়ে দক্ষিণে, তারপরে উত্তরদিকে সরতে শুরু করে, সরতে সরতে ২১শে মার্চ তারিখে ঠিক পুবে, ২২শে জুন তারিখে সবচেয়ে উত্তরে। তারপরে আবার দক্ষিণ দিকে সরতে সরতে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঠিক পুবে, ২২শে ডিসেম্বর তারিখে আবার সবচেয়ে দক্ষিণে। এই হচ্ছে পুরো একবছরে সূর্যের প্রতীয়মান চলা। আবার বলছি, প্রকৃত চলাটা পৃথিবীর—পুরো একবছর ধরে সূর্যের চারদিকে তার কক্ষ-পরিক্রমা। আমরা টের পাই পৃথিবীর চলা নয়, সূর্যের প্রতীয়মান চলা।

প্রকৃত ও প্রতীয়মান—এই দুটি ব্যাপার সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হলে তবেই আমরা আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

খ-গোল ইত্যাদি

প্রথমে কয়েকটি সংজ্ঞা: আমাদের চোখের দেখার সীমানায় তৈরি হওয়া যে প্রতীয়মান গোলকটির কথা বলেছি, যার গায়ে গায়ে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র চলাফেরা করে, তার নাম খ-গোল (Celestial Sphere)। পৃথিবীর বিষুবতল যদি ক্রমশ বড়ো হতে হতে খ-গোল পর্যন্ত বেড়ে ওঠে তাহলে বিষুবতল (যার চেহারা একটি চাকতির মতো) খ-গোলকে (যার চেহারা ফাঁপা বলের ভিতরের দিকটার মতো) স্পর্শ করবে একটি বৃত্তরেখায় (দুই অর্ধাংশ জোড়া লাগিয়ে তৈরি হওয়া রবারের বলে ঠিক পেট-বরাবর যেমন একটি রেখার বেড় ফুটে ওঠে)। এই বৃত্তটিকে বলা হয় খ-বিষুববৃত্ত (Celestial Equator)। পৃথিবীর অক্ষরেখা উত্তরমেরুর দিকে যদি ক্রমেই বেড়ে চলে তাহলে

শেষপর্যন্ত খ-গোল স্পর্শ করে। যে বিন্দুতে স্পর্শ করে তার নাম খ-উত্তরমেরু। আর পৃথিবীর অক্ষরেখা দক্ষিণমেরুর (কুমেরু) দিকে
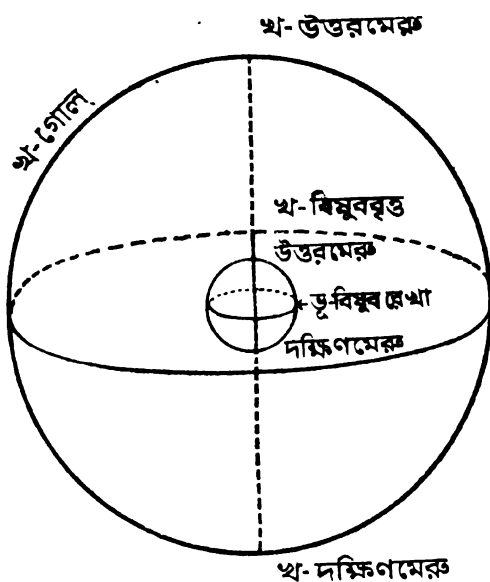
চিত্র নং ১৮। খ-গোল। পৃথিবীর অক্ষরেখা উত্তরমেরুর দিকে বাড়িয়ে দিলে খ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে তার নাম খ-উত্তরমেরু। দক্ষিণমেরুর দিকে বাড়িয়ে দিলে খ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে তার নাম খ-দক্ষিণমেরু। পৃথিবীর বিষুবতল বড়ো হতে হতে খ-গোলককে স্পর্শ করলে যে বৃত্তরেখাটি পাওয়া যায় তার নাম খ-বিষুববৃত্ত।

বাড়তে বাড়তে খ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে তার নাম খ-দক্ষিণ-মেরু। দর্শকের মাথা থেকে খাড়া একটি রেখা আকাশে উঠলে যে বিন্দুতে খ-গোল ছেদ করে তার নাম খ-মধ্য (Zenith)। দুই মেরু ও খ-মধ্য দিয়ে একটি বৃত্ত টানলে তার নাম মধ্যরেখা (Meridian)।

সংজ্ঞাগুলো মনে রাখা কিছু শক্ত নয়। ভূ-গোলকের যেখানে যা, খ-গোলেও সেখানে তাই। সেই বিষুববৃত্ত, সেই মেরু ইত্যাদি।

খ-মধ্য তুলনীয় দর্শকের অবস্থান-বিন্দুর সঙ্গে, মধ্যরেখা সেই অবস্থান-বিন্দু দিয়ে অতিক্রান্ত দ্রাঘিমা-রেখার সঙ্গে।
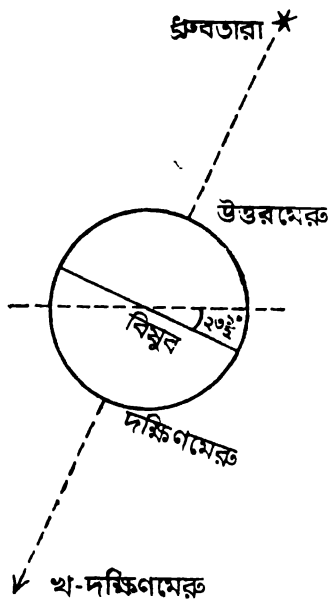
চিত্র ১৯। খ-উত্তরমেরু ও খ-দক্ষিণমেরু। খ-উত্তরমেরুর খুব কাছে, ১ ডিগ্রীরও কম দূরে, পাওয়া যাচ্ছে একটি তারা—তার নাম ধ্রুবতারা। তাই ধ্রুবতারাকে মনে হয় স্থির, আকাশের অন্য সমস্ত তারা এই ধ্রুবতারার চারদিকে ঘুরছে। খ-দক্ষিণমেরুর কাছাকাছি কোনো উজ্জ্বল তারা নেই। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের কোনো জায়গা থেকেই খ-দক্ষিণমেরু দেখা যায় না। বিষুবতলের ২৩½ ডিগ্রী কোনাকুনি করে ভাঙা ভাঙা লাইনে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর কক্ষতল।

ক্রান্তিবৃত্ত

এবারে পৃথিবীর কক্ষ-পরিক্রমার দরুন সূর্যের প্রতীয়মান চলার পথটি যদি খ-গোলে চিহ্নিত করা যায় তাহলে একটি বৃত্ত পাওয়া যায়—বিষুববৃত্তের মতো একটি বৃত্ত। তুলনাটি করা হল এ-কারণে যে

বিষুববৃত্ত ও খ-গোলের যেমন একই কেন্দ্র, তেমনি সূর্যের (প্রতীয়মান) চলার পথের বৃত্ত ও খ-গোলেরও একই কেন্দ্র।

একটি গোলকের গায়ের ওপর দিয়ে ছোট-বড়ো নানা ধরনের বৃত্ত আঁকা যেতে পারে। কিন্তু গোলকের কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে আঁকা বৃত্তগুলোই হয়ে থাকে সবচেয়ে বড়ো। গোলকের গায়ে এমনিধারা সবচেয়ে-বড়ো বৃত্তও অনেকগুলো আঁকা যেতে পারে। এইসব বৃত্তকে বলা হয় গুরুবৃত্ত (great circle)।

সূর্যের প্রতীয়মান চলার পথের এই যে বৃত্ত তার নাম ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic)।

অর্থাৎ, পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হয় সূর্য যেন বিশেষ একটি গুরুবৃত্তের পথে বছরে একবার খ-গোল পরিক্রমা করছে। এই গুরু-বৃত্তটিই ক্রান্তিবৃত্ত।

রাশি ও ঋতু

পৃথিবী থেকে তাকিয়ে আরো মনে হয় ক্রান্তিবৃত্তে একবছর ধরে চলার সময়ে সূর্য যেন এক-এক সময়ে এক-একটি তারামণ্ডল পার হয়ে যাচ্ছে। সারা বছরে সবসুদ্ধ বারোটি তারামণ্ডল।

পৃথিবীতে ঋতু আছে প্রধানত দুটি—শীত ও গ্রীষ্ম। আর আছে শীত থেকে গ্রীষ্মে পরিবর্তনের কালে বসন্ত, গ্রীষ্ম থেকে শীতে পরিবর্তনের কালে শরৎ। আমাদের দেশে আরো দুটি—বর্ষা ও হেমন্ত (বর্ষাকাল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হবার সময়ে, হেমন্তকাল উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শীতের আমেজ পড়ার সময়ে)।

ক্রান্তিবৃত্তে খ-গোল পরিক্রমার সময়ে সূর্য সারা বছরে যে বারোটি তারামণ্ডল বা রাশি পার হয়, তার তালিকাটি ঋতুতে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে।

গ্রীষ্ম : মেষ (Aries), বৃষ (Tauras), মিথুন (Gemini)
শরৎ : কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo)

শীত	:	তুলা (Libra), বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarius)
বসন্ত	:	মকর (Capricornus), কুম্ভ (Aquarius), মীন (Pisces)

•

বিষুববিন্দু

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত (দুটিই গুরুবৃত্ত) খ-গোলে খানিকটা আড়াআড়িভাবে রয়েছে। অতএব এই দুটি বৃত্ত দুটি বিন্দুতে ছেদ করে। ক্রান্তিবৃত্তে চলতে চলতে সূর্য যখন এই দুটি বিন্দুর কোনো একটিতে এসে পৌঁছয় তখন কী ঘটে? সূর্য ওঠে ঠিক পুবে, অস্ত যায় ঠিক পশ্চিমে—পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি হয় সমান। এই দুটি বিন্দুকে বলা হয় বিষুববিন্দু (Equinox)। একটি বিষুববিন্দুতে সূর্য পৌঁছয় ২১শে মার্চ তারিখে, অপর বিষুববিন্দুতে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে। প্রথমটিকে বলা হয় মহাবিষুব বা বাসন্ত বিষুব (Vernal Equinox), দ্বিতীয়টিকে জলবিষুব বা শারদ বিষুব (Autumnal Equinox)।

অয়নবিন্দু

এক বিষুববিন্দু থেকে অপর বিষুববিন্দুতে পৌঁছতে সূর্যকে অতিক্রম করতে হয় ১৮০ ডিগ্রী। তাহলে ৯০ ডিগ্রী অতিক্রম করার পরে সূর্য ক্রান্তিবৃত্তের এমন বিন্দুতে পৌঁছয় যেখানে তার অবস্থান হয় সবচেয়ে উত্তরে কিংবা সবচেয়ে দক্ষিণে। ক্রান্তিবৃত্তের এই দুটি বিন্দুকে বলা হয় অয়নবিন্দু (Solstice)। যে অয়নবিন্দুতে সূর্যের অবস্থান সবচেয়ে উত্তরে, অর্থাৎ যেখান থেকে সূর্যের দক্ষিণ দিকে চলা শুরু (২২শে জুন) সেই বিন্দুটির নাম কর্কটক্রান্তি (Summer Solstice)। আর যে অয়নবিন্দুতে সূর্যের অবস্থান সবচেয়ে দক্ষিণে, অর্থাৎ যেখান থেকে সূর্যের উত্তর দিকে চলা শুরু (২২শে ডিসেম্বর) তার নাম মকরক্রান্তি (Winter Solstice)

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত আড়াআড়ি হল কেন, এ-প্রশ্ন নিশ্চয়ই

মনে হতে পারে। আসলে পৃথিবী কক্ষ-পরিক্রমা করছে খানিকটা হেলে থাকা অবস্থায়—পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষ-তলে খাড়া লম্ব নয়। পৃথিবী যদি হেলে না থাকত তাহলে পৃথিবীর অক্ষটি হত কক্ষ-তলের ওপরে লম্ব এবং সেক্ষেত্রে কক্ষ-তল ও অক্ষের কোণ সৃষ্টি হত ৯০ ডিগ্রীর।
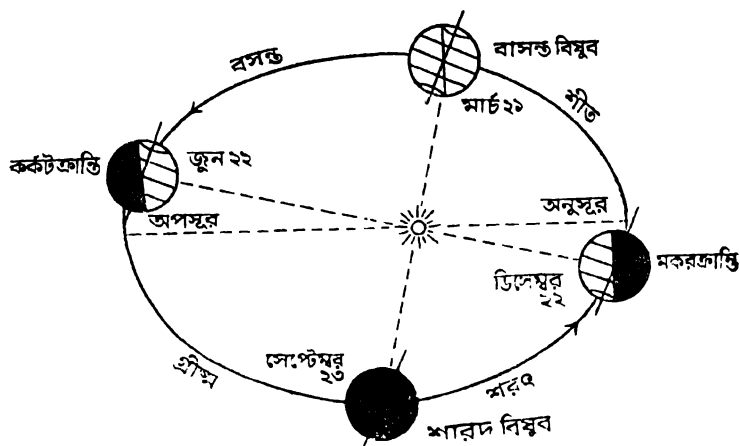
চিত্র ২০। পৃথিবীর ঋতু

কিন্তু আসলে কোণ সৃষ্টি হয়েছে ৬৬½ ডিগ্রীর। তার মানে পৃথিবী তার কক্ষতলে ২৩½ ডিগ্রী পরিমাণ হেলে আছে। ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, পৃথিবী হেলে থাকার দরুন ২২শে জুন তারিখে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে (সূর্য তখন কর্কট-ক্রান্তিতে), আবার ২২শে ডিসেম্বর তারিখে এই একই কারণে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ কাৎ হয় সূর্য থেকে দূরের দিকে (সূর্য তখন মকর-ক্রান্তিতে)। আবার পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের বেলায় এই ব্যাপার-টাই ঘটে ঠিক উল্টোভাবে। সহজেই অনুমান করা চলে, ২২শে জুন তারিখে সূর্য যখন কর্কটক্রান্তিতে তখন উত্তর গোলার্ধে সূর্যের তাপ বেশি আর দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যের তাপ কম—ফলে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য যখন মকরক্রান্তিতে তখন উত্তর গোলার্ধে সূর্যের তাপ

কম আর দক্ষিণ গোলার্ধে বেশি—ফলে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। তার মানে, পৃথিবীতে যে ঋতু বদলায় তার একটা প্রধান কারণ, কক্ষতলে পৃথিবীর হেলে থাকা।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার আছে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সারা বছর সমান নয়। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব হচ্ছে ১৪, ৯৬,০০,০০০ কিলোমিটার (৯, ২৯,০০,০০০ মাইল)। কিন্তু জানুআরি মাসের গোড়ার দিকে (যখন শীতকাল) সূর্য থাকে আরও ২৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে এবং জুলাই মাসের গোড়ার দিকে (যখন গ্রীষ্মকাল) আরও ২৪ লক্ষ কিলোমিটার কাছে। অর্থাৎ, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বাড়া-কমার ওপরে ঋতুর পরিবর্তন বিশেষ নির্ভর করে না। যে বিন্দুতে এসে পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে সেটিকে বলা হয় অপসূর (aphelion), যে বিন্দুতে সবচেয়ে কাছে সেটি অনুসূর (perihelion)।

পৃথিবী যদি হেলে না থাকত তাহলে সূর্য চলত বিষুববৃত্ত বরাবর, সারা বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি হত সমান। কিন্তু পৃথিবী হেলে আছে বলেই সূর্যকে বিষুববিন্দু থেকে উত্তরদিকে সরতে হয়, সরতে সরতে কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত, কৌণিক মাপে যে বিন্দুটি বিষুববৃত্ত থেকে ২৩½ ডিগ্রী দূরে। তেমনি পৃথিবী হেলে আছে বলেই সূর্যকে বিষুববিন্দু থেকে দক্ষিণ দিকে সরতে হয়, সরতে সরতে মকরক্রান্তি পর্যন্ত, কৌণিক মাপে যে বিন্দুটি বিষুববৃত্ত থেকে ২৩½ ডিগ্রী দূরে।

এবারে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে ক্রান্তিবৃত্ত বিষুববৃত্ত থেকে কতখানি আড়াআড়ি? অবশ্যই ২৩½ ডিগ্রী।

কথাটা আবার বলি, আকাশের সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার আমরা দেখি পৃথিবী থেকে। ফলে পৃথিবীর চলাফেরায় সামান্য এদিক-ওদিক হলেও তার একটা প্রতিফলন আকাশে দেখতে পাই। পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে, তার জন্য কত-কি কাণ্ড। পৃথিবী কক্ষপথে ঘুরছে, তার জন্য কত-কি কাণ্ড। আবার পৃথিবী কক্ষতলে সামান্য একটু হেলে রয়েছে, তার জন্যও কত-কি কাণ্ড।

বিষুববিন্দুর চলন

এখানেই শেষ নয়, আরো একটি ব্যাপার আছে। পৃথিবী যে নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে, তাও খানিকটা দুলে দুলে। ঘুরন্ত লাট্টুর সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে। লাট্টুর অক্ষ হচ্ছে তার শলাকাটি। লক্ষ করলে দেখা যাবে লাট্টু ঘোরার সময়ে এই শলাকাটি স্থির থাকে না, ছোট একটি বৃত্ত রচনা করে ঘোরে। ঘুরন্ত পৃথিবীর অক্ষটিও এমনি দোলায়মান, একটি সম্পূর্ণ দোলন শেষ হতে সময় লাগে প্রায় ২৫,৮০০ বছর।

পৃথিবীর অক্ষের এই যে দোলন তার ফল কী দাঁড়ায়? খ-উত্তর-মেরু (পৃথিবীর অক্ষ উত্তরমেরুর দিকে বাড়িয়ে চললে যে বিন্দুতে খ-গোল স্পর্শ করে) নড়ে ওঠে। তার মানে, বিষুববৃত্ত বিচলিত হয়। ফলে বিষুববিন্দুও (Equinox) স্থির থাকতে পারে না, তার মধ্যেও চলন এসে যায়। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় বিষুববিন্দুর চলন (Precession of the Equinoxes), হিন্দু জ্যোতিষে বলা হয় অয়নচলন।

বিষুববিন্দু চলছে। তার মানে কী? সূর্যের বিষুববিন্দুতে পৌঁছবার সময়ে হেরফের ঘটে যাচ্ছে, অয়নবিন্দুতে পৌঁছবার সময়েও। তার মানে, হেরফের ঘটে যাচ্ছে ঋতু শুরু হবার সময়েও। আগে যেখানে গ্রীষ্ম শুরু হত সূর্যের কর্কটরাশিতে থাকার সময়ে, এখন শুরু হচ্ছে মেষরাশিতে থাকার সময়ে।

বিষুববিন্দুর চলন থাকার দরুন আরো একটি ব্যাপার ঘটে—বছরের হিসেব দু-রকমের হয়ে যায়। বিষুববিন্দু থেকে রওনা হয়ে আবার সেই বিষুববিন্দুতে ফিরে আসতে সূর্যের যে সময় লাগে তাই হচ্ছে একটি বছর। এটিকে বলা হয় সৌর বছর (Tropical Year)—৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড। আবার, একটি নক্ষত্র থেকে রওনা হয়ে সেই নক্ষত্রে ফিরে আসতে সূর্যের যে সময় লাগে তাও একটি বছর—নাক্ষত্র বছর (Sidereal Year)। দেখা গেল

সময়ের পরিমাপে সৌর বছর নাক্ষত্র বছরের চেয়ে প্রায় ২০ মিনিট কম। কেন? বিষুববিন্দু চলছে, তাই। সূর্যের ঘুরে আসতে আসতে বিষুববিন্দু একটু কাছে সরে এসেছে।

এই হল ব্যাপার। পৃথিবী একটু পাক খেয়েছে, একটু ঘুরেছে, একটু হেলেছে, একটু দুলেছে, আর আকাশরাজ্যে কত-না কাণ্ড-কারখানা। সবই এই কারণে যে আমাদের দেখাটা এই পৃথিবী থেকে। পৃথিবীর পাক খাওয়া বা ঘোরা বা হেলা বা দোলা আমরা টের পাই না, আমরা দেখি-তার ফলে আকাশরাজ্যে সৃষ্ট কতকগুলো প্রতীয়মান চলন।

আবার বলি, প্রকৃত ও প্রতীয়মানের ব্যাপারটা বিশেষভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। মনে করা যাক, ভূপৃষ্ঠ থেকে শ'তিনেক কিলোমিটার উচ্চতায় একটি স্পুৎনিক কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই স্পুৎনিক থেকে মনে হবে চব্বিশ ঘণ্টায় সূর্য ষোলবার উঠছে, ষোলবার অস্ত যাচ্ছে। এমনটি মনে হওয়ার কারণ, এই স্পুৎনিক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় যোলবার পৃথিবীর ছায়ায় ঢুকছে, ষোলবার পৃথিবীর ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে।

পৃথিবীর বাইরে যাবারই বা দরকার কি। এই পৃথিবীরই মেরুদেশ থেকে তাকিয়ে দেখলে সূর্যের চলন সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে ছ-মাস একটানা দিন। অর্থাৎ, ছ-মাস ধরে সূর্য আকাশে থেকে যায়, মধ্যগগনে কখনোই অবশ্য নয়, দিগন্তরেখা বরাবর পরিক্রমা করতে করতে খানিকটা উঁচুতে ওঠে, আবার নিচে নামে ও অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপরে ছ-মাস ধরে একটানা রাত্রি।

যাই হোক, মহাকাশের ঠিকানার যতোটুকু হদিশ পাওয়া গেল তাই নিয়েই এবার আমরা আমাদের সৌরজগতের দিকে তাকাব। কিন্তু তার আগে আরো কিছু জেনে নেওয়ার আছে। যেমন, তারার প্রভা বিচার করা হয় কি-ভাবে? মহাকাশের এলাকায় দূরত্ব প্রকাশ করার মাপ কী?

তারার প্রভা

কোন তারা কতখানি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার তুলনাগত মাপ থেকে পাওয়া যায় সেই তারার প্রভা। কোন তারা কতখানি উজ্জ্বল তার বিচার চোখের দেখাতেও হতে পারে। যেমন, সূর্য অস্ত যাবার পরে সর্বপ্রথম যে-সব তারা আকাশে ফুটে ওঠে সেগুলোকে বলা হয় প্রথম প্রভার তারা (Star of the First Magnitude)। পরের গুলো দ্বিতীয় প্রভার, তার পরের গুলো তৃতীয় প্রভার, এমনি ষষ্ঠ প্রভা পর্যন্ত। ষষ্ঠ প্রভা পর্যন্তই খালি চোখে দেখা চলে। এবার চোখের দেখায় নির্ধারিত প্রভাকে বলা হয় প্রভার দৃষ্ট মান (visual magnitude)। এ থেকে সংখ্যার হিসেবেও তারার মান প্রকাশ করা চলে। ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রথম প্রভার তারার উজ্জ্বলতা ষষ্ঠ প্রভার তারার উজ্জ্বলতার চেয়ে ১০০ গুণ বেশি। এ থেকে হিসেব করে বার করা যায় যে কোনো একটি প্রভার তারার উজ্জ্বলতা তার নিচের প্রভার তারার উজ্জ্বলতার চেয়ে ২.৫১ গুণ বেশি। আমরা বলতে পারি, প্রথম প্রভার তারা দ্বিতীয় প্রভার তারার চেয়ে ২.৫১ গুণ বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু এমন তারা যদি থাকে যার উজ্জ্বলতা প্রথম প্রভার তারার চেয়েও ২.৫১ গুণ বেশি, তাহলে? বিজ্ঞানীরা সেই তারাকে বললেন শূন্য প্রভার তারা। তখন শূন্য প্রভার তারার চেয়ে ২.৫১ গুণ বেশি উজ্জ্বল তারা হল −১ (বিয়োগ এক) প্রভার। এমনিভাবে −২, −৩ ইত্যাদি। উজ্জ্বলতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত : ধ্রুবতারার প্রভা +২.০, আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের −১.৬, শুক্রগ্রহের (যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল) −৪.৪, পূর্ণিমার চাঁদের −১২.৬, সূর্যের −২৬.৮। দেখা যাচ্ছে, তারার প্রভা সংখ্যার হিসেবে যখন প্রকাশিত হয় তখন সংখ্যা যতো ছোট উজ্জ্বলতা ততো বেশি। আমাদের এই সৌরজগতে সূর্যের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল কোনো জ্যোতিষ্ক নয়, সেই সূর্যের প্রভা হচ্ছে −২৬.৮ (বিয়োগ ছাব্বিশ দশমিক

আট)। অন্যদিকে পৃথিবীর নিকটতম তারা যে প্রক্সিমা সেন্টরাই তার প্রভা +১০'৫। সংখ্যাটি এতই বড়ো যে বুঝতে হবে খালি চোখের দেখায় এই তারার উজ্জ্বলতা না-থাকার মতো।

আলো-বছর

জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরত্বের মাপ হয়ে থাকে অভাবনীয় রকমের প্রকাণ্ড। দৃষ্টান্ত দিলে এ-বিষয়ে কিছুটা ধারণা হতে পারে। আমাদের এই সৌরজগতে সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহকে সাধারণত মনে করা হয় পরস্পরের নিকট প্রতিবেশী। কিন্তু এই নিকট প্রতিবেশীদের মধ্যেও দূরত্বের মাপ এই রকম: পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার (৯'৩ কোটি মাইল)। সৌরমণ্ডলেরই অপর একটি গ্রহ প্লুটো, পৃথিবীর প্রতিবেশী, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ৪৮০ কোটি কিলোমিটার (৩০০ কোটি মাইল)। কিন্তু পৃথিবী থেকে কোনো একটি তারার দূরত্ব কত সেই খবর নিতে গেলে দূরত্বের এসব মাপকে সামান্য মনে হবে। একটি ব্যোমযান যদি ঘণ্টায় ১৬০০ কিলোমিটার বেগে যাত্রা করে তাহলে পৃথিবীর নিকটতম তারায় পৌঁছতে সময় লাগবে ৩০ লক্ষ বছর। এই অভাবনীয় রকমের প্রকাণ্ড দূরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশেষ একটি মাপ ব্যবহার করে থাকে, তার নাম আলোক-বর্ষ বা আলো-বছর (light-year)।

আলোর বেগ আমাদের জানা—সেকেণ্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার (সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল)। আলোর একটি রশ্মি চাঁদ থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেয় ১¼ সেকেণ্ড, সূর্য থেকে ৮ মিনিটের কিছু বেশি। এই বেগে ধাবিত হয়ে আলোর একটি রশ্মি এক-বছরে অতিক্রম করে প্রায় ৯,৬০,০০০ কোটি কিলোমিটার (প্রায় ৬,০০,০০০ কোটি মাইল)। আলোর রশ্মির দ্বারা একবছরে অতিক্রান্ত এই দূরত্বকে বলা হয় এক আলো-বছর। মনে রাখা দরকার, আলো-বছর দূরত্বের মাপ, সময়ের মাপ নয়।

এই মাপ ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি, পৃথিবী থেকে পৃথিবীর নিকটতম তারা প্রক্‌সিমা-সেণ্টরাইর দূরত্ব ৪⅓ আলো-বছর। নিকটতম তারার বেলাতেই এই, অন্যান্য তারা পৃথিবী থেকে আরো অনেক দূরে। যেমন, পৃথিবী থেকে ধ্রুবতারার দূরত্ব ৪০০ আলো-বছর। তার মানে কি? আমরা এই মুহূর্তে যে ধ্রুবতারাকে দেখছি তা আসলে চারশো বছর আগেকার—যখন মোগল সম্রাট আকবর রাজত্ব করছিলেন। সেই চারশো বছর আগে ধ্রুবতারার যে আলো যাত্রা করেছিল তা এইমাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছল আর সেই আলোতেই ধ্রুবতারাকে আমরা দেখছি।

চারশো আলো-বছর! এই হচ্ছে ধ্রুবতারার দূরত্ব। দূরত্বটা এত বেশি, এতই বেশি যে সূক্ষ্মতম যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া পৃথিবী থেকে ধ্রুবতারার নিজস্ব নড়াচড়া ঠাহর করা সম্ভব নয়। অন্য তারাদের বেলাতেও একই কথা। অনেক অনেক অনেক দূরে এই সমস্ত তারা, প্রত্যেকটির নিজস্ব নড়াচড়া থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর থেকে তাকিয়ে মনে হয় স্থির (পৃথিবীর আহ্নিক গতির দরুন সব তারাই যে ধ্রুবতারার চারদিকে পাক খায় সেটা একটা প্রতীয়মান ব্যাপার, সেজন্য তারায় তারায় অবস্থানে কোনো হেরফের ঘটে না)। তারাগুলো স্থির বলেই তারার সঙ্গে তারা মিলিয়ে বিশেষ বিশেষ চেহারা কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। সম্রাট অশোকের আমলেও তারায় তারায় ঝাঁক বেঁধে যে চেহারা ফুটে উঠত, এখনো তাই ওঠে। কথাটা আবার বলি, ঝাঁক বলতে যা বোঝায়—যেমন, তীরের ফলার মতো চেহারায় উড়ে চলা পাখির ঝাঁক—তেমনি ঝাঁক বাঁধার কোনো ব্যাপার এইসব তারায় নেই। পৃথিবী থেকে তারাগুলো স্থির বলেই কতকগুলো করে তারা নিয়ে এক-একটি ঝাঁক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যে এক-একটি ঝাঁককে আমরা বলেছি তারামণ্ডল।

আগের আলোচনায় আমরা বলেছি, খালি চোখে আমরা বড়ো জোর হাজার চারেক তারা দেখতে পাই। অথচ আমাদের নিজস্ব তারাজগতেই তারা আছে দশহাজার-কোটি। অধিকাংশ তারা এত

দূরে যে খালি চোখে পৃথক পৃথক ভাবে ধরা পড়ে না। শীতের রাতে আকাশের দিকে তাকালে উত্তর-পুব কোণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত যে আলোর ছোপ দেখতে পাই, আকাশের গা দিয়ে যেন একটা আলোর পথ বা আলোর নদী, যাকে আমরা বলি ছায়াপথ (কখনো-বা আকাশগঙ্গা), তা আসলে কোটি কোটি তারা একসঙ্গে দেখার ফল। দূরবীন দিয়ে দেখলে তারাগুলো আলাদা আলাদা চোখে পড়ে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই আলোর ছোপ হচ্ছে আমাদের তারাজগতের সীমানা বা বেড়। যাই হোক, খালি চোখে পৃথক পৃথক তারা আমরা দেখতে পাই কতদূর পর্যন্ত? দুই কি তিন হাজার আলো-বছর পর্যন্ত, তার বেশি নয়। আর এই যে আমাদের তারাজগৎ, যাকে আগের একটি মডেলে আমরা কল্পনা করেছি পেটের দিকে মোটা ধারের দিকে সরু চাকতির মতো, তার আসল ব্যাস কত? আসল ব্যাস প্রায় একলক্ষ আলো-বছর (অর্থাৎ, আলোর একটি রশ্মি এই তারাজগতের একদিক থেকে যাত্রা করে অন্যদিকে পৌঁছতে সময় নেয় একলক্ষ বছর)। আমাদের সূর্য রয়েছে এই একলক্ষ আলো-বছর ব্যাসের চাকতির কেন্দ্র থেকে প্রায় পঁচিশ-হাজার আলো-বছর দূরে। আর অ্যানড্রোমিডার যে তারাজগতের (এম ৩১) কথা বলেছি, যেটি ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের তারাজগৎ, তার দূরত্ব কুড়িলক্ষ আলো-বছর। আর সবচেয়ে দূরের যে-সব তারাজগৎ দূরবীন দিয়ে দেখা গিয়েছে সেগুলো ২০০ কোটি আলো-বছর দূরে। রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরো অনেক অনেক দূরের তারাজগতের সন্ধানও পেয়েছেন।

পারসেক

আকাশরাজ্যে দূরত্ব বোঝাবার আরো একটি মাপ আছে। তার নাম 'পারসেক'। ইংরেজী parallax ও second শব্দদুটি থেকে প্রথম তিনটি করে অক্ষর নিয়ে পারসেক (Parsec) শব্দটি তৈরী।

ইংরিজী প্যারালাক্‌স্‌কে বাংলায় বলা হয় লম্বন। ব্যাপারটা

কি ? একটি ছুটন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দূরের একটি গাছ দেখছি। এই মুহূর্তে বিশেষ এক জায়গায় গাছটিকে দেখলাম। ট্রেন আরো এগিয়ে যাবার পরে আবার সেই গাছের দিকে তাকাই। এবারে কিন্তু মনে হয় গাছটি আর আগের জায়গায় নেই, খানিকটা যেন পিছিয়ে গিয়েছে। এই যে একই বস্তুকে বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখার দরুন বস্তুর যে স্থানচ্যুতি ঘটে তারই নাম লম্বন। তেমনি, বছরের কোনো এক দিনে একটি তারা দেখলাম। ছ-মাস পরে পৃথিবী যখন তার কক্ষপথের অন্যদিকে (অর্থাৎ, প্রথম দেখার জায়গা থেকে এই ছ-মাসে পৃথিবী প্রায় ৩০ কোটি কিলোমিটার সরে এসেছে) তখন আবার সেই তারা দেখি। মনে হয় তারাটি সরে গিয়েছে। কতখানি সরে গিয়েছে তার একটা কৌণিক মাপ বার করা যেতে পারে। এই মাপটি যতো তার অর্ধেককে বলা হয় সেই তারার বার্ষিক লম্বন (Annual Parallax)।

কৌণিক মাপ নেওয়া হয় ডিগ্রীতে (পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে কৌণিক মাপে ৩৬০ ডিগ্রী অতিক্রম করে, ছ-মাসে ১৮০ ডিগ্রী), আরো ছোট মাত্রায় নিতে হলে মিনিটে (৬০ মিনিটে এক ডিগ্রী), আরো ছোট মাত্রায় নিতে হলে সেকেণ্ডে (৬০ সেকেণ্ডে এক মিনিট)। এক সেকেণ্ডের কৌণিক মাপটি খুবই ছোট। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে যদি একটা সিকি দাঁড় করিয়ে রাখি, তারপরে সেই সিকির ব্যাসের দুই প্রান্ত থেকে দুটি লাইন আমার চোখের মণি পর্যন্ত টানি, তাহলে আমার চোখের মণিতে এই দুটি লাইনে যে কোণ তৈরি হয়তাই হচ্ছে এক সেকেণ্ড।

কোনো তারার বার্ষিক লম্বন যদি হয় এক সেকেণ্ড তাহলে বলা হয়ে থাকে সেই তারার দূরত্ব এক পারসেক। অঙ্কের হিসেব করে বার করা যায় এক পারসেক দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৩·২৬ আলো-বছরের সমান।

জ্যোতিষিক একক

দূরত্ব প্রকাশ করার আরো একটি মাপ আছে—জ্যোতিষিক একক। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার বা ৯.৩ কোটি মাইল। এই দূরত্বকেই বলা হয়ে থাকে এক জ্যোতিষিক একক (astronomical unit)।

যে তিনটি মাপের কথা বলা হল তাদের সম্পর্কটা এই রকম :

১ পারসেক = ২,০৬, ২৬৫ জ্যোতিষিক একক
= ৩.২৬ আলো-বছর

তারার আবর্তন

তারার আলোচনায় পরে আবার আমাদের আসতে হবে। কিন্তু এবারের আলোচনা শেষ করার আগে আরো একটি বিষয় তুলতে চাই।

পৃথিবী থেকে তাকিয়ে তারাগুলোকে মনে হয় স্থির। স্থির এই অর্থে যে তারাদের পারস্পরিক অবস্থানে কোনো হেরফের নেই—সপ্তর্ষির সাতটি তারা গত কয়েক হাজার বছর ধরে এমনি প্রশ্নচিহ্নের চেহারা ধারণ করে আছে।

কিন্তু পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তনের দরুন তারাগুলোকে দেখে মনে হয় সব তারাই যেন ধ্রুবতারা ঘিরে পাক খাচ্ছে। এসব আলোচনা আমরা আগে করেছি।

কতখানি সময় লাগে একটি তারার ধ্রুবতারাকে ঘিরে একটি পাক সম্পূর্ণ করতে? ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট। কিন্তু আমরা জানি, সূর্যের সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। সূর্যের বেশি সময় লাগছে কেন? এই কারণে যে সূর্য যখন একটি পাক (প্রতীয়মান) সম্পূর্ণ করছে তখন পৃথিবী তার কক্ষ-পরিক্রমায় আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের মনে হয়, তারার সঙ্গে অবস্থানগত বিচারে সূর্য যেন খানিকটা পুবদিকে সরে গেল। ফলে মধ্যরেখা অতিক্রম করতে সূর্যের

সময় লেগে যায় চারমিনিট বেশি। অর্থাৎ, তারার একটি পাক সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সূর্যের চেয়ে চারমিনিট আগে। তার মানে, কোনো একটি তারা যদিও সারা বছর ধরে একই জায়গা দিয়ে ওঠে (সূর্যের মতো
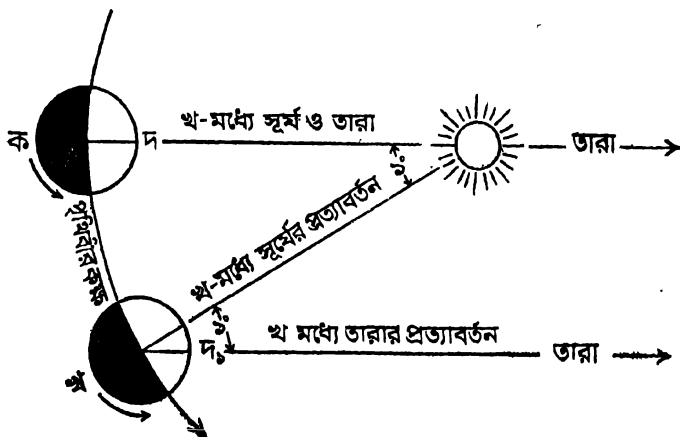
চিত্র ২১। পৃথিবী যখন 'ক' অবস্থানে তখন সূর্য ও তাবা একই সঙ্গে খ-মধ্যে। ধ্রুবতারার চারদিকে তারার একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে ২৩ ঘ ৫৬ মি। এই হচ্ছে এক নাক্ষত্র দিন। পৃথিবী ইতিমধ্যে তার কক্ষপথে আরো খানিকটা এগিয়ে এসে 'খ' অবস্থানে পৌছেছে। সূর্যকে দেখে মনে হবে সূর্য যেন এক ডিগ্রী পুবে সরে গিয়েছে। ফলে সূর্যের একটি আবর্তন (প্রতীয়মান) সম্পূর্ণ করতে সময় লাগছে আরো ৪ মিনিট (এক ডিগ্রী অতিক্রম করার সময়) বেশি। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। এই হচ্ছে সৌর দিন। নাক্ষত্র দিন সৌর দিনের চেয়ে চার মিনিট ছোট। অর্থাৎ, যে-কোনো তারা প্রতিদিন চারমিনিট আগে ওঠে। আজ যে-সময়ে কাল তার চারমিনিট আগে। এমনিভাবে আগু বাড়িয়ে চলতে চলতে ৩৬০ দিন পরে আবার সেই শুরুর সময়ে।

জায়গা বদলায় না), কিন্তু প্রতিদিন একই সময়ে নয়। আজ যে-সময়ে ওঠে, কাল উঠবে তার চারমিনিট আগে। এমনিভাবে দিনে দিনে চারমিনিট করে আগু বাড়িয়ে চলে।

হিসেব করলে দেখা যাবে, এমনিভাবে রোজ চারমিনিট করে আগে উঠতে উঠতে ঠিক ৩৬০ দিন পরে আবার উঠবে সেই শুরুর সময়ে।

জ্যোতিষী

তারা বা তারামণ্ডলের উদয় লক্ষ করেই মানুষ সর্বপ্রথম ঋতু চিনতে শিখেছিল। অনেকটা এইভাবে : সূর্যাস্তের সময়ে একটি বিশেষ তারা বা তারামণ্ডল উদিত হচ্ছে, এ থেকে বুঝে নিতে হবে শস্য বপন করার সময় হল। তারা বা তারামণ্ডলের উদয়ের সঙ্গে চাষবাসের সম্পর্ক দেখতে দেখতে এমন একটা বিশ্বাস অবশ্যই তৈরি হতে পারে যে পৃথিবীর ঋতু নিয়ন্ত্রণ করছে তারা ও তারামণ্ডল। এই বিশ্বাস থেকে অনিবার্যভাবে এই বিশ্বাসেও পৌঁছতে হয় যে তারা ও তারামণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করছে শুধু পৃথিবীর ঋতু নয়, মানুষের ভাগ্যও। এই হচ্ছে জ্যোতিষী। জ্যোতিষীকে বলা চলে প্রত্যক্ষজ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণেরই ফল। সারা মধ্যযুগ ধরে, একেবারে কেপ্‌লারের সময় পর্যন্ত, জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা যায়নি। স্বয়ং কেপ্‌লার পর্যন্ত একাধিক জ্যোতিষীর বই লিখে গিয়েছেন। আবার এই কেপ্‌লার সম্পর্কে একথাও মনে রাখা দরকার যে তাঁর মাকে যখন ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারার আয়োজন হয়েছিল, তিনি সেটা ভাগ্য বলে মেনে নেননি—প্রবল বিক্রমে লড়াই করে মাকে বাঁচিয়েছিলেন।

যাই হোক, কেপ্‌লারের পরে চারশো বছর পার হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান এখন এতই অগ্রসর যে গ্রহতারার রাজ্যে কিসের জন্য কী হয় তা সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত।

খ-গোলে তারার অবস্থান

ভূপৃষ্ঠে কোনো একটি স্থানের অবস্থান বোঝানো হয় কি ভাবে? অক্ষাংশ (latitude) ও দ্রাঘিমা (longitude) দিয়ে। অক্ষাংশ হচ্ছে বিষুব থেকে সেই স্থানটির কৌণিক দূরত্ব, উত্তরে কিংবা দক্ষিণে। আর দ্রাঘিমা হচ্ছে গ্রীনউইচ মধ্যরেখা থেকে সেই স্থানটির কৌণিক দূরত্ব, পুবে কিংবা পশ্চিমে। ঠিক একইভাবে খ-গোলে কোনো একটি

তারার অবস্থানও বোঝানো যেতে পারে। যেমন, খ-বিষুববৃত্ত থেকে কোনো একটি তারার কৌণিক দূরত্বকে বলা হয় বিষুবলম্ব (declination), উত্তরে কিংবা দক্ষিণে। ছবি দেখলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে। ছবিতে দুটি তারা দেখানো হয়েছে—আর্দ্রা ও
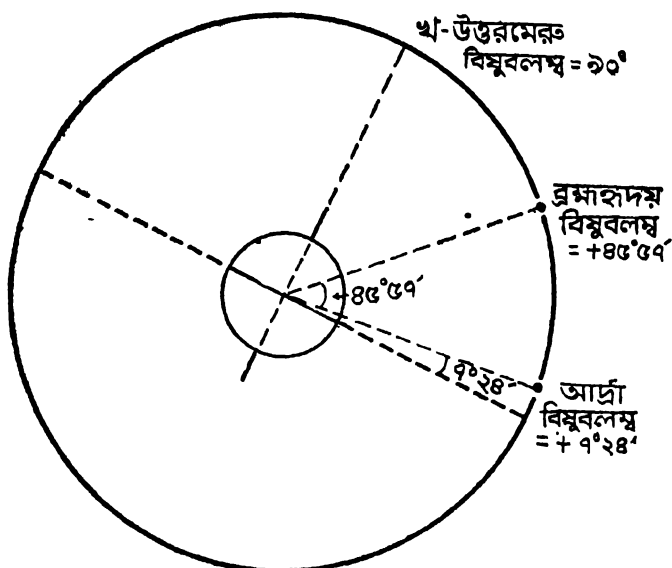
চিত্র ২২। বিষুবলম্ব। খ-বিষুববৃত্ত থেকে কোনো একটি তারার কৌণিক দূরত্বকে বলা হয় সেই তারার বিষুবলম্ব। আর্দ্রার বিষুবলম্ব +৭°২৪′ (যোগ ৭ ডিগ্রী ২৪ মিনিট)। ব্রহ্মহৃদয়ের বিষুবলম্ব +৪৫°৫৭′। যোগচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে উত্তর গোলার্ধের তারা। বিয়োগচিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে দক্ষিণ গোলার্ধের তারা। খ-উত্তরমেরুর বিষুবলম্ব +৯০°। খ-বিষুববৃত্তের বিষুবলম্ব ০°।

ব্রহ্মহৃদয়। আর্দ্রার বিষুবলম্ব ৭ ডিগ্রী ২৪ মিনিট। ব্রহ্মহৃদয়ের বিষুবলম্ব ৪৫ ডিগ্রী ৫৭ মিনিট। যোগচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে উত্তর গোলার্ধের তারা। বিয়োগচিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে দক্ষিণ গোলার্ধের তারা। ছবি দেখে সহজেই বোঝা যায় খ-উত্তরমেরুর বিষুবলম্ব ৯০ ডিগ্রী।

এবারে আগের একটি আলোচনা অঙ্কের হিসেব দিয়ে উপস্থিত করা চলে। আমরা বলেছি, কোনো কোনো তারা অনস্তগ—অর্থাৎ কখনো অস্ত যায় না, কেবলই ধ্রুবতারার চারদিকে ঘোরে। অনস্তগ হতে পারে কোন তারা? আমরা জেনেছি, ধ্রুবতারা দিগন্ত থেকে
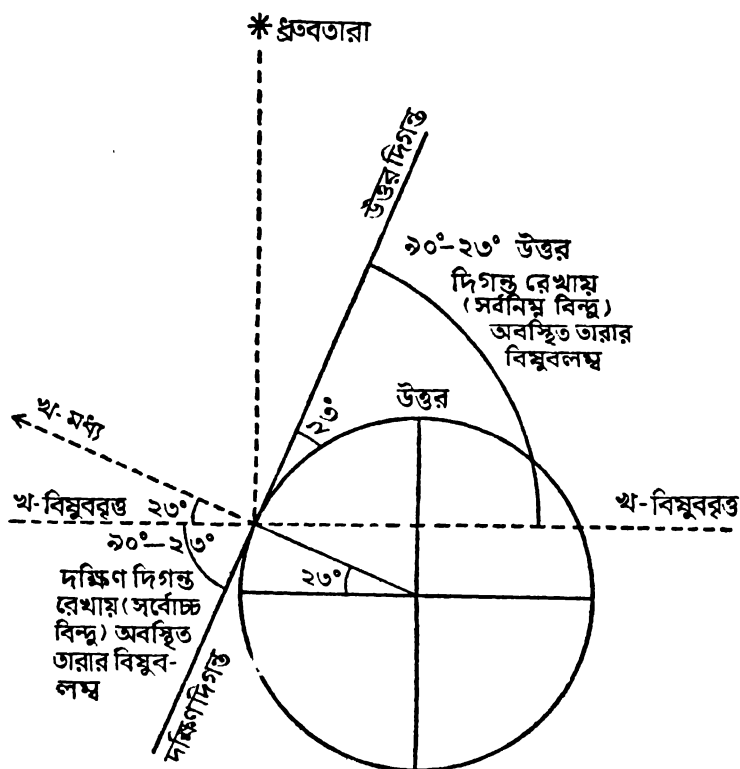
চিত্র ২৩। ভূপৃষ্ঠের ২৩° উ (২৩ ডিগ্রী উত্তর) অক্ষাংশ থেকে দর্শকের চোখে খ গোল। দর্শকের খাড়া মাথার ওপরে খ-মধ্য। উত্তর দিগন্ত থেকে ২৩ ডিগ্রী উঁচুতে ধ্রুবতারা। উত্তর দিগন্তের বিষুবলম্ব ৯০°-২৩°=৬৭°। দর্শকের কাছে এইটিই সর্বনিম্ন বিন্দু। উত্তর গোলার্ধে অনধিক ৬৭ ডিগ্রী বিষুবলম্বের সমস্ত তারা দর্শকের কাছে অনস্তগ।

যতোটা উঁচুতে আছে (কোনো একটি স্থান থেকে তাকিয়ে. ধ্রুবতারার উঁচুতে থাকার মাপ আর সেই স্থানের অক্ষাংশের মাপ সমান)

সেই মাপ যদি কোনো তারা ধ্রুবতারা থেকে সবচেয়ে "নিচে" থাকার সময়ে ছাড়িয়ে না যায় তাহলে সেটি অনস্তগ। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। কলকাতার অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রী ৩৪ মিনিট উত্তর, সুবিধের জন্য ধরে নেওয়া যাক ২৩ ডিগ্রী উত্তর। তার মানে কলকাতা থেকে ধ্রুবতারাকে আমরা দেখব দিগন্ত থেকে ২৩ ডিগ্রী উঁচুতে। তাহলে আমরা বলতে পারি, যে-তারা নিচে নামার সময়ে ধ্রুবতারা থেকে ২৩ ডিগ্রী নিচে নামে সেটি দিগন্ত ছুঁয়েই আবার ওপরে ওঠে। যে তারা ২৩ ডিগ্রীর চেয়ে কম নামে সেটি কখনো অস্ত যায় না বা অনস্তগ।

এবারে অঙ্কের ভাষায় কথাটা বলা যাক। ধ্রুবতারা থেকে ২৩ ডিগ্রী নিচে নামে যে তারা তার বিষুবলম্ব কত ? মনে রাখা দরকার, বিষুবলম্বের মাপ নেওয়া হয় খ-বিষুববৃত্ত থেকে, যে-জন্য খ-উত্তরমেরু বা ধ্রুবতারার বিষুবলম্ব ৯০ ডিগ্রী। তাহলে ধ্রুবতারা থেকে ২৩ ডিগ্রী নিচে নামছে যে তারা তার বিষুবলম্ব ৯০ − ২৩ = ৬৭ ডিগ্রী। তাহলে আমরা বলতে পারি কলকাতা থেকে তাকিয়ে আমরা সেই তারাকেই অনস্তগ দেখি যার বিষুবলম্ব ৬৭ ডিগ্রীর বেশি। কলকাতার আকাশে আর্দ্রা বা ব্রহ্মহৃদয় অনস্তগ নয়। তেমনি বলতে পারি দক্ষিণ গোলার্ধের যে তারার বিষুবলম্ব − ৬৭ ডিগ্রীর কম সেটি কখনোই কলকাতা থেকে দেখা যাবে না।

বলা বাহুল্য, শুধু বিষুবলম্ব দিয়ে খ-গোলে তারার অবস্থান ঠিক করা যায় না। যেমন ঠিক করা যায় না শুধু অক্ষাংশ দিয়ে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান। অক্ষাংশ দিয়ে ঠিক হয় স্থানটি বিষুবের কতটা উত্তরে বা দক্ষিণে। তারপরেও জানা চাই স্থানটি কতটা পুবে বা পশ্চিমে। কোথা থেকে পুবে বা পশ্চিমে ? গ্রীনউইচের মধ্যরেখা থেকে। তাহলে খ-গোলেও এমনি একটি 'গ্রীনউইচ' চাই। এখানে ব্যাপারটা একটু জটিল, ব্যাখ্যা করা দরকার।

আমরা জেনেছি, সূর্য বছরে একবার গোটা আকাশে একটি চক্কর দিয়ে আসে—৩৬৫ দিনের সামান্য বেশি সময়ে ৩৬০ ডিগ্রী। অর্থাৎ, তারার আকাশে সূর্যের একটি বাৎসরিক পথ (প্রতীয়মান) পাওয়া

যাচ্ছে, যার নাম ক্রান্তিবৃত্ত। এই পথে বারোমাসে বারোটি রাশিচক্র পার হয় সূর্য। অন্যদিকে আমরা জেনেছি, পৃথিবীর বিষুববৃত্ত পৃথিবীর কক্ষতলে ২৩½ ডিগ্রী হেলানো। অতএব ক্রান্তিবৃত্ত ও খ-বিষুববৃত্ত ২৩½ ডিগ্রী কোনাকুনি থেকে গিয়েছে। এই দুটি বৃত্ত দুটি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে—একটিকে বলা হয় মহাবিষুব, অপরটিকে জল-বিষুব। সূর্য মহাবিষুবে থাকে ২১শে মার্চ তারিখে এবং এইদিন পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি সমান। সূর্য জলবিষুবে থাকে ২৩শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে—এইদিনও পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি সমান।
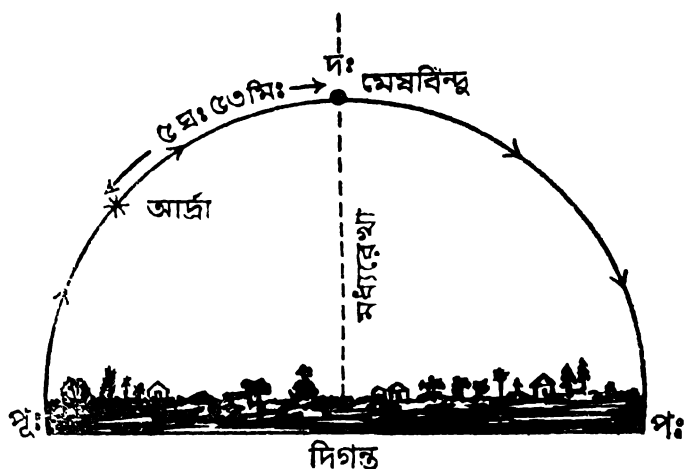
চিত্র ২৪। বিষুবাংশ। মেষবিন্দুর মধ্যগমন ও কোনো একটি তারার মধ্য-গমনের মধ্যে যে নাক্ষত্র কাল পার হয় তাকে বলা হয় সেই তারার বিষুবাংশ। চিত্রে মেষবিন্দুকে দেখানো হয়েছে দর্শকের মধ্যরেখায়। আর্দ্রা উদিত হয়েছে, মধ্যরেখায় পৌঁছবে ৫ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট পরে। অতএব আর্দ্রার বিষুবাংশ ৫ ঘ ৫৩ মিনিট।

এই যে মহাবিষুব, যার অপর নাম মেষবিন্দু (First Point of Aries), সেটি অবশ্যই খ-বিষুববৃত্তের একটি বিন্দু। এই বিন্দুতে যদি একটি তারা থাকত (দুঃখের বিষয়, নেই) সেটি পুব আকাশে উদিত হত, আকাশে তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছত, পশ্চিম আকাশে অস্ত

যেত। সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছনোকে বলা হয় মধ্যগমন (culmination)। মেষবিন্দুর এই মধ্যগমনই হচ্ছে আমাদের কাছে অন্যান্য তারার অবস্থান ঠিক করার নিশানা। মেষবিন্দুর মধ্যগমন ও কোনো একটি তারার মধ্যগমনের মধ্যে যে নাক্ষত্র কাল পার হয় তাকে বলা হয় সেই তারার বিষুবাংশ (right ascension)। এটি মাপা হয় ঘণ্টায় মিনিটে ও সেকেণ্ডে।

খ-গোলে তারার অবস্থান ঠিক করার জন্য এই হচ্ছে দুটি মাপ—বিষুবলম্ব ও বিষুবাংশ। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা জানা থাকলে ভূপৃষ্ঠে যেমন যে-কোনো স্থানের অবস্থান ঠিক করা যায়, তেমনি বিষুবলম্ব ও বিষুবাংশ জানা থাকলে খ-গোলে যে-কোনো তারার অবস্থান। তবে মনে রাখা দরকার, বিষুবলম্বের মাপ ডিগ্রীতে, কিন্তু বিষুবাংশের মাপ ঘণ্টায় মিনিটে সেকেণ্ডে।

পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডল

সৌরমণ্ডলের চেহারা সম্পর্কে ধারণা করার জন্য আমরা কল্পনা করেছিলাম ঘণ্টায় ১৬০০ কিলোমিটার বেগে একটা জেটবিমান যেন চাঁদের দিকে বা সূর্যের দিকে যাচ্ছে। এখানে পরিষ্কার বলা দরকার এই কল্পনায় ভুল ছিল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে জেটবিমান অচল। পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে বা শুক্রে বা মঙ্গলে পাড়ি দিতে পারে রকেট। কেন? বিষয়টি নিয়ে এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে আমরা আলোচনা করেছি।

কিন্তু শুধু জেটবিমান চলাচল করতে পারে বলে নয়, অন্য নানা কারণে পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডলের ব্যাপারটা খুবই জরুরী। সবচেয়ে বড়ো কথা, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে বলেই আমরা, পৃথিবীর তাবৎ জীবজন্তু ও মানুষ, দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি। পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহে নেই।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে বলেই দিনের আকাশ নীল, রাতের আকাশে তারা মিটমিট করে, মেরুজ্যোতি দেখা দেয়, 'তারা' খসে পড়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি সকালে-বিকেলে সূর্য ওঠা ও ডোবার সময়ে আকাশে যে এত রঙ ফুটে ওঠে, সূর্যকে লাল দেখায় —তারও মূলে এই বায়ুমণ্ডল। বিষয়গুলো নিয়ে একে একে আলোচনা তোলা যাক।

নীল আকাশ ও কালো আকাশ

মহাকাশ-গবেষণার যুগ শুরু হবার পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-সব নভশ্চর মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে আকাশ দেখেছেন তাঁদের সকলের একই অভিজ্ঞতা। তাঁরা দেখেছেন, দিনের আকাশ রাতের মতো

কালো আর সেই কালো আকাশে ফুটে রয়েছে রাতের তারা। তারাগুলোর কোনো ঝিকিমিকি নেই, যেন স্থির আলোর বিন্দু—তীরের ফলার মতো সরাসরি এসে চোখে বিঁধছে। আর সূর্য হয়ে উঠেছে আগুনে তাতানো ইস্পাতের মতো সাদা একটা চাকতি। তারা ছিটনো কালো আকাশে অস্বাভাবিক সাদা একটা সূর্য—কোথাও রঙের ছিটেফোঁটাও নেই। সোভিয়েত ও মার্কিন নভশ্চররা প্রত্যেকেই এই একই দৃশ্য দেখে এসেছেন। সোভিয়েত নভশ্চর লিওনফ বলছেন, "ব্যোমযানের বাইরে অসীম শূন্যে বেরিয়ে এসে প্রথম যে-দৃশ্য দেখলাম তা আমাকে অভিভূত করেছিল।...আকাশ সম্পূর্ণ কালো; তার গায়ে তারাগুলি আশ্চর্য দীপ্তিমান; পৃথিবী থেকে দেখার সময়ে যেমন দপদপ করে, এখানে তা করছে না। সূর্যের চারদিকে কোনো জ্যোতির্বলয় নেই—যেন কালো ভেলভেটের বুকে গাঁথা একটা অগ্নিময় চক্র।"

কেন এমন হয়? মনে করা যাক, সমুদ্রের মাঝখান থেকে একটা আলোকস্তম্ভ উঠেছে আর সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সেই স্তম্ভের গায়ে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, স্তম্ভটির গায়ে ধাক্কা খাবার পরেও বড়ো বড়ো ঢেউয়ের বিশেষ ক্ষতি হয় না। যেমন একদল সৈন্য যদি রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলে আর ঠিক রাস্তার ওপরে গাছ থাকে—তাহলে সেই গাছের সামনে এসে দলটা ডাইনে-বাঁয়ে দু-ভাগ হয়ে যায়, আর গাছটাকে পেরিয়ে যাবার পরেই আবার মেলে একসঙ্গে। তেমনি বড়ো বড়ো ঢেউও ডাইনে-বাঁয়ে দু-ভাগ হয়ে গিয়ে স্তম্ভটিকে পার হয়ে যায় এবং স্তম্ভটি পার হয়ে যাবার পরেই এই দুটি ভাগ আবার জোড়া লাগে। কিন্তু ছোট ঢেউ? ছোট ঢেউগুলো স্তম্ভকে পেরিয়ে যেতে পারে না। স্তম্ভের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে। ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে সূর্যের আলোর বেলাতেও। সূর্যের আলো হচ্ছে সমুদ্র আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আলোকস্তম্ভ। সূর্যের আলোর মধ্যে নানা আকারের ঢেউ আছে—খুব ছোট থেকে খুব বড়ো। আবার এক-এক

আকারের ঢেউয়ে আলোর এক-এক রকম রঙ। বড়ো ঢেউগুলোর রঙ হচ্ছে লাল, ছোট ঢেউগুলোর রঙ নীল। নানা ঢেউয়ের এবং নানা রঙের সূর্যের আলো যখন বায়ুমণ্ডলে এসে ধাক্কা খায় তখন বড়ো ঢেউয়ের লাল আলো অনায়াসেই সেই বাধাকে পেরিয়ে যেতে পারে কিন্তু ছোট ঢেউয়ের নীল আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে।

এবারে যে কোনো একটি নীল আলোর ঢেউকে অনুসরণ করা যাক। বায়ুমণ্ডলে এসে ধাক্কা খাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঢেউ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে। আবার সেই প্রত্যেকটি গুঁড়ো অনবরত চারদিকে ধাক্কা খেতে থাকে। এইভাবে চারদিক থেকে ধাক্কা খেতে খেতে শেষপর্যন্ত যখন এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় তখন তার গতিবেগের কোনো নির্দিষ্টতা থাকে না—আকাশের চারদিক থেকে সেই নীল আলো ঝরে পড়ছে বলে মনে হয়। আর তাই আকাশকে মনে হয় নীল। সূর্যকে দেখায় লাল। আসলে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে সূর্যের যে রঙ আমরা দেখি সেটা তার আসল রঙ নয়। সূর্যের আলো থেকে নীল রঙের বেশির ভাগটাই বায়ুমণ্ডল ছেঁকে বার করে নেয়—বাকি যেটুকু থাকে তাই আমরা দেখি। বায়ুমণ্ডলের বাধা যতো বেশি হবে সূর্য হবে ততো বেশি লাল। এজন্যই ভোরে ও বিকেলে, কুয়াশার দিনে বা পাতলা মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালে মনে হয় যেন টকটকে সিঁদুরের মতো একটা টিপ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়ে আকাশের গায়ে যে-সব আশ্চর্য রঙ ফুটে ওঠে তার মূলে রয়েছে বায়ুর কণার সঙ্গে সূর্যের আলোর ঢেউয়ের এই ধাক্কাধাক্কি। সূর্যের আলোর কয়েকটা ঢেউ বায়ুকণার ধাক্কায় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় বলেই ভোরে ও সন্ধ্যায় উঁচু গাছের চূড়োয় লাল রঙের ছোপ পড়ে, আকাশ হয়ে ওঠে নানা রঙে রঙীন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এসে এসব কিছুই থাকে না।

তারার ঝিকিমিকি

আমরা বলেছি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এলে তারাগুলোকে মনে হয় স্থির আলোর এক-একটি বিন্দু। এ থেকে বোঝা যায় যে তারার ঝিকিমিকিটা নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের ওপরে। আমরা জানি, পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে ঝিকিমিকিটা আমরা শুধু তারার বেলাতেই দেখি, গ্রহের বেলায় নয়। বায়ুমণ্ডলের জন্যই যদি ঝিকিমিকি হবে তবে গ্রহের ঝিকিমিকি থাকবে না কেন ?

গ্রীষ্মকালের দুপুরে মাটি যখন তেতে ওঠে তখন খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে দূরের জিনিসের দিকে তাকালে মনে হয় জিনিসগুলো যেন কাঁপছে। ঠিক এই একই কারণে তারার আলোও কাঁপে। তারার আলো-কে মাটিতে এসে পৌঁছবার আগে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে আসতে হয়। আমরা জানি বাতাসের সমস্ত স্তরের ঘনত্ব ও উত্তাপ একরকম নয়। আলাদা আলাদা ঘনত্ব ও উত্তাপ থাকার দরুন বাতাসের আলাদা আলাদা স্তরগুলো হয়ে ওঠে অনেকটা প্রিজম-এর মতো, যার ভিতর দিয়ে আলোর রশ্মিকে যেতে হলে নানা দিকে বাঁক নিতে হয় ও নানা রঙে ভেঙে পড়তে হয়। বায়ুমণ্ডল যেন নানাভাবে সাজানো অনেকগুলো লেন্স। কোনোটা আলোর রশ্মিকে নানাদিকে ছড়িয়ে দেয়, কোনোটা ছড়ানো আলোকে একটি বিন্দুতে সংহত করে। তার ওপরে নানা রঙে ভেঙে পড়ার ব্যাপারটি তো আছেই। এই সবকিছুর মোট ফল তারার ঝিকিমিকি।

তাহলে গ্রহের ঝিকিমিকি থাকবে না কেন ? একই বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে তো গ্রহের আলোকেও আসতে হচ্ছে। ব্যাপারটার রহস্য কিন্তু আলোয় নয়, আকারে। চোখের দেখার দিক থেকে একটি তারা আমাদের কাছে একটি বিন্দুমাত্র (কারণ তারাগুলো অনেক অনেক দূরের), কিন্তু একটি গ্রহ পুরোপুরি একটি চাকৃতি (কারণ গ্রহগুলো অনেক কাছের)। তার মানে গ্রহকে আমরা দেখি অনেকগুলো বিন্দুর সমষ্টি হিসেবে। এই বিন্দুগুলোকে যদি আলাদা

আলাদা ভাবে ধরা যায় তাহলে. কিন্তু প্রত্যেকটি বিন্দুরই ঝিকিমিকি আছে। কিন্তু ব্যাপারটা সবকটি বিন্দুর বেলাতে একই সময়ে ঘটে না। একটি বিন্দুর উজ্জ্বলতা যখন বাড়ে, অপর একটি বিন্দুর উজ্জ্বলতা তখন কমে ; রঙ পাল্‌টাবার ব্যাপারেও একই কথা। অর্থাৎ একদিকের ঘাটতি অপরদিকে পূরণ হয়ে যায়। আর সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে গ্রহের কোনো ঝিকিমিকি নেই।

বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। আমরা যখন পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখি তখন আসলে দেখি এই বায়ুমণ্ডলের তলা থেকে। মাথার উপরে থাকে গোটা বায়ুমণ্ডল। তাই যদি হয় তাহলে এই বায়ুমণ্ডলের অবশ্যই একটা চাপ থাকা উচিত। আছেও, তার মাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পনেরো পাউণ্ড। আমাদের শরীরের প্রতিটি অংশে এই চাপ পড়ছে। এই মাপের চাপকে বলা হয় 'এক বায়ুমণ্ডল'।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মাটির কাছাকাছি সবচেয়ে ঘন, উপরের দিকে পাতলা। ছয় কিলোমিটার উঁচু পর্বতের চুড়োয় উঠে দেখা গিয়েছে বায়ুমণ্ডলের চাপ অর্ধেক হয়ে যায়। নয় কিলোমিটার উঁচু এভারেস্টের চুড়োয় বায়ুমণ্ডলের চাপ তিনভাগের একভাগ (এভারেস্টের চুড়োয় উঠতে হলে নিশ্বাস নেবার জন্য গ্যাস-মুখোশ পরতে হয়)। ষোল কিলোমিটার উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের চাপ দশভাগের একভাগ। আশি কিলোমিটার উঁচুতে লক্ষভাগের একভাগ। প্রায় না-থাকার মতো, কিন্তু একেবারে শূন্য তাও নয়। একেবারে শূন্য কোথাও হয় কিনা বলা শক্ত। মেরুজ্যোতির সাক্ষ্য থেকে জানা গিয়েছে হাজার কিলো-মিটার ওপরেও বায়ুকণা আছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাক্ষ্য থেকে জানা গিয়েছে কয়েক হাজার কিলোমিটার ওপরের এলাকাও পুরোপুরি বায়ুশূন্য নয়।

সুবিধের জন্য বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে দেখানো হয়। মাটির কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরকে বলা হয় ক্ষুব্ধমণ্ডল বা

ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere)। এই স্তরেই চলে যতো ঝড়ঝাপ্‌টা, যার দরুন আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। তার ওপরে স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere), তারও ওপরে আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere)। শেষোক্ত স্তরটি প্রায় আশি কিলোমিটার থেকে কয়েক-শো কিলো-মিটার পর্যন্ত ছড়ানো। তারও ওপরের এলাকায় বায়ুমণ্ডল না-থাকার মতো। এই হচ্ছে এক্‌সোস্ফিয়ার (Exosphere)। এই এলাকা কোথায় শেষ হয়েছে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি।

বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে পাতলা একটি স্তর আছে যাকে বলা হয় ওজোন (Ozone) স্তর। এই স্তরটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, এটি আছে বলেই পৃথিবীতে জীবন বজায় থাকতে পারছে। ওজোন হচ্ছে বিশেষ ধরনের অক্‌সিজেন, আমাদের নিশ্বাসের বাতাসে যে অক্‌সিজেন রয়েছে সেই অক্‌সিজেনের প্রতিটি অণুতে আছে অক্‌সিজেনের দুটি পরমাণু আর ওজোনের প্রতিটি অণুতে আছে অক্‌সিজেনের তিনটি পরমাণু। এই ওজোন গ্যাসের অদ্ভুত একটা গুণ আছে—অতি-বেগুনী রশ্মির (Ultra-Violet Ray) কাছে দুর্ভেদ্য পর্দার মতো হয়ে ওঠা। অর্থাৎ, ওজোন গ্যাসের পর্দা অতি-বেগুনী রশ্মিকে ঠেকিয়ে রাখে, কিছুতেই পার হতে দেয় না। এই অতি-বেগুনী রশ্মি জীব-দেহের পক্ষে অতিমাত্রায় ক্ষতিকর, কিন্তু ওজোন গ্যাসের একটি পর্দা পৃথিবীকে মুড়ে রেখেছে বলেই সূর্যের আলোর অতি-বেগুনী রশ্মি পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। পৃথিবীর জীবন যে বজায় থাকতে পারছে তা এই ওজোন গ্যাসের মোড়কটি থাকার জন্যই।

বায়ুমণ্ডলের জানালা

সূর্য থেকে আমরা পাই আলো আর তাপ। কিন্তু শুধু এটুকু বললে সূর্যকে অনেক ছোট করে দেখা হয়। আসল কথা, সূর্য যে শক্তি বিকীরণ করছে তার ব্যাপ্তি নানা তরঙ্গের বিপুল এক এলাকা জুড়ে। তরঙ্গের মাপে মাপে এই বিকীরণকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আসল চেহারাটি ধরা পড়ে।

সঙ্গের ছবিতে সূর্য থেকে বিকীরিত শক্তিকে তরঙ্গের মাপে মাপে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে ছোট থেকে সবচেয়ে বড়ো

চিত্র ২৫। সূর্য ও তারা থেকে আগত বিকীরণের বর্ণালি-চিত্র। বর্ণালির এক-দিকে রয়েছে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের গামা রশ্মি, অন্যদিকে অতিদীর্ঘ রেডিও তরঙ্গ। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাপ সেন্টিমিটারে দেখানো হয়েছে। গামা রশ্মির দিকে এক সেন্টিমিটারের দশলক্ষ-ভাগের একভাগ। তারপরে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাপ ক্রমেই বড়ো হয়েছে। দৃশ্যমান আলোর অংশে একলক্ষ ভাগের চারভাগ থেকে আটভাগ পর্যন্ত। রেডিও তরঙ্গে ১০০ সেন্টিমিটার। এই সমস্ত বিকীরণ মহাশূন্যে একই বেগে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছতে পারে তার অতি সামান্য অংশই। একটি অংশ পৌঁছয় অপ্‌টিক্যাল জানালা দিয়ে—দৃশ্যমান আলোর অংশ। অপর একটি অংশ রেডিও জানালা দিয়ে—রেডিও তরঙ্গের অংশ। বাদবাকি সবটাই বায়ুমণ্ডলে আটক পড়ে।

মাপের তরঙ্গ পর্যন্ত বিন্যাসটি এই রকম : গামা রশ্মি (Gamma Ray), এক্‌স-রশ্মি (X-Ray), অতি-বেগুনী (Ultra-Violet), দৃশ্য

আলো (Visible Sunlight), অবলোহিত (Infra Red) ও রেডিও তরঙ্গ (Radio Waves)। কিন্তু হলে কি হবে, দুটি ছোট অংশ বাদে এই বিপুল বিস্তৃতির সমস্তটা পৃথিবীর আয়নোস্ফিয়ারে ও বায়ুমণ্ডলে আটক পড়ে—পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। যে দুটি ছোট অংশ আটক পড়ে না তার একটি হচ্ছে দৃশ্য আলোর অংশ, অপরটি রেডিও তরঙ্গের অংশ। এই দুটি খোলা অংশকে বলা চলে বায়ুমণ্ডলের দুটি জানালা—দৃশ্য আলোর অংশে অপ্‌টিকাল জানালা, রেডিও তরঙ্গের অংশে রেডিও জানালা। জেনে রাখা দরকার, এই রেডিও জানালাটি আছে বলেই রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান (Radio Astronomy) নামে নতুন একটি বিজ্ঞানের উদ্ভব হতে পেরেছে এবং রেডিও-টেলিস্কোপে ধরা পড়ছে মহাবিশ্ব থেকে আগত রেডিও-বার্তা।

বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার স্তরটি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা দরকার।

আয়নোস্ফিয়ার কেন বলা হচ্ছে? এই স্তরের বায়ুমণ্ডলে বায়ুর উপাদানের পরমাণুগুলো রয়েছে আয়নিত অবস্থায়। তাহলে আয়ন কী, এটা জানা দরকার। আমরা জানি, বস্তুর পরমাণু এমনিতে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে, কেননা পরমাণুর নিউক্লিয়সের পজিটিভ চার্জ সেই নিউক্লিয়সের চারদিকে ঘুরে চলা ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের সমান। কিন্তু কোনো কারণে যদি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন বেশি বা কম হয়ে যায়—তখন? ইলেকট্রন বেশি হলে পরমাণুটি হয়ে পড়ে নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট। ইলেকট্রন কম হলে পরমাণুটি হয়ে পড়ে পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট। নেগেটিভ হোক, পজিটিভ হোক, এমনি চার্জ বিশিষ্ট পরমাণুকে বলা হয় আয়ন।

এখন, ব্যাপারটা হয় কি, সূর্যের বিকীরণে যে-সব অতি-ছোট মাপের তরঙ্গ আছে—যেমন, এক্স-রে ও অতি-বেগুনী রশ্মি—সেগুলো বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে পৌঁছে সেখানকার পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন খসিয়ে ফেলে। অর্থাৎ, পরমাণু হয়ে পড়ে

আয়নিত। আয়নিত পরমাণু দিয়ে গড়া বায়ুমণ্ডলের বিশেষ স্তরকেই আমরা বলেছি আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল।

আয়নিত পরমাণুর ঝাঁক যদি কোথাও থাকে তাহলে দেখা যায়, কোনো কোনো কম্পনমাত্রার রেডিও-তরঙ্গ সেই ঝাঁক ভেদ করতে অসমর্থ। অর্থাৎ, সেই রেডিও-তরঙ্গের কাছে আয়নিত পরমাণুর ঝাঁক হয়ে ওঠে দুর্ভেদ্য আড়াল। আড়াল উভয় দিকেই—ভিতর থেকে বাইরের দিকে, বাইরে থেকে ভিতরের দিকে।

তার মানে, আয়নমণ্ডলকে আমরা তুলনা করতে পারি দু-দিকে পালিশ করা বিপুল এক গোলকাকার আয়নার সঙ্গে, যে আয়না পৃথিবীকে মুড়ে রেখেছে। পৃথিবী থেকে বাইরের দিকে যেতেই হোক, বাইরে থেকে পৃথিবীর দিকে আসতেই হোক, রেডিও-তরঙ্গ এই আয়নায় ঠিকরে ফিরে যায়।

এই আয়নাটি আছে বলেই পৃথিবীব্যাপী বেতার-যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। এমনিতে রেডিও-তরঙ্গ সিধে পথে ধাবিত হয়। ফলে, যে-কোনো রেডিও-তরঙ্গ দিগন্ত পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ-বরাবর এসে সিধে রেখায় ধাবিত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেত। কিন্তু তা যেতে পারে না, আয়নমণ্ডল থেকে ঠিকরে আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। এমনি-ভাবে পৃথিবী-ব্যাপী বেতার-যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই আয়নাটি মোটেই সুস্থির নয়। কখনো কখনো সূর্য থেকে অতি-ক্ষুদ্র মাপের তরঙ্গ (এক্স-রে ও অতি-বেগুনী) প্রবলভাবে বিকীরিত হয়। তার ফলে আয়নাটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে, দূর-পাল্লার বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন আর বজায় থাকে না।

সূর্য যখন অতিমাত্রার তৎপর, অর্থাৎ প্রবলভাবে বৈদ্যুতিক চার্জ বিশিষ্ট কণিকা ও আয়ন ও ইলেকট্রন বিকীরণ করে চলেছে, সেই বিকীরণের কিছু অংশ অবশ্যই পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে। তখন কী ঘটে? পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড চুম্বক, আমরা জানি। এই চুম্বকের দুই মেরু—উত্তর ও দক্ষিণ। পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারেই এই দুই মেরুর দিকে আকর্ষিত হয় সূর্য থেকে বিকীরিত বিদ্যুৎ-আবিষ্ট কণিকা

ও আয়ন ও ইলেকট্রন। সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড এক বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক আলোড়ন। বেতার-যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এমনি সময়ে আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই অতি-সুন্দর মেরু-জ্যোতি (Aurora)। আসলে কী ঘটে? সূর্য থেকে বিকীরিত তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলো পৃথিবীতে পৌঁছে পৃথিবী-রূপী প্রকাণ্ড চুম্বকটার শক্তিরেখা বরাবর স্থাপিত হতে চায়। তার ফলে ওপরের পাতলা বাতাসে প্রচণ্ড একটা ঘা পড়ে। তখন সেই পাতলা বাতাস জ্বলতে শুরু করে, যেমন জ্বলে নিয়নটিউবের ভিতরকার গ্যাস।

১৯৫৮ সালে আমেরিকান উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১ মারফত একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার হয়েছে। জানা গিয়েছে, পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তীব্র বিকীরণের এলাকা। এই এলাকার নাম দেওয়া হয়েছে, অনুসন্ধানী দলের নেতা জেমস ভ্যান অ্যালেনের নামে, ভ্যান অ্যালেন বলয় (Van Allen Belts)। মনে হয়, সূর্য থেকে নিঃসৃত তড়িতাবিষ্ট কণিকা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আটক পড়ে। সূর্যে যখন ঝলক ওঠে তখন এই কণিকাগুলো আরো বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকে এবং ভ্যান অ্যালেন বলয়ে প্রচুর কণিকা জড়ো হয়। কণিকাগুলো তখন পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর তখনই বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর এলাকায় সৃষ্টি হয় নানা রঙের মেরু-আলো। আলাস্কা, উত্তর-নরওয়ে ইত্যাদি দেশে বছরের অনেক রাতেই মেরু-আলো দেখা যেতে পারে।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে হলে ভ্যান অ্যালেন বলয়ের গুরুত্ব খুবই বেশি। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য না পেলে আমরা হয়তো কোনোদিনই জানতে পারতাম না আটক-পড়া কণিকাগুলো পৃথিবীকে বলয়ের মতো ঘিরে আছে। মহাকাশ গবেষণার প্রথম দশবছরে এটি এক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

এখন আয়নমণ্ডলে গোলযোগ হলেও বেতার-যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয় না। কেননা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবী-ব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো নিখুঁত করে তোলা হয়েছে। কৃত্রিম

উপগ্রহকে ব্যবহার করা হচ্ছে রিলে-স্টেশন হিসেবে বা প্রতিফলক হিসেবে।

পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে আরো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। কাঁচের মধ্যে দিয়ে যদি ঘরে রোদ আসে তাহলে ব্যাপারটা কী হয়? কাঁচ থাকার জন্য সূর্যের বিকীরণ আটকায় না, ঘরের ভিতরটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কাঁচ থাকার জন্য ঘরের ভিতরকার এই বিকীরণ আটকায় (যেহেতু ঘরের ভিতরকার উত্তাপ বাইরের চেয়ে কম), ফলে ঘরের ভিতরকার উত্তাপ বাড়তে থাক। কাঁচের ভিতর দিয়ে রোদ আসার ব্যবস্থা সমেত এমনি ঘরকে আমরা বলি গ্রীনহাউস (Greenhouse)। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এমনি একটা গ্রীনহাউসের কাঁচের মতো। এই কাঁচটি আছে বলে দিনের বেলার উত্তাপ প্রচণ্ডভাবে বাড়তে পারে না, রাত্রিবেলার উত্তাপ প্রচণ্ডভাবে কমতে পারে না। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উত্তাপের রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে উত্তর আফ্রিকা থেকে, ৫৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১৯২২ সালে)। আর সর্বনিম্ন উত্তাপের রেকর্ড দক্ষিণ মেরু থেকে, শূন্য ডিগ্রীর নিচে ৪৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উত্তাপের মাত্রায় তফাত থাকে আরো অনেক কম। যার ফলে আমরা অস্বস্তি বোধ করি না। কিন্তু বায়ুমণ্ডল যদি না থাকত তাহলে উত্তাপের বাড়া-কমার দিক থেকে পৃথিবীর অবস্থাও হত চাঁদের মতো (চাঁদে দিনের বেলার উত্তাপ ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশি আর রাতের উত্তাপ হিমাঙ্কের চেয়ে অনেক অনেক কম)।

তারা খসা

আরো একটা ব্যাপারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মস্ত একটা আড়াল হিসেবে কাজ করে। রাতের আকাশে মাঝে মাঝে আমরা দেখি, তারা খসে পড়ছে। আসলে কিন্তু দেখি তারা নয়, জ্বলন্ত উল্‌কা। ব্যাপারটা ঘটছে আয়নমণ্ডলে, সম্ভবত শ'দেড়েক কিলোমিটার ওপরে।

অতি ক্ষুদ্র একটি উল্‌কা, হয়তো বা বালুকণার চেয়ে বড়ো নয়, শূন্যে পাক খেতে খেতে পৃথিবীর টানের মধ্যে এসে পড়েছে এবং সেই টানে পৃথিবীর মাটির দিকে নামছে। নামতে নামতে ঘটে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে প্রচণ্ড সজ্ঘর্ষ, উত্তাপ বাড়ে এবং উল্‌কায় আগুন ধরে যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু খানিকটা ছাই, বাতাসে ভাসতে ভাসতে ক্রমে একদিন মাটিতে এসে পড়ে। উল্‌কা যদি আরেকটু বড়ো হয় তাহলে পুড়তে পুড়তে বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরেও পৌঁছে যেতে পারে। তখন আমরা তাকে বলি অগ্নিগোলক (fire ball)। আরো বড়ো হলে পুড়ে ছাই হবার আগেই মাটির সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে। তখন আমরা তাকে বলি উল্‌কাপিণ্ড (Meteorite)। আমরা যদিও টের পাই না, প্রতি বছরে কয়েক শত টন উল্‌কার ছাই পৃথিবার মাটিতে এসে পড়ছে।

বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে এই আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবী নামক গ্রহে জীবনের মস্ত সহায় হচ্ছে এই বায়ুমণ্ডল। পরে অন্যান্য গ্রহের আলোচনায় আমরা দেখব, কোন গ্রহে বায়ুমণ্ডল কিরকম তা থেকে সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে নেওয়া চলে সেই গ্রহে পৃথিবীর মতো জীবন সম্ভব কিনা।

তবে, যে বায়ুমণ্ডল থাকার জন্য আমাদের এত সুবিধা, সেই বায়ুমণ্ডলই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে মস্ত অসুবিধার কারণ। বায়ুমণ্ডল যেন পুরু একটা কম্বলের মতো পৃথিবীর মাটিকে ঢেকে রেখেছে, দূরের কোনো তারা থেকে নিঃসৃত শক্তির বেশির ভাগটাই এই কম্বলের বাইরে থেকে যায়—পৃথিবীর মাটিতে রাখা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যন্ত্রে পৌঁছতে পারে না। একমাত্র মহাকাশ-গবেষণার যুগ শুরু হবার পরেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর ওজন

পৃথিবীর ওজন কত? ছয় কোটি কোটি কোটি টন (৬-এর পরে একুশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো টন)।

পৃথিবীর ঘনত্ব কত? জলের ঘনত্ব যদি এক হয় তাহলে পৃথিবীর ঘনত্ব প্রায় সাড়ে-পাঁচ।

পৃথিবীর মতো এমন বিরাট এক বস্তুর ওজন নেওয়া হয় কি ভাবে? নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র ব্যবহার করে। মহাকর্ষের সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটন বলেছেন, বিশ্বের প্রতিটি কণিকা অন্য প্রতিটি কণিকাকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী আকর্ষণ করে আমাদের ও অন্য প্রতিটি বস্তুকে, তেমনি আমরা ও অন্য প্রতিটি বস্তু একই ভাবে আকর্ষণ করি পৃথিবীকে। দুয়ের মধ্যে আকর্ষণের পরিমাণ কম-বেশি হয় দুয়ের মিলিত ভর অনুসারে। বোঁটা খসে গেলে গাছের আপেল মাটিতে পড়ে কেন? পৃথিবী আপেলকে টানছে, আবার আপেলও পৃথিবীকে টানছে, কিন্তু আপেলের তুলনায় পৃথিবীটা এত বড়ো যে পৃথিবীর টানটাই অনেক বড়ো হয়ে যায়, আপেলের টান নগণ্য। তাই আপেল মাটিতে পড়ে। কতখানি জোরে পড়ে তা থেকে আমরা আপেলের 'ওজন' ঠিক করি। এখন, এমন যদি হয় যে আপেল যখন মাটিতে পড়ছে তখন তার পাশেই রয়েছে অন্য এক প্রকাণ্ড বস্তু, তাহলে পড়ন্ত আপেলের ওপরে তার কি কোনো টান থাকে না? অবশ্যই থাকে। সেটা টের পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে যে আপেল মাটিতে পড়ে ঠিক খাড়াভাবে নয়, সেই প্রকাণ্ড বস্তুর দিকে খানিকটা সরে গিয়ে।

এই ব্যাপারটাকেই কাজে লাগানো হয়েছে পৃথিবীর ওজন নিতে গিয়ে। একটি পর্বতের পাশে যদি পেণ্ডুলাম ঝোলানো হয় তাহলে সেই পেণ্ডুলাম কি খাড়া নিচের দিকে ঝুলবে? না। পর্বতের দিকে খানিকটা সরে গিয়ে ঝুলবে। সরে যাওয়ার মাত্রা যতো সামান্যই হোক তার একটা মাপ নেওয়া অসম্ভব নয়। এই মাপ থেকে বেরিয়ে আসে পর্বতের ভর পৃথিবীর ভরের কত-ভাগের কত-ভাগ। পর্বতের ভর যদি জানা থাকে তাহলে পৃথিবীর ভর তখন সহজেই হিসেব করা যায়। এই উপায়েই ১৭৪০ সালে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম পৃথিবীর ওজন নেন। পরে অবশ্য আরো বহুবার পৃথিবীর

ওজন নেওয়া হয়েছে, সেজন্য ল্যাবরেটরির সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—কিন্তু উপায়টি এই একই। এবং প্রত্যেক বারেই মোটামুটি একই ওজন পাওয়া গিয়েছে।

চাঁদের সাহায্য নিয়েও পৃথিবীর ভর হিসেব করা চলে। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে কেন? ছিটকে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাচ্ছে না কেন? তার কারণ, পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে মহাকর্ষের টান এমনই এক মাত্রার যে চাঁদ বাঁধা পড়ে গিয়েছে। এখন, পৃথিবী থেকে চাঁদ কতটা দূরে তা যদি জানা থাকে তাহলে চাঁদকে বেঁধে রাখতে কতখানি টান দরকার তা সহজেই হিসেব করা চলে। তা থেকে হিসেব করা চলে পৃথিবীর ভর কতখানি হলে এই টান সম্ভব হতে পারে।

তাহলে এই একই উপায়ে সূর্যের ওজন-ই বা নেওয়া যাবে না কেন? পৃথিবী সূর্যের টানে বাঁধা পড়েছে। কতখানি টান? এই টান তৈরি হওয়ার জন্য কতখানি হওয়া চাই সূর্যের ভর? এমনিভাবে হিসেব করে জানা গিয়েছে, পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের ভর প্রায় ৩.৩ লক্ষ গুণ বেশি।

পৃথিবীর বয়স

একজন ধর্মযাজক ঘোষণা করেছিলেন, পৃথিবীর সৃষ্টি নাকি খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ অব্দে। এমন সঠিকভাবে তিনি সময়ের হিসেব করলেন কি-ভাবে? না, সকল যাজকের বয়স যোগ করে। হিসেবটা মোটেই এত সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা নানা পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স হিসেব করেছেন। মোটামুটি বলা চলে, পৃথিবীর বয়স চারশত কোটি থেকে পাঁচশত কোটি বছরের মধ্যে।

একেবারে সম্প্রতিকালে পৃথিবীর বয়স হিসেব করার জন্য ভূত্বকে তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থের বিশ্লেষণের ওপরে নির্ভর করা হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলতে প্রধানত ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। এই দুটি পদার্থের মধ্যে অতি ধীরে ধীরে ভাঙনের একটি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। চলতে চলতে শেষপর্যন্ত পাওয়া যায় হিলিয়াম

ও বিশেষ ধরনের সীসে। দেখা গিয়েছে এই ভাঙনের প্রক্রিয়া চলে একই ভাবে—যতোই অদলবদল ঘটুক উত্তাপে বা চাপে বা অন্যান্য ভৌতিক অবস্থায়। কাজেই এই হচ্ছে অত্যন্ত নির্ভুল একটি উপায় যার দ্বারা ভূত্বকের বয়স হিসেব করা চলে। যেমন ধরা যাক, একটি শিলার বয়স বার করতে হবে। তখন দেখা দরকার শিলার মধ্যে হিলিয়াম ও বিশেষ ধরনের সীসের বয়স কত। তা থেকে জানা যাবে কতকাল ধরে শিলার মধ্যে ভাঙনের প্রক্রিয়া চলছে। তা থেকে শিলার বয়স। এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত পৃথিবীর বয়স—প্রায় ৫০০ কোটি বছর।

পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী—চন্দ্র

চন্দ্র বা চাঁদকে নিয়ে অনেক কাব্য করা হয়েছে। সুন্দর মুখের তুলনা করা হয় চাঁদের সঙ্গে। চাঁদের আলো বা জ্যোৎস্নাকে বলা হয় রুপোলী ধারা, ইত্যাদি। কিন্তু খালি চোখে তাকালেও চাঁদের গায়ে কালো ছোপ চোখে পড়ে (আমরা বলি 'চাঁদের বুড়ী')। আর দূরবীন দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে ন্যাড়া ন্যাড়া ধারালো পর্বতের সারি আর হাজার হাজার গর্ত। সুন্দর বলতে আমরা যা বুঝি তেমন জায়গা চাঁদ একেবারেই নয়।

চাঁদের ব্যাস ৩,৪৫৬ কিলোমিটার (২,১৬০ মাইল), পৃথিবীর ব্যাসের চারভাগের একভাগের চেয়ে সামান্য বেশি। পৃথিবী যতো-খানি জায়গা জুড়ে আছে তার মধ্যে পঞ্চাশটি চাঁদ পুরে রাখা চলে। কিন্তু চাঁদের ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে কম। কাজেই পৃথিবীর ভরের সঙ্গে যদি পাল্লা দিতে হয় তাহলে একাশিটি চাঁদের প্রয়োজন। চাঁদের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের পাঁচভাগের তিনভাগ।

চাঁদ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তার আগে উপবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।
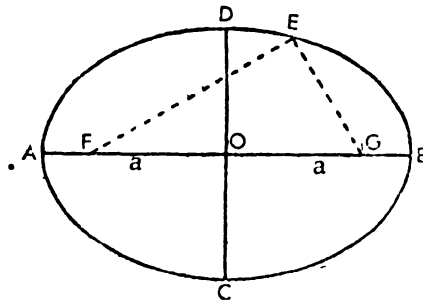
চিত্র ২৬। ওপরের ছবিটি উপবৃত্তের। ছবিটির দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে, উপবৃত্তের চেহারা ঠিক ডিমের মতো। AOB ও DOC উপবৃত্তের দুটি অক্ষ। AOB-কে বলা হয় পরাক্ষ, DOC-কে উপাক্ষ। পরাক্ষ ও উপাক্ষ একটি

অপরটির ওপরে লম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরাক্ষ ও উপাক্ষকে ঘিরে উপবৃত্তে পরিধি যেন একটি নির্দিষ্ট ছন্দ বজায় রেখে চলেছে। AO বা OB-কে বলা হয় অর্ধ-পরাক্ষ এবং সাধারণত 'a' অক্ষরটির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। F ও G—এই দুটি বিন্দুকে বলা হয় উপবৃত্তের ফোকস এবং দুটি বিন্দুই রয়েছে পরাক্ষে। O হচ্ছে উপবৃত্তের কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্র থেকে দু দিকের দুটি ফোকস সমান দূরে আছে। মনে করা যাক, উপবৃত্তের পরিধিতে E যে-কোনো একটি বিন্দু। প্রমাণ করা যায় যে দুটি ফোকস থেকে এই বিন্দুটির দূরত্বের যোগফল পরাক্ষের সমান, বা অঙ্কের ভাষায় লিখলে FE+GE=2a। বৃত্তের সঙ্গে উপবৃত্তের চেহারার তফাত চোখে দেখেই বোঝা যায়। আবার উপবৃত্তের নানা ধরনের চেহারা হতে পারে—চেহারার বিশেষ ধরনটি নির্ভর করে দুটি ফোকসের মাঝখানকার দূরত্বের ওপরে এবং পরাক্ষের দৈর্ঘ্যের ওপরে। ছবি থেকে বোঝা যাবে, ফোকসদুটির মাঝখানকার দূরত্ব হচ্ছে FG এবং পরাক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2a বা FE+GE। এই দুটি দৈর্ঘ্য—অর্থাৎ FG এবং 2a—মাপের দিক থেকে যতো কাছাকাছি আসবে, উপবৃত্তটি ততো লম্বাটে হবে; আর FG-র মাপ 2a-র তুলনায় যতো ছোট হবে, উপবৃত্তটি ততো বৃত্তাকার হবে। তার মানে, FG ও 2a-র অনুপাত (অর্থাৎ FG-কে 2a দিয়ে ভাগ করলে যা হয় তাই) হচ্ছে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রতার (eccentricity) মাপ। যেমন পৃথিবীর কক্ষের উৎকেন্দ্রতা হচ্ছে ০'০১৭। এই সংখ্যাটি এত ছোট যে পৃথিবীর কক্ষকে প্রায়-বৃত্ত বলা চলে। কিন্তু বুধগ্রহের কক্ষের উৎকেন্দ্রতা হচ্ছে ০'২০৬। এই সংখ্যাটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে বুধগ্রহের কক্ষ রীতিমতো উপবৃত্ত।

চাঁদের দূরত্ব

এমনি একটি উপবৃত্তাকার কক্ষে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবী রয়েছে উপবৃত্তের একটি ফোকসে। তার মানে, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কখনো বাড়ে, কখনো কমে। বাড়তে বাড়তে হয়ে দাঁড়ায় ৪,০৩,২০০ কিলোমিটার (২,৫২,০০০ মাইল) পর্যন্ত। কমতে কমতে হয়ে দাঁড়ায় ৩,৬১,৬০০ কিলোমিটার (২,২৬,০০০ মাইল) পর্যন্ত। মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব চারলক্ষ কিলোমিটার বা আড়াই-লক্ষ মাইল।

চাঁদের কলা

চাঁদ সম্পর্কে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ব্যাপার, প্রতি মাসে চাঁদের নিয়মিত বাড়া-কমা— পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা, আবার অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা।

মনে রাখা দরকার, আমরা চাঁদকে দেখি পৃথিবী থেকে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, চাঁদের ওপরে সূর্যের আলো পড়ে আর আমরা সেই আলোকিত অংশ দেখি।

চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে থাকে তখন চাঁদের আলোকিত অংশ থাকে চাঁদের যেদিকে পৃথিবী তার উল্‌টো দিকে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদের কিছুই আমরা দেখতে পাই না। এই হচ্ছে অমাবস্যা। তারপরে চাঁদ সরতে শুরু করলে দু-একদিন বাদে প্রথম আমরা দেখি সূর্য অস্ত যাবার পরে পশ্চিম আকাশে নিচের দিকে সরু কাস্তের মতো চাঁদের একটা ফালি। এই হচ্ছে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চাঁদ। তারপরে চাঁদের ফালি ক্রমেই পুরু হতে শুরু করে এবং পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথে চাঁদের গতি থাকার দরুন চাঁদকে দেখে মনে হয় আকাশের তারার রাজ্যে রোজই সে যেন খানিকটা করে পুবে সরে যাচ্ছে। এই কারণে চাঁদের উদয় হবার সময় রোজই প্রায় ৫০ মিনিট করে পিছিয়ে যায়।

মোটামুটি সাতদিন পার হবার পরে আমরা দেখি আধখানা চাঁদ। তারপরেও চাঁদ বাড়তে থাকে। শেষকালে একদিন, পৃথিবী যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে, আমরা দেখতে পাই সম্পূর্ণ একটি চাকতির মতো পূর্ণিমার চাঁদ।

তারপরে চাঁদ আবার ছোট হতে শুরু করে। এবারে ব্যাপারটা ঘটতে থাকে ঠিক উলটোভাবে। ছোট হতে থাকা চাঁদকে শেষ দেখা যায় সূর্য ওঠার একটু আগে পুব আকাশে। এই হচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী কি ত্রয়োদশীর চাঁদ। তারপরে আবার অমাবস্যা। চাঁদ তখন আবার পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে।

যুগলে

পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘোরাটা কি-রকম তা একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র থেকে আমরা জানি, প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে টানে। এই নিয়মেই পৃথিবীর টানে বাঁধা পড়েছে চাঁদ। কিন্তু পৃথিবীর ওপরেও তো চাঁদের একটা টান আছে। আসলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ে উভয়ের চারদিকে ঘুরে চলে, আর এমনি ঘুরতে ঘুরতে উভয়ে ঘোরে সূর্যের চারদিকে। পৃথিবী ও চাঁদের এই পারস্পরিক ঘোরাকে তুলনা করা চলে বল্‌নাচে নর্তক ও নর্তকীর ঘোরার সঙ্গে। নর্তক অতিকায়, নর্তকী ক্ষীণা, নর্তকীকে ঘোরাবার জন্য নর্তককে সামান্য এদিক ওদিক পা ফেলতে হচ্ছে মাত্র। উভয়ে যদি সমান হত তাহলে বলা চলত উভয়ের ঘোরার বৃত্তের কেন্দ্রটিকে ঘিরে উভয়ে ঘুরছে। এই বিন্দুটিই হত উভয়ের ভারসাম্যের কেন্দ্র। কিন্তু অসমান হওয়ার দরুন এবং পৃথিবী অপেক্ষাকৃত অতিকায় হওয়ার দরুন ভারসাম্যের কেন্দ্রটি পৃথিবীর দিকে সরে এসেছে। ফলে, ভূ-গোলকের ১৬০০ কিলোমিটার (১০০০ মাইল) ভিতরের একটি বিন্দু উভয়ের ভারসাম্যের কেন্দ্র। এই বিন্দুটিকে ঘিরেই উভয়ে ঘুরছে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী যে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে তা এই বিন্দুটিরই রচনা। পৃথিবীর কেন্দ্র এই কক্ষপথের এদিক ওদিক ঝুঁকতে ঝুঁকতে চলে।

কক্ষ-পরিক্রমা

যাই হোক, আমরা ব্যাপারটাকে সরলভাবেই দেখতে থাকব। অর্থাৎ, আমরা বলব, পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ ঘুরছে। এবং পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরতে চাঁদের সময় লাগে প্রায় ২৭⅓ দিন।

আমরা দেখেছি, অমাবস্যার সময়ে চাঁদ থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে। এই অবস্থানটিতেই চাঁদ আবার ফিরে আসে ২৭⅓ দিন পরে। কিন্তু কক্ষপথে পৃথিবীরও গতি আছে। এই সময়ের মধ্যে

পৃথিবী খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। কাজেই পৃথিবীর নাগাল ধরতে হলে চাঁদকেও আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে হয়। পরের অমাবস্যা হতে পারে চাঁদ পৃথিবীর নাগাল ধরার পরে। অর্থাৎ ২৭⅓ পরে নয়, আরো খানিকটা বেশি সময় লেগে যায়, হয়ে থাকে প্রায় ২৯½ দিন পরে। এই হচ্ছে এক চান্দ্র মাস।

টান-বন্দী

চাঁদের একই দিক সবসময়ে পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে, এটা জানা কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এমনটি কি করে হয়? কেন হয়? হয় এই কারণে যে চাঁদ যতোদিনে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরছে ঠিক ততোদিনেই নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খাচ্ছে। পৃথিবী যেন নবাব, তাকে কুর্নিশ করতে করতে চাঁদ ঘুরছে। চাঁদের মুখ তাই সব সময়ে পৃথিবীর দিকে—কুর্নিশ করতে হলে পিছন ফেরা চলে না। উপমা বাদ থাক, কিন্তু এমন একটা আশ্চর্য সমন্বয়—যতোখানি সময় নিয়ে একবার ঘোরা ততোখানি সময় নিয়েই একবার পাক খাওয়া—কেমন করে সম্ভব হল?

আমরা জানি, পৃথিবীর সমুদ্রে যে জোয়ার ওঠে তার কারণ চাঁদের ও সূর্যের টান। চাঁদের টানেই বেশি, সূর্যের টানে কম। আমাদের আলোচনার জন্য সূর্যের টান বিবেচনা না করলেও চলে, চাঁদের টানটাই প্রধান। চাঁদের টানে সমুদ্রে জোয়ার উঠেছে, তাই যদি হয় তাহলে জোয়ারের চুড়ো সবসময়ে থাকতে চাইবে চাঁদের সরাসরি নিচে—অর্থাৎ যে-দিক থেকে টান সেইদিকে। কিন্তু পৃথিবী তো তার অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে (পশ্চিম থেকে পুবে)। তখন চাঁদের ঠিক নিচে থাকার জন্য জোয়ারের চুড়োও পৃথিবীর পাক খাওয়ার উল্টো দিকে (পুব থেকে পশ্চিমে) সরতে শুরু করবে। তারই ফলে পৃথিবীর সমুদ্রে একবার জোয়ার একবার ভাটা, আবার জোয়ার আবার ভাটা—প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দু-বার করে। এই জোয়ার-ভাটার দরুন পৃথিবীকে ঘিরে একটা জলের প্রবাহ তৈরি

হয়ে যায়—পৃথিবী যে-দিকে পাক খাচ্ছে তার উল্‌টো দিকে। ফলে ঘর্ষণ (friction) ঘটে এবং অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর পাক-খাওয়াকে আস্তে করার জন্য একটা ব্রেক কষার মতো ব্যাপার চলতে থাকে। অর্থাৎ, এই ঘর্ষণ ঘটার দরুন অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগ একটু একটু করে কমছে। তার মানে, দিন একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে। তবে মাত্রাটা খুবই সামান্য, প্রতি একশো বছরে পৃথিবীর দিন বড়ো হচ্ছে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। তবে যতো সামান্যই হোক একসময়ে এমন দিন আসবে যখন পৃথিবীর একই দিক সবসময়ে চাঁদের দিকে ফেরানো থাকবে এবং পৃথিবীর অন্য দিক থেকে আর কখনোই চাঁদ দেখা যাবে না। এ ব্যাপারটি ঘটতে সময় লাগার কথা পাঁচ-হাজার কোটি বছর।

আর চাঁদের বেলায় এ-ব্যাপারটি ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। পৃথিবীর টানে চাঁদে জোয়ার ওঠে। চাঁদে জল নেই, কিন্তু টানের জোর ঠিকই গিয়ে পড়ে চাঁদের শিলার ওপরে এবং জোয়ার-ভাটা ঘটার মতোই একটা ঘর্ষণের অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। বহুকাল এমনি চলতে চলতে শেষকালে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে চাঁদের একই দিক পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে। অর্থাৎ পৃথিবীর টানে চাঁদ পুরোপুরি আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

লাইব্রেশন

তবে একটা কথা আছে। যদিও চাঁদ ঠিক যতোদিনে একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে ঠিক ততোদিনেই একবার নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে—কিন্তু দুটো ঠিক একভাবে নয়। চাঁদের ঘোরার বেগ কখনো বেশি কখনো কম—উপবৃত্তাকার কক্ষে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে (পৃথিবী রয়েছে উপবৃত্তের একটি ফোকসে) চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে তখন চাঁদের ঘোরার বেগ সবচেয়ে বেশি, যখন সবচেয়ে দূরে তখন ঘোরার বেগ সবচেয়ে কম। কিন্তু পাক খাওয়ার বেগ সবসময়েই সমান। ফলে কখনো কখনো ধারের দিকে

চাঁদের বাড়তি অংশ চোখে পড়ে যায়। আবার, চাঁদের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের পাঁচ-ডিগ্রী কোনাকুনি—এই কারণেও চাঁদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে খানিকটা করে বাড়তি অংশ চোখে পড়ে। অর্থাৎ, ব্যাপারটা যেন এই যে চাঁদ পাশ-মুড়ি দিয়ে এবং মাথার দিক ও পায়ের দিক ঝুঁকিয়ে খানিকটা করে বাড়তি অংশ প্রকাশ করছে। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় চাঁদের লাইব্রেশন (libration)। সব মিলিয়ে চাঁদের গোলকের ৫৯ শতাংশ বা মোটামুটি সাতভাগের চারভাগ দেখতে পাই। বাকি ৪১ শতাংশ বা সাতভাগের তিনভাগ পৃথিবী থেকে কখনোই সরাসরি দেখা যায় না।

কিন্তু সরাসরি দেখা না গেলেও ক্যামেরার চোখ দিয়ে বা সশরীরে চাঁদের দেশে হাজির হয়ে দেখতে বাধা নেই। ইতিমধ্যে এই দু-ভাবেই আমরা দেখেছি। প্রথম দেখেছিলাম ক্যামেরার চোখ দিয়ে যখন সোভিয়েত রকেট লুনিক-৩ চাঁদের অ-দেখা দিকের ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। লুনিক-৩ আকাশে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে। তারপরে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের অনেকগুলো স-মনুষ্য অ্যাপোলো ব্যোম-যান চাঁদের চারদিকে কক্ষপথে ঘুরেছে। এইসব ব্যোমযানের যাত্রীরা যেমন গোটা চাঁদের উপরিতল চোখে দেখে এসেছে তেমনি তার নিখুঁত ফটো তুলে এনেছে।

উপরিতল

খালি চোখে তাকালেও চাঁদের অনেকখানি অংশে কালো ছোপ চোখে পড়ে। আগেকার কালের বিজ্ঞানীরা ভাবতেন এই কালো ছোপের অংশ হচ্ছে চাঁদের জলভাগ, তাই তাঁরা এই অংশের নাম দিয়েছিলেন 'মারিয়া' (Maria) বা সাগর। আর চমৎকার সব নামও দিয়েছিলেন এক-একটি সাগরের। যেমন, শান্ত সাগর (Mare Tranquillitatis), স্নিগ্ধ সাগর (Mare Serenetatis), বর্ষণ সাগর (Mare Ibrium) ইত্যাদি। পরে বিজ্ঞানীদের হাতে শক্তিশালী দূরবীন

আসার পরে তাঁরা দেখতে পান, চাঁদে জল নেই। কিন্তু নামগুলো তবুও টিকে থাকে।

চাঁদের উপরিতলে যে এলাকাকে বলা হচ্ছে সাগর তা আসলে বিশাল সমতল-ভূমি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একসময়ে লাভাজাতীয় পদার্থ বিপুল পরিমাণে নিঃসৃত হয়ে চাঁদের উপরিতলে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরে জমাট বেঁধেছে। চাঁদের বাকি অংশের যা চেহারা তার তুলনায় সাগরের অংশকে সাধারণভাবে মসৃণই বলতে হবে, তাহলেও এই সাগরের এলাকা যথেষ্ট উঁচু-নিচু, এখানে ছড়ানো রয়েছে অজস্র জ্বালামুখ বা খাদ, ছোট ছোট ঢিবি, প্রাকার, সরু লম্বা আঁকা-বাঁকা ফাটল (রিল)।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভাবা হত চাঁদের এই সাগর এলাকা গভীর ধুলোয় ঢাকা। কিন্তু চাঁদের এইসব এলাকায় ব্যোমযান আলতোভাবে অবতরণ করেছে এবং জানা গিয়েছে যে চাঁদের উপরিতল যথেষ্ট শক্ত। তারপরে পৃথিবীর মানুষ চাঁদের মাটিতে হেঁটে এসেছে এবং শান্ত সাগরে ও অন্য নানা জায়গায় পায়ের ছাপ রেখে এসেছে।

চাঁদের যে-দিক আমরা দেখতে পাই সে-দিক অতিমাত্রায় এবড়ো-খেবড়ো, তার চারদিকে বিশাল বিশাল পর্বতশ্রেণী ও উঁচু দেওয়াল ঘেরা জ্বালামুখ বা গহ্বর। চাঁদের পর্বতশ্রেণী চেহারায় প্রায় পৃথিবীর পর্বতশ্রেণীর মতোই, নামও অনুরূপ (যথা, আল্‌প্‌স, আপেনাইন, ককেসাস)। চাঁদের কোন পর্বত তুলনাগতভাবে কতটা উঁচু তা বলা শক্ত, কেননা সমুদ্র-তল বলে কোনো নির্দেশক তল সেখানে নেই। বলা চলে, ভূমি থেকে সবচেয়ে উঁচু পর্বতের চুড়ো ২৬,০০০ ফুট (৭৯০০ মিটার) পর্যন্ত উঁচু।

চাঁদের উপরিতলে সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে এই গহ্বর-গুলো—সংখ্যায় হাজার হাজার। কোনো কোনো গহ্বর ছোট গর্তের মতো, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে জোরালো দূরবীনেও যা দেখা যায় না। কোনো কোনো গহ্বরের ব্যাস ২৫০ কিলোমিটারেরও বেশি। গহ্বর-গুলো সাধারণত গোল, চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

গহ্বর বলা হচ্ছে বটে কিন্তু তার চেহারা খাড়া নিচের দিকে নেমে যাওয়া গভীর খাদের মতো কখনো নয়। বলা যেতে পারে, মাঝারি উচ্চতার দেওয়াল ঘেরা নাবাল জমি। এমনও দেখা যায় যে এই নাবাল জমির মাঝখান থেকে এক বা একাধিক পাহাড়ের চুড়ো উঠেছে।

চাঁদের এই গহ্বরগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে অতীতের বিখ্যাত সব পুরুষ ও নারীর নামে। তবে অধিকাংশ নামই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের—যথা, টলেমি, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল। টলেমির গহ্বরটির ব্যাস প্রায় ১৫০ কিলোমিটার, গহ্বরটি রয়েছে পৃথিবী থেকে চাঁদের যে-দিক আমরা দেখতে পাই সেই দিকের মাঝামাঝি জায়গায়। কোপারনিকাস গহ্বরের ব্যাস প্রায় ৯০ কিলোমিটার, চারদিকের দেওয়াল অপেক্ষাকৃত উঁচু, মাঝখানে রয়েছে গোটাকতক চমৎকার পর্বত।

চাঁদের উপরিতলে এত গহ্বর তৈরি হল কি করে তাই নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আধুনিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে অধিকাংশ মত বাতিল হয়ে গিয়েছে, মাত্র দুটি গ্রাহ্য। একটি মত অনুসারে, গহ্বরগুলো তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ার ফলে—অনেকটা যে-কারণে পৃথিবীর উপরিতলে রয়েছে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। অপর মত অনুসারে, গহ্বরগুলো তৈরি হয়েছে উল্‌কাপিণ্ডের ঘায়ে। চাঁদে হাওয়া নেই, কাজেই উল্‌কাপিণ্ড যখন চাঁদের মাটির দিকে নেমে আসে, তখন তাতে আগুন ধরতে পারে না। ফলে, ছোট হোক বড়ো হোক, গোটা উল্‌কাপিণ্ডটাই প্রচণ্ড জোরে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে।

দুটি মতই গ্রাহ্য, অর্থাৎ গহ্বর তৈরি হয়েছে দুই কারণেই। যেমন আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ায়, তেমনি উল্‌কাপিণ্ড আছড়ে পড়ার ফলে। এখানে বলা যেতে পারে, অ্যাপোলো-১১ অভিযানের নভশ্চররা (আর্মস্ট্রং ও অ্যাল্‌ড্রিন) চাঁদ থেকে যে-সমস্ত শিলা নিয়ে এসেছেন সেগুলো ব্যাসল্ট বা আগ্নেয় শিলা। আর চাঁদের ভূমিকম্পের হদিশ

নেবার জন্য প্রশান্ত সাগরের এলাকায় তাঁরা যে ভূকম্পলিখ যন্ত্র রেখে এসেছেন তার মাপ থেকে ধারণা করা হয়েছে যে চাঁদের ত্বকের গভীরতা প্রায় ২০ কিলোমিটার, আর এই ত্বকের নিচে রয়েছে একটি উষ্ণ স্তর, যেটি সম্ভবত গলিত শিলার। তার মানে, ধরে নিতে হয়, চাঁদে আগ্নেয়গিরির ক্রিয়া বেশ ভালোভাবেই ঘটেছে এবং বিপুল এলাকা জুড়ে লাভাস্রোত বয়ে গিয়েছে।

চাঁদের আকাশ

চাঁদের দেশের আকাশ দিনের বেলাতেও কুচকুচে কালো আর সেই কুচকুচে কালো আকাশে দিনের বেলাতেও তারা ফুটে থাকে। এমনটি হওয়ার কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। চাঁদের দেশে বায়ুমণ্ডল নেই। আর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যদি সূর্যের আলোকে মাটিতে পৌঁছতে না হয় তবে মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশকে দেখাবে কুচকুচে কালো।

চাঁদের আকাশে পৃথিবী

চাঁদের দেশের আকাশে পৃথিবীর উদয় বা অস্ত নেই। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হবে, চাঁদের দেশের আকাশে পৃথিবী মোটামুটি একই জায়গায় এঁটে রয়েছে। মোটামুটি একই জায়গায়, হুবহু একই জায়গায় নয়। চাঁদের লাইব্রেশন থাকার দরুন চাঁদের আকাশে পৃথিবী নির্দিষ্ট একটি সীমানার মধ্যে অদ্ভুতভাবে নড়াচড়া করে।

চাঁদের কক্ষ-আবর্তনে যতোদিন সময় লাগে অক্ষ-আবর্তনেও ঠিক ততোদিন। তার মানে, যতোটা সময়ে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরছে ঠিক ততোটা সময়ে একবার পাক খচ্ছে। তার মানে, পৃথিবী থেকে আমরা সব সময়েই চাঁদের একদিকের অর্ধেকটা দেখি, অন্য-দিকের অর্ধেকটা সবসময়েই আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যায়। আর ব্যাপারটা যদি উল্‌টোভাবে ঘটে—অর্থাৎ চাঁদের দেশ থেকে যদি পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখি—তাহলে চাঁদের একদিক

থেকে মনে হবে, পৃথিবী যেন চাঁদের আকাশের মোটামুটি একই জায়গায় এঁটে রয়েছে ; অন্যদিক থেকে পৃথিবীকে একেবারেই দেখা যাবে না।

চাঁদের দেশের আকাশে পৃথিবীকে দেখাবে মস্ত একটা থালার মতো। কিন্তু সেই থালাটি যে কত মস্ত সে সম্পর্কে ধারণা দিতে হলে কিছু অঙ্কের হিসেব দিতে হয়। চাঁদের ব্যাসের চেয়ে পৃথিবীর ব্যাস প্রায় চারগুণ বড়ো। তার মানে, পৃথিবীর আকাশে চাঁদের থালা যতোটা বড়ো তার চেয়ে চাঁদের আকাশে পৃথিবীর থালা চোদ্দগুণ বড়ো। শুধু তাই নয়, আলো ঠিক্‌রোবার ক্ষমতা চাঁদের যতোটা পৃথিবীর তার চেয়ে ছ-গুণ বেশি। তার মানে, আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর আকাশে নব্বুইটা চাঁদ থাকলে যতোখানি আলো পাওয়া যেত, চাঁদের আকাশে একটি পৃথিবী থেকেই ততোখানি আলো পাওয়া যায়। সে-আলোয় খুব ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে ছাপা বই পড়তেও কোনো অসুবিধে হয় না। আমরা যে অনেক সময়ে ফালি-চাঁদের কোলে চাঁদের বাকি অন্ধকার অংশটুকুকেও আবছাভাবে দেখতে পাই তা এই পৃথিবী থেকে ঠিকরে-পড়া আলোর জন্য।

তবে এই আলো সব সময়েই 'পূর্ণিমা'র (অর্থাৎ পূর্ণ-পৃথিবীর) আলো নয়। পৃথিবীর আকাশে চাঁদের যেমন কলা রয়েছে, চাঁদের আকাশে পৃথিবীরও তাই। পৃথিবীতে যখন অমাবস্যা, চাঁদে তখন পূর্ণিমা ; পৃথিবীতে যখন পূর্ণিমা, চাঁদে তখন অমাবস্যা। গোটা ব্যাপারটাই উল্‌টোভাবে ঘটে। পৃথিবীতে যখন চন্দ্রগ্রহণ, চাঁদে তখন সূর্যগ্রহণ ; পৃথিবীতে যখন সূর্যগ্রহণ, চাঁদে তখন পৃথিবী-গ্রহণ।

তুলনাগত আকার

পূর্ণিমার রাতে আকাশের কপালে মস্ত একটা টিপের মতো ঝক্‌ঝকে চাঁদকে চোখের দেখায় সূর্যের মতোই বড়ো মনে হয়। আসলে কিন্তু তা নয়, এটা ঘটে আমাদের চোখের দেখার সীমাবদ্ধতার জন্য। পৃথিবী, চাঁদ আর সূর্য হচ্ছে তিনটি গোলক, আর এই তিনটি

গোলকের আকার সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ধারণা হতে পারে যদি গোলক তিনটির ব্যাস জানা যায়। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ১২,৮০০ কিলোমিটার বা ৮০০০ মাইল, চাঁদের ব্যাস ৩,৪৫৬ কিলোমিটার বা ২,১৬০ মাইল আর সূর্যের ব্যাস ১৩,৮২,৪০০ কিলোমিটার বা ৮,৬৪,০০০ মাইল। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,০০০ কিলো-মিটার বা ২,৪০,০০০ মাইল আর পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৪,৮৮,১৪,৪০০ কিলোমিটার বা ৯,৩০,০৯,০০০ মাইল। এসব হিসেব থেকে সোজা কথাটা যা দাঁড়ায় তা এই : সূর্যের ব্যাস চাঁদের ব্যাসের চেয়ে চারশো গুণ বেশি এবং পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ১০৯ গুণ বেশি। অর্থাৎ সূর্য চাঁদের চেয়ে শুধু যে চারশো গুণ বেশি দূরে আছে তা নয়, চাঁদের চেয়ে আকারেও চোদ্দ-শো গুণ বড়ো। সূর্য মহাশূন্যের যতোটা জায়গা জুড়ে আছে তার মধ্যে প্রায় তেরো লক্ষ পৃথিবীকে এবং প্রায় সাড়ে-ছয় কোটি চাঁদকে পুরে রাখা চলে।

চাঁদে কেন হাওয়া নেই ?

চাঁদে কেন হাওয়া নেই ? এ-প্রশ্নের জবাব ঠিকমতো বুঝতে হলে বিশ্বজগতের আরেকটি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া দরকার। নিয়মটি হচ্ছে মহাকর্ষ। মহাকর্ষ ব্যাপারটা কি ?

একটন ওজনের কোনো জিনিসকে কি কোনো মানুষ দু-হাতে তুলতে পারে ? পারে না। পারে না, কারণ, পৃথিবীর অভিকর্ষ (পৃথিবীর বেলায় মহাকর্ষকে বলা হয় অভিকর্ষ) জিনিসটাকে পৃথিবী টেনে ধরে আছে; আর এক টন ওজনের বেলায় পৃথিবীর টানটা এত জোরালো যে মানুষের হাতের জোর কিছুতেই তার বেশি হতে পারে না। মহাকর্ষের ব্যাপারটাকে প্রথম আবিষ্কার করেন নিউটন। গল্প আছে, তিনি একদিন একটা আপেল ফলকে গাছ থেকে মাটিতে পড়তে দেখে ভাবতে শুরু করেন আপেল মাটিতে পড়ে কেন ? ভাবতে ভাবতে তিনি একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন : বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু অন্য প্রত্যেকটি বস্তুকে নিজের দিকে

টানছে। পৃথিবী আমাকে টানছে আর আমি পৃথিবীকে টানছি। কিন্তু পৃথিবীর টানটা আমার টানের চেয়ে এত বেশি জোরালো যে আমাকেই পৃথিবীর গায়ে এঁটে থাকতে হয়। আমার পায়ের নিচে থেকে যদি পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ কাটা যেত তাহলে পৃথিবীর টানে আমি সরাসরি গিয়ে হাজির হতাম পৃথিবীর কেন্দ্রে। তেমনি সূর্য পৃথিবীকে টানছে, পৃথিবী সূর্যকে। কিন্তু সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের চেয়ে প্রায় ৩·৩ লক্ষ গুণ বেশি। কাজেই পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের টানও বেশি। সূর্যের এই টানে বাঁধা পড়েছে বলেই পৃথিবী ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে পারছে না—সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে। আর যদি পৃথিবীর নিজস্ব একটা ছুট না থাকত তাহলে সূর্যের টানে পৃথিবী সরাসরি গিয়ে হাজির হত সূর্যের কেন্দ্রে।

এই টান কতটা জোরালো হবে তা নির্ভর করে ছুটো জিনিসের ওপর—বস্তুর ভর ও ছুই বস্তুর মধ্যেকার দূরত্ব। ভর বাড়লে বা দূরত্ব কমলে টানের জোর বাড়ে এবং ভর কমলে বা দূরত্ব বাড়লে টানের জোর কমে। যেখানেই বস্তু সেখানেই টান। বস্তুজগতের এই টানের নাম দেওয়া হয়েছে মহাকর্ষ।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ইঞ্জিন যেমন মালগাড়িকে টানে—এই টানটা সে-জাতের নয়। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। চুম্বক লোহাকে টানে বা ছুই বিপরীতধর্মী চুম্বক পরস্পরকে টানে, কিন্তু ইচ্ছে করলেই এই টানের মাঝখানে আড়াল তুলে দেওয়া যায়। এক বস্তুর আলো ও উত্তাপ অপর বস্তুতে পৌঁছতে সময় লাগে এবং ইচ্ছে করলে বাঁধ তুলে বন্যা আটকাবার মতো এই আলো ও উত্তাপকেও আড়াল তুলে ঠেকিয়ে রাখা চলে। কিন্তু ছুই বস্তুর টানাটানি কোনো আড়াল মানে না বা সময়ের পরোয়া করে না। আকাশে এমন নক্ষত্রও আছে যার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লেগেছে কিন্তু যার টানের ফাঁসে সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকেই পৃথিবী বাঁধা। এইচ-জি-ওয়েল্‌সের একটি বহুপঠিত উপন্যাস আছে—'দি ফার্স্ট মেন ইন্ দি মুন' (চাঁদে প্রথম মানুষ)। তাঁর

উপন্যাসের নায়ক আশ্চর্য একটি ধাতু আবিষ্কার করে যার ওপরে মহাকর্ষের নিয়ম কার্যকর নয়। অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ যেমন উত্তাপকে ঠেকিয়ে রাখে তেমনি এই ধাতু মহাকর্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। এই বিশেষ ধাতুর তৈরী একটি ব্যোমযানে চেপে তাঁর উপন্যাসের নায়ক চাঁদে যাত্রা করেছিল। এই ব্যোমযানের চারপাশে ছিল খড়খড়ি। কোনো এক দিকের খড়খড়ি খুলে ধরলেই সেই দিক থেকে মহাকর্ষ টান মারতে থাকে; যেমন অ্যাস্‌বেস্‌টসে ফুটো হলে সেই ফুটো দিয়ে উত্তাপ চলাচল শুরু হয়ে যায়। এখন আমরা বলতে পারি মহাকর্ষের নিয়ম খাটে না এমন কোনো ধাতু নেই। মহাকর্ষের টান সাধারণ টানের মতো নয়। এটা একটা বিশেষ ধরনের টান। এই টানকে কোনো আড়াল দিয়ে ঠেকানো যায় না। এই টানের বাইরে যেতে হলে পাল্‌টা একটি ছুট তৈরি করে এই টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। যেমন গিয়েছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভোস্‌খদ ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের মেরিনার ইত্যাদি। স্পুৎনিক ও অন্য সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহকে কিন্তু এমন একটা মাপে ছুট দেওয়ানো হয়েছিল যাতে শেষপর্যন্ত এই পৃথিবীর টানের মধ্যে থেকেই উপগ্রহের মতো পৃথিবীকে পাক দিতে শুরু করে। ছুটের মাপ কী হলে টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটি কি-ভাবে ঘটবে সে-সব আলোচনায় আমাদের পরে আসতে হবে। আপাতত টান ও ছুট সম্পর্কে ধারণাটুকু পরিষ্কার থাকা দরকার।

আর এই টান ও ছুটের ব্যাপারটা যদি আমরা ঠিকমতো বুঝতে পেরে থাকি—তাহলে আমাদের মূল প্রশ্নের জবাব পেতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। আগে বলেছি, চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। সুতরাং চাঁদের টানও পৃথিবীর টানের চেয়ে অনেক কম। পৃথিবীর কোনো খেলোয়াড় যদি একটা ফুটবলে লাথি মেরে একশো ফুট উঁচুতে তুলতে পারে তবে চাঁদে সে তুলবে ছ-শো ফুট। চাঁদ যদি আরও ছোট হত, অর্থাৎ চাঁদের টান যদি আরও কম হত, তবে সেই একই লাথির জোরে ফুটবল উঠে যেত আরো উঁচুতে।

আর ফুটবল না হয়ে যদি হয় কামানের গোলা—তাহলে? পৃথিবীতে যে কামানের গোলা এক কিলোমিটার উঁচুতে উঠতে পারে, চাঁদে তা উঠবে ছয় কিলোমিটার। কামান দাগবার জোর যতো বাড়বে কামানের গোলাও ততো উঁচুতে উঠবে। মনে করা যাক্, কামান দাগবার জোর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কামানের গোলাও ক্রমেই উঁচু থেকে উঁচুতেই উঠবে। এই ব্যাপারটা চলতে চলতে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছনো সম্ভব কিনা যখন কামানের গোলাটা আর ফিরে আসবে না—মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে? বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এমন অবস্থায় পৌঁছনো খুবই সম্ভব। কামানের নল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যদি কামানের গোলা সেকেণ্ডে ১১·২ কিলো-মিটার বা সাত মাইল বেগে ছোটে তাহলে সেই ছুট পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কামানের গোলাটা পৃথিবীতে ফিরে না এসে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যায়। আর চাঁদের বেলায় এতটা জোরালো ছুট না হলেও চলে। সেখানে সেকেণ্ডে আড়াই কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারলেই কামানের গোলা উধাও হয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর হাওয়া যে পৃথিবীর গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে আর চাঁদের হাওয়া যে উধাও—তার কারণটা হচ্ছে এই।

পৃথিবীর হাওয়ার মধ্যে যেমন আছে একাধিক মৌলিক পদার্থের কণা, তেমনি আছে ধুলো ও বাষ্পের কণা। এই কণাগুলো কোনো সময়েই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, অনবরত ছুটোছুটি গুঁতো-গুঁতি করে। আবার দিনের বেলা হাওয়া যতো গরম হতে থাকে, এই কণাগুলোর ছুটোছুটিও ততো বেড়ে যায়। পৃথিবীতে হাওয়া-কণার এই দৌড়ছুটের বেগ কোনো অবস্থাতেই সেকেণ্ডে এগারো কিলোমিটারের কাছাকাছি আসে না। অর্থাৎ পৃথিবীর টান হাওয়ার কণার ছুটের চেয়ে সব সময়ে বেশিই থেকে যায়। কাজেই পৃথিবীর হাওয়া যতোই ঝাপ্‌টে বেড়াক না কেন, অদৃশ্য একটা টানে তাকে পৃথিবীর গায়ের সঙ্গেই লেপ্‌টে থাকতে হয়।

কিন্তু চাঁদে অন্য ব্যাপার ঘটে। আগে বলেছি, প্রায় পনেরো

দিন ধরে চাঁদের একদিকে দিনের আলো, অন্যদিকে রাতের অন্ধকার। দিনের দিক সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত হতে হতে শেষকালে ফুটন্ত জলের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চাঁদে যদি হাওয়া থাকত তবে এই প্রচণ্ড উত্তাপে কণাগুলো এমন অস্থিরভাবে ছুটোছুটি শুরু করে দিত যে সেই ছুটোছুটির বেগ সেকেণ্ডে আড়াই কিলোমিটারের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া খুব একটা শক্ত ব্যাপার হত না। এইভাবে চাঁদের সমস্ত জলও বাষ্প হয়ে গিয়ে উবে গেছে। সেই বাষ্পের কণা অতি অনায়াসেই চাঁদের টানকে অগ্রাহ্য করে পাড়ি দিয়েছে শূন্যে। এইচ-জি-ওয়েল্‌সের 'চাঁদে প্রথম মানুষ' বইয়ে চাঁদের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কেও ভুল কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে, চাঁদে যখন দু-সপ্তাহ ধরে রাত্রি চলতে থাকে তখন রাতের দিকেব চাঁদের বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে কঠিন অবস্থায় পৌঁছয়, আবার যখন চাঁদের দু-সপ্তাহের দিন শুরু হয় তখন গরমে সেই জমাট-বাঁধা হাওয়া আবার গ্যাসীয় অবস্থায় পৌঁছয় এবং একটি বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়। কথাটা ভুল। আমরা জানি চাঁদের একদিকে যখন রাত চলছে, অপর দিকে দিন। রাতের দিকে হাওয়া থাকবে না কিন্তু দিনের দিকে থাকবে এমন অবস্থা হতেই পারে না। ফাঁকা জায়গাকে ভরাট করবার জন্য দিনের দিকের হাওয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসত রাতের দিকে এবং ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধত। অর্থাৎ, সত্যিকারের বায়ুমণ্ডল চাঁদে কোনো সময়েই পাওয়া সম্ভব হত না। চাঁদের সমস্ত হাওয়া পালা করে এক-একবার এক-একদিকে গিয়ে জমাট বাঁধত

আলোছায়ার দ্বন্দ্ব

চাঁদের যেদিকে দিন সেদিকে যেমন ফুটন্ত জলের চেয়ে বেশি উত্তাপ তেমনি চাঁদের যেদিকে রাত সেদিকে হিমাঙ্কের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা। রাতের চাঁদে উত্তাপ নেমে আসে শূন্য ডিগ্রীর নিচে ১৬০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। ফুটন্ত জলের তুলনায় বরফ যতোটা ঠাণ্ডা, বরফের তুলনায় এটা তার চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা।

তবে এক ব্যাপারে রক্ষে আছে। চাঁদের দেশে উত্তাপের যা কিছু ওঠা-নামা সবই চাঁদের মাটির ওপরে ; মাটির নিচে এই ওঠানামা বিশেষ পৌঁছতে পারে না। প্রায় পনেরো দিন ধরে সূর্যের আলোয় ঝল্‌সে যাবার পরে যেখানে চাঁদের মাটির ওপরের দিকটা ফুটন্ত জলের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে মাটির নিচে উত্তাপ তখনো হিমাঙ্কের নিচে। চন্দ্রগ্রহণের সময়ে দেখা গেছে, চাঁদের উত্তাপ বড়ো তাড়াতাড়ি ওঠা-নামা করে। চন্দ্রগ্রহণের সময়ে পৃথিবী থাকে সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে, আর পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে চাঁদের ওপরে। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ সূর্যের আলো আড়াল হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, চাঁদের উত্তাপ নামতে থাকে। হিসেবটা এই রকম : গ্রহণের আগে চাঁদের উত্তাপ ছিল ৭০° সে । গ্রহণের সময়ে নেমে আসে শূন্য-ডিগ্রীর নিচে ১১৭° সেন্টিগ্রেডে। তার মানে ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধ্যে প্রায় দু-শো ডিগ্রী উত্তাপ নেমে আসা ! পৃথিবীতে এমন ব্যাপার ভাবাও যায় না। সূর্যগ্রহণের সময়ে পৃথিবীর উত্তাপ ২° সে বা বড়ো জোর ৩° সে. কমে। পৃথিবীর উত্তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা আছে—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উত্তাপকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। এমনকি দিনের পৃথিবী ও রাতের পৃথিবীর মধ্যেও উত্তাপের খুব বেশি ওঠা-নামা নেই। দিনের বেলা পৃথিবীর মাটি ও বায়ুমণ্ডল সূর্যের অনেকখানি উত্তাপ নিজের মধ্যে ধরে রাখে আর রাত্রিবেলা তা ছড়িয়ে দেয়। চাঁদের মাটি উত্তাপ ধরে রাখতে পারে না।

চাঁদের দেশ

এতক্ষণ ধরে চাঁদের যে চেহারা দেখতে পাওয়া গেল তা থেকে বোঝা যায়, চাঁদের দেশটা বেড়াতে আসার পক্ষে খুব একটা খাসা জায়গা নয়। জল নেই, হাওয়া নেই, মাটি ও আকাশের রঙ নেই—আগ্নেয়গিরির ভস্মাবশেষ দিয়ে মোড়া নিষ্প্রাণ এক জগৎ। চার-দিকে শুধু এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়, মরুভূমির মতো জমি ও বড়ো

বড়ো গহ্বর। এক একটা গহ্বর এত বড়ো যে কলকাতার মতো একটা শহরকে তার মধ্যে পুরে রাখা চলে। আর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। হাজার চেষ্টা করলেও সেখানে এতটুকু শব্দের কম্পন তোলা যাবে না।

তাছাড়া চাঁদের দেশে আরেকটা মস্ত বিপদ আছে। তা হচ্ছে উল্‌কাপাত। চাঁদের উল্‌কাপাত পৃথিবীর উল্‌কাপাতের মতো একেবারেই নয়। পৃথিবী থেকে উল্‌কাপাতকে দেখে মনে হয় যেন আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়ছে। আসলে ব্যাপারটা যা ঘটে তা এই : মহাশূন্যে অসংখ্য বস্তুকণা আছে এবং সূর্যের প্রদক্ষিণপথে পৃথিবী মাঝে মাঝে এইসব বস্তুকণার ঝাঁকের মধ্যে এসে পড়ে। আর তখন পৃথিবী তার অভিকর্ষের অদৃশ্য সুতো দিয়ে বস্তুকণাকে টান মারে নিজের দিকে আর এই অদৃশ্য টানে বস্তুকণাগুলো প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। প্রতিদিনে পৃথিবীর ওপরে অসংখ্য উল্‌কাপাত হয়ে চলেছে কিন্তু সব সময়ে আমরা তা টের পাই পাই না। বস্তুকণাগুলো পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে আসতে হাওয়ার রাজ্যে এসে যখন পৌঁছয় তখন প্রচণ্ড বেগ সঞ্চয় করেছে। ফলে হাওয়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুকণায় আগুন জ্বলে ওঠে এবং পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার আগেই তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে বস্তুকণা না হয়ে যদি বস্তুপিণ্ড হয় তাহলে যে কী ভয়ংকর কাণ্ড হতে পারে তার নজির ইতিহাসে আছে। ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সাইবেরিয়ার জলাভূমিতে একটি উল্‌কা পড়েছিল। সেই উল্কাপাতের ফলে চারদিকের ৩,২০০ কিলোমিটার জায়গা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায়, আর সেই উল্‌কাপাতের ফলে যে ঝড় ওঠে তাতে সাইবেরিয়ার আট কোটি গাছ খড়ের কুটোর মতো উড়ে যায়। এমনি উল্‌কাপাতের নজির আরো দু-একটা আছে। কিন্তু চাঁদের দেশে উল্কাপাতকে ঠেকাবার জন্য হাওয়া নেই। সেখানে প্রত্যেকটি উল্‌কা বিনা বাধায় চাঁদের মাটিতে নেমে আসে, নিঃশব্দে। চাঁদের মাটিতে যে অজস্র ফাটল আর গহ্বর আছে, অনেকের মতে তা

এই উল্‌কাপাতের জন্য। অনবরত উল্‌কাপাত হতে হতে চাঁদের চেহারাও বিকৃত হয়ে গিয়েছে। সামনে থেকে চাঁদের চেহারা মোটেই কবিত্ব করার মতো নয়।

উল্‌কাপাতটাই একমাত্র বিপদ নয়। আরো আছে অতি-বেগুনী আলো, মহাজাগতিক রশ্মি ও এমনি আরো অনেক কিছু—হাওয়ার বাধা না-থাকার দরুন যেগুলো চাঁদের মাটিতে অবাধে নেমে আসে। পৃথিবীতে আমরা হাওয়ার আড়ালে থাকি বলে এই বিপদগুলো টের পাই না। পৃথিবীর হাওয়ার বাইরে মহাশূন্যে এইসব বিপদের চেহারা কী হতে পারে সে-সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সোভিয়েত ও মার্কিন কৃত্রিম-উপগ্রহ থেকে পাওয়া গিয়েছে। মহাশূন্যের প্রত্যেকটি বিপদ চাঁদের দেশে সমান মাত্রায় বর্তমান।

চাঁদের মাটিতে মানুষ

ষাটের দশকে চাঁদের উদ্দেশে মার্কিন ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো রকেট পাঠিয়েছেন। রকেটগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে সেগুলোর সাহায্যে খুব কাছের থেকে চাঁদের প্রচুর ছবি তোলা গিয়েছে। তারপরে ২১শে জুলাই ঘটেছে চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পদার্পণ। চাঁদের প্রশান্ত সাগর নামে পরিচিত এলাকার ধূসর সমতলে অবতরণ করেছিলেন দুজন মার্কিন নভশ্চর—নীল আর্মস্ট্রং ও এড্‌উইন অ্যাল্‌ড্রিন। আর অ্যাপোলো-১১ অভিযানের তৃতীয় নভশ্চর মাইকেল কলিন্‌স চাঁদের মাটিতে পা দেননি বটে কিন্তু সারাক্ষণ ধরে অ্যাপোলো-১১ ব্যোমযানে চাঁদের কক্ষে পাক খেয়ে চলেছিলেন। মানুষের ইতিহাসে এই তারিখটি ও এই তিনজন নভশ্চরের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই নভশ্চররা পৃথিবীতে ফিরে আসার সময়ে চাঁদের পাথরের নমুনা সঙ্গে নিয়ে আসেন। পরীক্ষা করে জানা যায় পাথরগুলো সবই আগ্নেয় এবং অনেকগুলো ছোট টুকরোর চেহারা চকচকে কাঁচের মতো। পরীক্ষা করে আরো জানা যায়, চাঁদের এই সমস্ত পাথর

খুবই প্রাচীন, বয়স প্রায় ৪৫০ কোটি বছর—অর্থাৎ, পৃথিবীর বয়সের প্রায় সমান।

তারপরে আরো পাঁচটি অ্যাপোলো অভিযানে মার্কিন নভশ্চররা চাঁদের মাটিতে নেমেছেন এবং চাঁদের মাটি থেকে বহুবিধ নমুনাও সংগ্রহ করে এনেছেন। এমনকি চতুর্থ অভিযানের সময়ে (অ্যাপোলো-১৫, ২৬ জুলাই—৭ আগস্ট) একটি ব্যাটারি-চালিত মোটর-গাড়িও চাঁদের মাটিতে চালিয়ে এসেছেন।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত চাঁদে মানুষ পাঠান নি। কিন্তু লুনা পর্যায়ের অনেকগুলো রকেট চাঁদের কক্ষে পাক খাইয়েছেন এবং চাঁদের মাটিতে ধীরে অবতরণ করিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা চালিয়েছেন। দুটি লুনায় (লুনা-১৬, ১২ সেপ্টেম্বর এবং লুনা-২০, ১৪ ফেব্রুআরি) এমন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল যে চাঁদের মাটি থেকে পাথর তুলতে পেরেছে এবং সেই পাথরসহ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরেছে। তাছাড়া লুনোখোদ নামে দুটি স্বয়ংচালিত চান্দ্র যান চাঁদের মাটিতে নামিয়ে তাঁরা বহু পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন।

এখন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, চাঁদে কোনোপ্রকারের জীবন নেই। এবং কোনোকালে ছিল না বলেই মনে হয়। বাতাস ও জল ছাড়া জীবন থাকতেই পারে না।

যে-কথা আগে বলেছি, চাঁদ মোটেই রমণীয় জায়গা নয়। সেখানে মধ্যদিনের উত্তাপ স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে একশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ওপরে, মধ্যরাতের উত্তাপ হিমাঙ্কের চেয়ে দেড়শো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে। দিন শুরু হল তো পৃথিবীর হিসেবে দু-সপ্তাহ ধরে সেই দিন চলে, রাত শুরু হল তো সেই একই ব্যাপার।

এই চাঁদেই পৃথিবীর মানুষ ছ'-ছ'বার পা দিয়েছে। আপাতত যদিও চাঁদে মানুষ পাঠাবার আর কোনো পরিকল্পনা নেই কিন্তু তাই বলে চাঁদে অভিযান শেষ হয়ে যায়নি। এমন দিন আসছে যখন চাঁদে তৈরি হবে বিরাট ঘাঁটি এবং পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে যাবার পথে চাঁদ হয়ে উঠবে একটি মধ্যবর্তী স্টেশন।

সৌরমণ্ডল

সূর্য এবং তার চারদিকে ঘুরে চলা গ্রহ, গ্রহাণু, উল্কা ও ধূমকেতু ইত্যাদি সব মিলিয়ে সৌরমণ্ডল। গ্রহ নয়টি—সূর্যের সবচেয়ে কাছে বুধ (Mercury), তারপরে যথাক্রমে শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth); মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune) ও প্লুটো (Pluto)। বুধ, শুক্র ও প্লুটোকে বাদ দিলে বাকি ছয়টি গ্রহেরই উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর একটি (চন্দ্র বা চাঁদ, Moon), মঙ্গলের দুইটি (Phobus, Deimos), বৃহস্পতির বারোটি (Io, Europa, Ganymede, Callisto ও আরো নামহীন আটটি), শনির দশটি (Janus, Mimas Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, Phoebe), ইউরেনাসের পাঁচটি (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon), নেপচুনের দুইটি (Triton, Nereid)। মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষের মাঝখানে থেকে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে অনেকগুলো পাথরের খণ্ড বা গ্রহাণু। আর আছে ধূমকেতু ও উল্কা।

গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘোরে উপবৃত্তাকার কক্ষে। তবে বুধ ও প্লুটোকে বাদ দিলে অন্য সমস্ত গ্রহের কক্ষ উপবৃত্ত হলেও প্রায় বৃত্তেরই মতো—তফাত সামান্যই।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরা ও নিজের অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর পাক খাওয়া—দুই-ই পশ্চিম থেকে পুবে। একমাত্র শুক্র বাদে অন্য সমস্ত গ্রহের বেলাতেও তাই। শুক্রের পাক খাওয়া উল্টো দিকে।

সূর্যের চারদিকে পুরো একবার ঘুরতে একটি গ্রহের যতো সময় লাগে তাকে বলা হয় সেই গ্রহের বছর বা নাক্ষত্র কাল (Sidereal

Period)। সূর্য থেকে যে-গ্রহ যতো দূরে তার ঘোরা ততো আস্তে আর তার বছরও ততো লম্বা। বুধের একটি বছর পৃথিবীর হিসেবে ৮৮ দিনে আর প্লুটোর একটি বছর পৃথিবীর হিসেবে ২৪৮ বছরে।

সূর্য থেকে পৃথিবী যতোটা দূরে তার চেয়েও কম দূরে বুধ ও শুক্র। পৃথিবী থেকে দেখলে এই দুটি হচ্ছে ভিতরের দিকের গ্রহ বা অন্তঃগ্রহ (Inferior Planets)। তেমনি মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো হচ্ছে বাইরের দিকের গ্রহ বা বহিঃগ্রহ (Superior Planets)। বুধ ও শুক্র সূর্যের চারদিকে ঘোরে পৃথিবীর চেয়েও বেশি বেগে। অতএব কিছুকাল পরে পরে এই দুটি গ্রহ পৃথিবীকে অতিক্রম করে যায়। এমনি একটি গ্রহ পর-পর দু-বার পৃথিবীকে অতিক্রম করতে যতোটা সময় নেয় তাকে বলা হয় সেই গ্রহের যুতিকাল (Synodic Period)। বুধের যুতিকাল ১১৬ দিন। শুক্রের ৫৮৪ দিন। আবার বাইরের দিকের গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘোরে পৃথিবীর চেয়ে কম বেগে। অতএব কিছুকাল পরে পরে পৃথিবী এই সমস্ত গ্রহকে অতিক্রম করে যায়। এমনি একটি গ্রহকে পর-পর দু-বার অতিক্রম করতে পৃথিবী যতোটা সময় নেয় তাকে বলা হয় সেই গ্রহের যুতিকাল। বৃহস্পতি ও তার বাইরের দিকের গ্রহগুলোর যুতিকাল একবছরের কিছু বেশি। মঙ্গলের যুতিকাল ৭৮০ দিন। অর্থাৎ ৭৮০ দিন পরে-পরে পৃথিবী মঙ্গলকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

দুটি অন্তঃগ্রহ পৃথিবীর চেয়ে বেশি বেগে ছোটে বলেই পৃথিবী থেকে কখনো মনে হয় গ্রহদুটি রয়েছে সূর্যের আগে আগে, কখনো সূর্যের পিছনে পিছনে। অন্তঃগ্রহ যখন সূর্যের পশ্চিমে থাকে তখন সূর্য অস্ত যাবার আগে সেটি অস্ত যায় কিন্তু সূর্য ওঠার আগে ওঠে। অর্থাৎ সেটি হয়ে ওঠে 'ভোরের তারা' (ভোরের আকাশে শুক্র-গ্রহকে বলা হয় 'শুকতারা')। অন্তঃগ্রহ যখন সূর্যের পুবে থাকে তখন সূর্য অস্ত যাবার পরেও পশ্চিম-আকাশে থেকে যায় এবং হয়ে ওঠে 'সন্ধ্যাতারা'।

অন্তঃগ্রহ পৃথিবীর চেয়ে বেশি বেগে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

অতএব কখনো কখনো সেই গ্রহকে এমন অবস্থায় আসতেই হয় যখন সূর্য পৃথিবী ও সেই গ্রহ থাকে একই লাইনে। গ্রহের এই অবস্থার নাম সংযোগ (Conjunction)। এমন হতে পারে সেই গ্রহ রয়েছে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে ভিতরের দিকের সংযোগ বা অন্তঃসংযোগ (Inferior Conjunction)। এমন হতে পারে সূর্য রয়েছে পৃথিবী ও সেই গ্রহের মাঝখানে। অর্থাৎ, বাইরের দিকের সংযোগ বা বহিঃসংযোগ (Superior Conjunction) (চিত্র ২৮)।
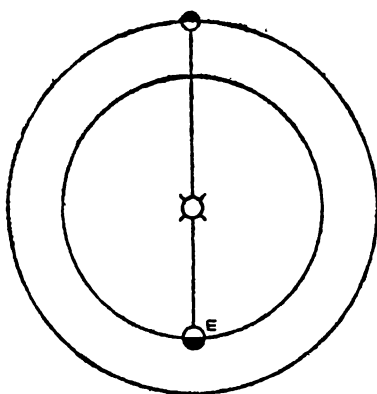
চিত্র ২৭। সংযোগ প্রতিযোগ
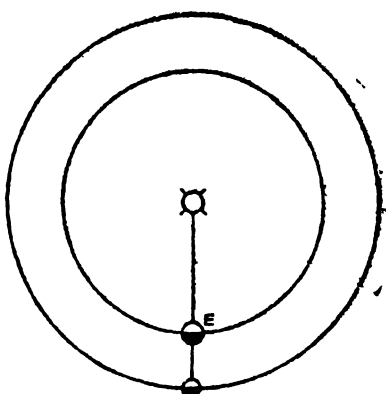
একই অবস্থা ঘটতে পারে কোনো একটি বহিঃগ্রহের অবস্থানেও। অর্থাৎ সেই গ্রহ ও পৃথিবী ও সূর্য একই লাইনে এসে যায়। কখনো পৃথিবী থাকে সেই গ্রহ ও সূর্যের মাঝখানে (অন্তঃগ্রহের বেলায় পৃথিবী কখনো সূর্য ও সেই গ্রহের মাঝখানে আসতে পারে না)। এই অবস্থাকে বলা হয় সেই গ্রহের প্রতিযোগ (Opposition)। কখনো সূর্য থাকে সেই গ্রহ ও পৃথিবীর মাঝখানে। এই অবস্থাকে বলা হয় সেই গ্রহের সংযোগ (Conjunction) (চিত্র ২৭)।

পৃথিবী থেকে তাকিয়ে অন্তঃগ্রহের বেলায় আরো একটি ব্যাপার লক্ষ করা যায়। তা হচ্ছে অন্তঃগ্রহের কলা থাকা, যেমন আছে চাঁদের। পরের পৃষ্ঠায় অন্তঃগ্রহের সংযোগের যে ছবি দেওয়া হয়েছে সেটি

থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। অন্তঃসংযোগের অবস্থায় অন্তঃগ্রহের 'অমাবস্যা', বহিঃসংযোগের অবস্থায় অন্তঃগ্রহের 'পূর্ণিমা' (সূর্য থাকার দরুন তখনো কিন্তু পৃথিবী থেকে দেখা যায় না)। অন্তঃসংযোগের
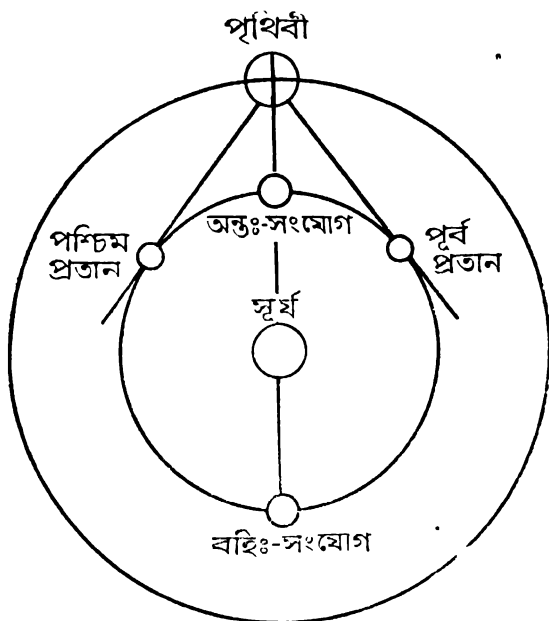
চিত্র ২৮। অন্তঃগ্রহের বিভিন্ন অবস্থান। সূর্য, পৃথিবী ও অন্তঃগ্রহ যখন একই লাইনে, অন্তঃগ্রহের সেই অবস্থানকে বলা হয় সংযোগ। অন্তঃগ্রহ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে, সেই অবস্থানের নাম অন্তঃসংযোগ। সূর্য যখন পৃথিবী ও অন্তঃগ্রহের মাঝখানে, তখন বহিঃসংযোগ। অন্তঃসংযোগ পেরিয়ে অন্তঃগ্রহ সূর্যের পশ্চিমে চলে যায় ও ক্রমশ পশ্চিমে সরতে থাকে। কতখানি সরছে তার মাপ পাওয়া যায় সূর্য থেকে গ্রহ পর্যন্ত একটি দাগ টেনে আর অন্তঃগ্রহ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত একটি দাগ টেনে যে কোণটি পাওয়া যায় সেই কোণের মাপ থেকে। এমনিভাবে অন্তঃগ্রহের সবচেয়ে পশ্চিমে থাকার অবস্থানের কোণটির নাম পশ্চিম প্রতান। অনুরূপভাবে বহিঃসংযোগ পার হবার পরে সবচেয়ে পুবে থাকার অবস্থানের কোণটি হচ্ছে পূর্ব প্রতান।

অবস্থা পার হবার পরে অন্তঃগ্রহ যখন সূর্যের পশ্চিমে চলে যায় ও পুব আকাশে দেখা দেয় তখন তার ফালি চেহারা। এই সময়ে গ্রহটি

কিন্তু সূর্য থেকে ক্রমেই আরো পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। কতখানি সরছে তার একটি মাপ পাওয়া যায় সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত একটা দাগ টেনে আর গ্রহ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত একটা দাগ টেনে যে কোণটি পাওয়া যায় সেই কোণের মাপ থেকে। এই কৌণিক মাপে গ্রহ যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে পশ্চিমে (ছবিতে দেখানো হয়েছে), তাকে বলা হয় গ্রহের পশ্চিম প্রতান (Western Elongation)। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে গ্রহের তখন সিকি (quarter) চেহারা। তেমনি, বহিঃসংযোগ পেরিয়ে অন্তঃগ্রহ যখন সূর্যের পুবদিকে চলে ও পশ্চিম আকাশে দেখা যায়, তখনো কিন্তু একই ব্যাপার। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হয় পূর্ণিমার পুরো চাকতির মতো গ্রহ একটু একটু করে কমছে। কমতে কমতে যখন সিকি চেহারা তখন গ্রহের অবস্থান সূর্য থেকে সবচেয়ে পুবে (পূর্ব প্রতান)। শুক্রগ্রহের প্রতান কখনো ৪৮ ডিগ্রীর বেশি হয় না, বুধগ্রহের ২৮ ডিগ্রীর বেশি নয়।

অন্তঃগ্রহ যখন ভিতরের দিকের সংযোগ পার হয় তখন গ্রহটি থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে ধারণা হয় গ্রহটি সূর্যকে পার হচ্ছে হয় উত্তর দিয়ে কিংবা দক্ষিণ দিয়ে। কিন্তু কখনো কখনো সূর্যের ঠিক সামনে দিয়ে। সূর্যের উজ্জ্বল চাকতির গায়ে গ্রহটিকে তখন দেখায় কালো একটি বিন্দুর মতো। সূর্যের ওপর দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে এই কালো বিন্দুটি পার হয়ে যায়, বা বলা হয়ে থাকে সংক্রমণ (transit) করে। বুধগ্রহের সংক্রমণ ঘটে প্রতি একশো বছরে প্রায় তেরবার, শেষবার ঘটেছিল ১৯৭৩ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে। শুক্রগ্রহের সংক্রমণ আরো অনেক কম, আগামী সংক্রমণ হবার কথা ২০০৪ সালে।

তারার আকাশে

গ্রহের প্রতীয়মান চলা

গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘোরে পশ্চিম থেকে পুবে। এই ঘোরাটাকে তারাভরা আকাশের গায়ে আমরা একটা পুবমুখী চলা হিসেবে দেখতে

পাই। তারার আকাশে গ্রহের এই পুবমুখী চলাকে বলা হয় সম্মুখ গতি (direct motion)। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায়,
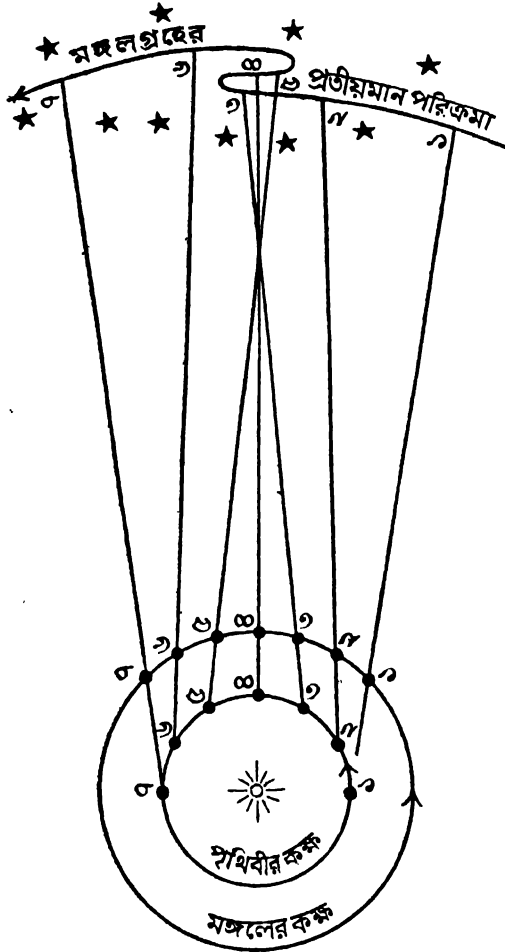
চিত্র ২৯। মঙ্গলগ্রহের প্রতীয়মান চলাফেরা। পৃথিবী ও মঙ্গলের সাতটি পারস্পরিক অবস্থান দেখানো হয়েছে আর দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটি অবস্থানে তারার আকাশে কোথায় আমরা মঙ্গলগ্রহকে দেখি। ৩নং অবস্থানের পরে মঙ্গলগ্রহের গতি উল্টো দিকে (প্রতীপ গতি), ৫নং অবস্থানের পরে পুনরায় সামনের দিকে (সম্মুখ গতি)

সামনের দিকে চলতে চলতে গ্রহ হঠাৎ থেমে গিয়েছে, তারপরে উল্টোদিকে বা পশ্চিমদিকে চলতে শুরু করেছে। গ্রহের এই পশ্চিম-

মুখী গতিকে বলা হয় প্রতীপ গতি (retrograde motion)। সঙ্গের ছবি দেখলে বোঝা যাবে, পৃথিবী থেকে তাকিয়ে কেন আমরা এমনটি দেখি। ছবিতে পৃথিবী ও মঙ্গলের সাতটি পারস্পরিক অবস্থান দেখানো হয়েছে, আর দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটি অবস্থানে তারার আকাশে কোথায় আমরা মঙ্গলগ্রহকে দেখি। দেখা যাচ্ছে, ৩নং অবস্থানের পরে মঙ্গলগ্রহের গতি উল্‌টোদিকে (প্রতীপ গতি), ৫নং অবস্থানের পরে পুনরায় সামনের দিকে (সম্মুখ গতি)। গ্রহের এই উল্‌টো দিকে চলার ব্যাপারটা আগেকার কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একেবারেই বুঝতে পারতেন না। গ্রহগুলির এই উল্‌টোপাল্‌টা গতির জন্যই তাদের নাম দিয়েছিলেন প্ল্যানেট বা ভবঘুরে। গ্রহের এই উল্‌টোপাল্‌টা চলাকে ব্যাখ্যা করার জন্য টলেমিকে বৃত্তের ওপরে বৃত্ত (পরিবৃত্ত) বসাতে হয়েছিল।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরু

কথাটা আরেকবার বলে নেওয়া যেতে পারে। টলেমির বিশ্ব-কল্পনা ছিল এই রকম : প্রত্যেকটি গ্রহ একটি বৃত্তের পরিধিতে সমান বেগে ঘুরছে (পরিবৃত্ত বা Epicycle)। এই বৃত্তের কেন্দ্রটি ঘুরছে অপর একটি বৃত্তের পরিধিতে। শেষোক্ত বৃত্তের নাম ডেফারেণ্ট (Deferent)। পৃথিবী স্থির এবং তার অবস্থান এই ডেফারেণ্টের কেন্দ্রে বা বিশ্বের কেন্দ্রে। গোড়ার দিকে মাত্র পাঁচটি গ্রহের নাম করা হত—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। কোনো গ্রহের গতি যদি একটি পরিবৃত্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা না যেত তাহলে পরিবৃত্তের সংখ্যা বাড়ানো হত।

প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে টলেমির এই বিশ্বকল্পনা বিনা প্রতিবাদে গ্রাহ্য ছিল। প্রতিবাদ না হোক, প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন নিকোলাস কোপারনিকাস। তাঁর কল্পনায় সূর্য ছিল বিশ্বের কেন্দ্রে আর পৃথিবী সমেত গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণ্যমান। কিন্তু গ্রহের উল্‌টোপাল্‌টা গতি ব্যাখ্যা করার জন্য তিনিও নির্ভর

করেছিলেন পরিবৃত্তের ওপরে। তবুও কোপারনিকাস ছিলেন সাবেকী চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা। কোপারনিকাস থেকেই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরু।

টাইকো ব্রাহে ছিলেন অতিমাত্রায় নির্ভুল পর্যবেক্ষক। মারা যাবার সময়ে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ সমস্ত তথ্য তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন কেপ্‌লারের হাতে। প্রধানত এই তথ্য বিশ্লেষণ করেই কেপ্‌লার প্রণয়ন করেন গ্রহের গতি সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত সূত্র। পরিবৃত্তকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেন তিনি এবং সিদ্ধান্ত করলেন যে সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলো ঘোরে বৃত্তে নয়, উপবৃত্তে।

কেপ্‌লারের সূত্র তিনটি। সেগুলো এইভাবে বলা চলে।

(১) প্রত্যেক গ্রহ সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘোরে এবং সূর্য থাকে এই উপবৃত্তের একটি ফোকসে।

(২) প্রত্যেক গ্রহ সূর্যের চারদিকে এমনভাবে ঘোরে যে সেই গ্রহ ও সূর্যের যোগরেখা (অর্থাৎ গ্রহ ও সূর্যকে যুক্ত করার জন্য টানা সরলরেখা) সমান সময়ের মধ্যে সমান আয়তন পার হয়।

(৪) সূর্যের চারদিকে সম্পূর্ণ একবার ঘুরে আসতে প্রত্যেক গ্রহের যে সময় লাগে তার বর্গ, সূর্য থেকে সেই গ্রহ গড়ে যতোটা দূরে থাকে তার ঘন—এই দুয়ের মধ্যে একটা আনুপাতিক সম্পর্ক আছে।

প্রথম সূত্রটি থেকে বোঝা যায় যে সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব সারা বছর সমান থাকে না। কোনো সময়ে গ্রহটি সূর্যের খুব কাছে আসে, কোনো সময়ে খুব দূরে চলে যায়। গ্রহটি যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে—গ্রহের সেই অবস্থানের নাম অনুসূর (Perihelion); গ্রহটি যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে—গ্রহের সেই অবস্থানের নাম অপসূর (Aphelion)।

দ্বিতীয় সূত্র থেকে বোঝা যায় যে সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহটির বেগও কমে-বাড়ে—নইলে গ্রহটির পক্ষে সমান সমান সময়ের মধ্যে সমান সমান ক্ষেত্রফল পেরিয়ে যাওয়া

কিছুতেই সম্ভব নয়। এ-ব্যাপারটা সাধারণ বুদ্ধি থেকেও বুঝে নেওয়া চলে। গ্রহ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে—গ্রহের ওপর সূর্যের টানও তখন সবচেয়ে বেশি। সুতরাং গ্রহের বেগও যদি তখন সবচেয়ে বেশি না হয় তাহলে সূর্য অনায়াসে টান মেরে গ্রহটিকে কক্ষ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে। কিন্তু আমরা চোখের ওপরেই দেখছি, সূর্য তা পারে না। কারণ, সূর্যের টান বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহের ছুটও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। এজন্য দেখা যায়, সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধের ছুটের পরিধি যদিও খুবই ছোট—কিন্তু ছুট দেয় সবচেয়ে বেগে। আর সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো—তার ছুটের পরিধিও যেমন সবচেয়ে বড়ো, ছুটও তেমনি ধীরে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গ্রহের ছুট কতখানি বেগে হবে তা নির্ভর করে গ্রহটি সূর্য থেকে কতটা দূরে আছে তার ওপরে। বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে—বুধের ছুট সবচেয়ে বেগে। প্লুটো সূর্যের সবচেয়ে দূরে—
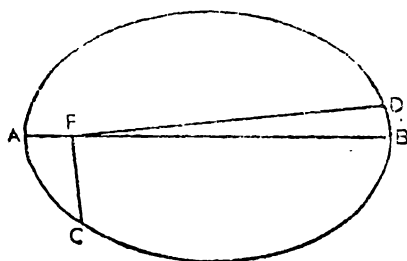
চিত্র ৩০। সূর্য রয়েছে F বিন্দুতে। কোনো গ্রহ যখন অনুসূরে অবস্থান করে, অর্থাৎ A বিন্দুতে থাকে—তখন তার সবচেয়ে বেশি বেগ; যখন অপসূরে অবস্থান করে, অর্থাৎ B বিন্দুতে থাকে—তখন তার সবচেয়ে কম বেগ। AC দূরত্ব পার হতে গ্রহটির যে সময় লাগে, ঠিক সেই একই সময় লাগে BD পার হতে।

প্লুটোর ছুট সবচেয়ে আস্তে। আর এই বুধ ও প্লুটোর মাঝখানে আরো সাতটি গ্রহ আছে। এই সাতটি গ্রহের সাতটি কক্ষে ছুটের বেগ ক্রমেই বেশি থেকে কমের দিকে। অনেক সময়ে গ্রহমণ্ডলের পাক খাওয়ার সঙ্গে চাকার পাক খাওয়ার তুলনা করা হয়। কিন্তু এ-দুয়ের

মধ্যে মস্ত একটা তফাত আছে। একটি চাকা যখন ঘুরতে শুরু করে তখন দেখা যায় চাকার পরিধির কোনো বিন্দু ঘোরে সবচেয়ে বেশি বেগে, আর যতোই চাকার কেন্দ্রের দিকে আসা যায় ততোই ঘোরার বেগ কমে। কিন্তু গ্রহমণ্ডলকে যদি বিরাট একটি চাকা হিসেবে কল্পনা করা যায় তাহলে এখানে কিন্তু ঘোরার নিয়মটা একেবারে উল্‌টো। পরিধির দিকে পাল্লাও যেমন দূর, ছুটও তেমনি আস্তে; কেন্দ্রের দিকে পাল্লা কমে, ছুট বাড়ে। এই ব্যাপারটাই সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে কেপ্‌লারের তৃতীয় নিয়মে।*

কেপ্‌লারের সূত্রগুলো বিশেষ করে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের সূর্য ও গ্রহের বেলাতেই খাটে। পরে নিউটন যখন মহাকর্ষের সূত্র আবিষ্কার করলেন, একমাত্র তখনই এই মহাবিশ্বের গতিবিধির সাধারণ নিয়মটির সন্ধান পাওয়া গেল। নিউটনের মহাকর্ষের সূত্রটি সহজ ভাষায় এইভাবে বলা চলে: মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু অন্য প্রত্যেকটি বস্তুকে আকর্ষণ করে; কতখানি জোরে আকর্ষণ করে তা নির্ভর করে বস্তুদুটির ভরের গুণফলকে বস্তুদুটির দূরত্বের বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তারই ওপর।

যেমন, সূর্য এই পৃথিবীকে টানছে, আবার পৃথিবীও সূর্যকে টানছে। কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের ভর অনেক বেশি—কাজেই সূর্যের টানও বেশি। এত বেশি যে টানাটানির ভারকেন্দ্রটা সূর্যের এলাকায় পড়ে। এখন, কোনো কারণে সূর্য থেকে পৃথিবী যদি দু-গুণ দূরে সরে আসে, তাহলে সূর্য ও পৃথিবীর টানাটানির জোরটাও চারভাগের একভাগ হয়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর কক্ষ-আবর্তন (বা চক্রবেগ) কমে যাবে সেই অনুপাতে। সূর্য থেকে কোনো গ্রহের দূরত্ব

---

* বীজগণিতের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করলে কেপলারের তৃতীয় সূত্রটির চেহারা যা দাঁড়ায় তা এই:

$$\frac{a_1^3}{p_1^2} = \frac{a_2^3}{p_2^2} = \frac{a_3^3}{p_3^2}$$

a_1, a_2, a_3 হচ্ছে এক-একটি গ্রহের সূর্য থেকে মোটামুটি দূরত্ব এবং p_1, p_2, p_3 হচ্ছে সেই-সেই বিশেষ গ্রহের কক্ষ-পরিক্রমার সময়।

যদি হয় ৫,৭৯,০০,০০০ কিলোমিটার তাহলে সেই গ্রহের চক্রবেগ হবে সেকেণ্ডে ৪৭'৮ কিলোমিটার, দূরত্ব যদি হয় ১০,৮৩,০০,০০০ কিলোমিটার তাহলে চক্রবেগ সেকেণ্ডে ৩৫'০ কিলোমিটার, দূরত্ব যদি হয় ১৪,৯৭,০০,০০০ কিলোমিটার তাহলে চক্রবেগ সেকেণ্ডে ১৮'৫ কিলোমিটার। এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে বুধ, শুক্র ও পৃথিবীর দূরত্ব ও চক্রবেগের হিসেব। এই বইয়ের শেষদিকে ছক কেটে সূর্য থেকে প্রত্যেকটি গ্রহের দূরত্ব ও চক্রবেগ দেওয়া আছে।

কেপ্‌লারের পরে গ্যালিলিও। যে কথা আগে বলেছি, প্রথম দূরবীন তৈরি ও ব্যবহার করেছিলেন গ্যালিলিও। এবং সেই দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে আকাশের রাজ্যে এমন সব আবিষ্কার করেছিলেন যা কোপারনিকাসের বিশ্বতত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

তারপরে নিউটন। তিনিই প্রথম উপস্থিত করলেন বিশ্বময় ক্রিয়াশীল শক্তি সম্পর্কিত একটি ধারণা। কেপ্‌লারের সূত্রে গ্রহের গতির একটা জ্যামিতিক ছবি পাওয়া গিয়েছিল। গ্যালিলিওর গবেষণায় ছিল বস্তুর গতি সম্পর্কে ধারণা। কিন্তু নিউটনই প্রথম শক্তির সর্বময় রূপটির সন্ধান দিলেন। চন্দ্রের গতি পর্যালোচনা করে মহাকর্ষের শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দ্য প্রিন্‌সিপিয়া' গ্রন্থে উপস্থিত করলেন বস্তুর গতি (গতিবিজ্ঞান) সম্পর্কিত তাঁর বিরাট কাজ। কেপ্‌লারের সূত্র প্রমাণ করলেন এবং কেপ্‌লারেব সূত্রে যা ছিল জ্যামিতিক বর্ণনা তাকে দাঁড় করালেন বস্তুজগতের সাধারণ একটি নিয়মের মধ্যে। নিয়মটি এই : বিশ্বের যে কোনো দুই বস্তুর মধ্যেকার শক্তির সঙ্গে সরাসরি আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে সেই দুই বস্তুর ভরের গুণফলের সঙ্গে এবং বিপরীত আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে সেই দুই বস্তুর মধ্যে-কার দূরত্বের বর্গের সঙ্গে। ব্যাখ্যা করতে হলে এইভাবে বলা চলে ; বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু অন্য প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে, বস্তু যতো বড়ো আকর্ষণের শক্তি ততো অধিক, দুই বস্তু পরস্পর থেকে যতো দূরে আকর্ষণের শক্তি ততো কম। নিউটনের এই নিয়মের মধ্যে বিশ্ব-

জগতের তাবৎ ব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে। এমনকি পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত কোনো বস্তু আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে, না, পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে ঘুরতে থাকবে, না, মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে, তাও ঠিক হয় এই নিয়ম দিয়েই। বিষয়টি নিয়ে পরে আবার আমরা আলোচনা তুলব।

গ্রহমণ্ডল

সূর্যের চারদিকে যে নয়টি গ্রহ ঘুরছে তাদের স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ভূ-সদৃশ ও মহাকায়। প্রথম ভাগে বুধ শুক্র পৃথিবী ও মঙ্গল, দ্বিতীয় ভাগে বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন ও প্লুটো। ভূ-সদৃশ গ্রহগুলো রয়েছে সূর্যের সবচেয়ে কাছে। তারা আকারে ছোট, তাদের উপরিতলের চেহারায় নানা বিভিন্নতা, তাদের অভ্যন্তর কঠিন। মহাকায় গ্রহগুলো আকারে অতি বৃহৎ, তারা কক্ষের চারদিকে অতি দ্রুত পাক খায়, তাদের আছে ঘন ভারী বায়ুমণ্ডল (যার প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়া)। সবচেয়ে বাইরের গ্রহ প্লুটো সম্পর্কে অল্পই জানা গিয়েছে, এই গ্রহটি কোন দলে পড়ে বলা শক্ত।

বুধ

এই গ্রহটি সূর্যের এত কাছে ও আকারে এত ছোট যে দূরবীন দিয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধে নেই। পর্যবেক্ষণ করতে হয় খটখটে দিনের আলোয় কিংবা সূর্যোদয়ের সামান্য আগে বা সূর্যাস্তের সামান্য পরে দিগন্তের কাছাকাছি থাকা অবস্থায়।

বুধগ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘোরে সেকেণ্ডে প্রায় ৪৮ কিলোমিটারের গড় বেগে। অন্য কোনো গ্রহ এত বেগে ঘোরে না। আর এই গ্রহের কক্ষটি খুবই উৎকেন্দ্রিক (মাত্রায় ২·২০৬), প্লুটোর কক্ষের পরেই (প্লুটোর কক্ষের উৎকেন্দ্রিকতা ০·২৪৮)। অর্থাৎ, বুধগ্রহের কক্ষ খুবই চ্যাপ্‌টা ধরনের উপবৃত্ত। ফলে সূর্য থেকে বুধের দূরত্বে

যথেষ্ট কম-বেশি ঘটে। অনুস্সূরে বা সবচেয়ে কাছে থাকার সময়ে গ্রহটি থাকে সূর্য থেকে ৪·৬০ কোটি কিলোমিটার দূরে, অপস্সূরে বা সবচেয়ে দূরে থাকার সময়ে ৬·৯৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। কেপ্‌লারের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি, সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব যখন কম গ্রহের বেগ তখন বেশি, সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব যখন বেশি গ্রহের বেগ তখন কম। তার মানে, সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে বুধের বেগ যথেষ্ট বাড়ে-কমে।

সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে একবার ঘুরতে বুধের সময় লাগে ৮৮ দিন (নাক্ষত্র কাল)। প্রতি ১১৬ দিন পরে পরে বুধ পৃথিবীকে অতিক্রম করে (যুতিকাল)। ভিতরের দিকের সংযোগের সময় পৃথিবী থেকে বুধের দূরত্ব সবচেয়ে কম (৭·৭ কোটি কিলোমিটার), বাইরের দিকের সংযোগের সময়ে সবচেয়ে বেশি (২২·২ কোটি কিলোমিটার)।

বুধের কক্ষ ও পৃথিবীর কক্ষ এক সমতলে নয়, সাত ডিগ্রী কোনাকুনি। ফলে ভিতরের দিকের সংযোগের সময়ে বুধ সাধারণত সূর্যের উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিয়ে পার হয়ে যায়, সংক্রমণ (সূর্যের চাকতির ওপর দিয়ে কালো একটি বিন্দুর মতো বুধগ্রহের পার হয়ে যাওয়া) ঘটে না। তবে বুধের কক্ষ দুটি বিন্দুতে পৃথিবীর কক্ষতলকে ছেদ করে, ভিতরের দিকের সংযোগ ঘটার সময়ে এই দুটি বিন্দুর কোনো একটিতে যদি বুধ থাকে তবে সংক্রমণ হয়ে থাকে। এই দুটি বিন্দুতে বুধ থাকে ৭ই মে ও ৯ই নভেম্বর তারিখে। অতএব বুধের সংক্রমণ এই দুটি তারিখের কাছাকাছি সময়েই হবার কথা। সাধারণত হয়ে থাকে সাত বা তের বছর পরে পরে। সংক্রমণ হবার আগামী কয়েকটি তারিখ : ১৩ নভেম্বর

বুধের মাপজোকের সঙ্গে মিল বেশি পৃথিবীর নয়, চাঁদের। বুধের ব্যাস ৪৮৮০ কিলোমিটার, চাঁদের ব্যাস ৩৪৭৬ কিলোমিটার। অর্থাৎ বুধের ব্যাস চাঁদের ব্যাসের দেড়গুণেরও কম। চাঁদ থেকে সূর্যের

আলো প্রতিফলিত হয় ৭ শতাংশ, বুধ থেকে হয়ে থাকে ৬ শতাংশেরও কম। এত কম মাত্রার প্রতিফলন অন্য কোনো গ্রহের নয়।

বুধের গায়ে আবছা ছোপ ছোপ দেখতে পাওয়া যায়। অনেকটা চাঁদের সাগর অঞ্চলের মতো। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গ্রহ অনু-সন্ধানী মেরিনার-১০ (১৯৭৩ সালের নভেম্বরে উৎক্ষিপ্ত) খুব কাছের থেকে বুধগ্রহের খবর নিয়েছে। এই খবর থেকে জানা যায়, বুধগ্রহে রয়েছে বহু গহ্বর, লম্বা ও খাড়া পাহাড় এবং বিশাল সমতল ভূমি। বায়ুমণ্ডল আছে, এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু চুম্বকত্ব যে আছে তা নিঃসন্দেহে জানা গিয়েছে। বুধগ্রহের চুম্বকত্ব থাকাটা অস্বাভাবিক। চাঁদের চুম্বকত্ব নেই, ভূ-সদৃশ গ্রহগুলির মধ্যে শুক্র-গ্রহের চুম্বকত্ব পৃথিবীর ত্রিশভাগের এক ভাগ, মঙ্গলের চুম্বকত্ব না-থাকার মতো। পৃথিবীর যে চুম্বকত্ব আছে তার কারণ সঠিকভাবে জানা যায়নি। সাধারণত মনে করা হয়, ভূ-গোলকের কেন্দ্রীয় এলাকায় বা 'কোর' (core)-এ লোহা ইত্যাদি ধাতু গলিত অবস্থায় থাকার দরুন এই চুম্বকত্বের উৎপত্তি। এ থেকে সাধারণত ধরে নেওয়া হয়, যে-গ্রহের চুম্বকত্ব নেই তার অভ্যন্তরে গলিত ধাতুর কোর নেই।

বহুকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল বুধ যতোদিনে সূর্যের চারদিকে একবার ঘোরে ঠিক ততোদিনেই নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খায় —অর্থাৎ, বুধের একটা দিক সবসময়েই সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে। পৃথিবীর কাছাকাছি থাকার জন্য চাঁদের যে অবস্থা হয়েছে, সূর্যের কাছাকাছি থাকার জন্য বুধেরও সেই অবস্থা হতে পারে। কিন্তু অতি সম্প্রতিকালে জানা গিয়েছে বুধের অবস্থা সূর্যের দিকে অমন একদিক-ফেরানো নয়। নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে বুধের সময় লাগে ৫৯ দিন—অর্থাৎ, কক্ষের চারদিকে ঘুরতে যতো সময় লাগে তার ঠিক তিনভাগের দু-ভাগ। কেপ্‌লারের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে বিজ্ঞানীরা অঙ্কের হিসেব করে দেখিয়েছেন বুধগ্রহের বেলায় এমনটিই হওয়া উচিত।

তাহলে বুধ সম্পর্কে বিশেষভাবে জেনে নেবার মতো খবর হচ্ছে

এই : বুধ সূর্যের চারদিকে ঘোরে ৮৮ দিনে, নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খায় ৫৯ দিনে, বুধের কক্ষ অতিমাত্রায় চ্যাপ্টা (অঙ্কের ভাষায় উৎকেন্দ্রিক)। এই খবরগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে বুধের আকাশে সূর্যের চলাফেরা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা চলে। বুধ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে.(অর্থাৎ কক্ষপথে বুধের ছুটের বেগ সবচেয়ে বেশি) তখন বুধের কোনো কোনো জায়গা থেকে মনে হবে সূর্য চলেছে পশ্চিম থেকে পুবে। সেখানে সূর্য থাকবে উদয় বা অস্ত হবার মুখে। সূর্যকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য দেখা যাবে দিগন্তের ওপরে, যেখান থেকে উঠেছিল সেখানেই অস্ত যাবে, আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠবে, বুধের হিসেবে প্রায় একবছর আকাশেই থাকবে, দু-বার উদয় হওয়ার মতো দু-বার অস্ত যাবে।

বুধগ্রহের উপরিতলে দিনের উত্তাপ খুবই বেশি, ৪০০ ডিগ্রী সেন্টি-গ্রেড হওয়াটাও অসম্ভব নয়। এই উত্তাপে টিন ও সীসে পর্যন্ত গলে যায়। বুধগ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ বেগ সেকেণ্ডে মাত্র ৪·২ কিলোমিটার। কাজেই হাল্কা কোনো গ্যাস বুধের আকর্ষণে আটক পড়তে পারে না। ভারী কিছু গ্যাস থাকতেও পারে। অতএব বুধের বায়ুমণ্ডল বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা এই ভারী গ্যাসের খুবই পাতলা একটি আবরণ। এতই পাতলা যে মেরিনারের সূক্ষ্ম যন্ত্রেও ধরা পড়ে না।

চেহারার দিক থেকে বুধের সঙ্গে চাঁদের অনেক মিল আছে বটে কিন্তু একটি বিষয়ে বড়ো রকমের অমিল। বুধের গড় ঘনত্ব ৫·৫ (জলের ঘনত্বকে ১·০ ধরে), আর চাঁদের গড় ঘনত্ব মাত্র ৩·৩ (পৃথিবীর গড় ঘনত্ব ৫·৫)। এই তথ্য থেকে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তির একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

শুক্র

সূর্য থেকে প্রথম গ্রহ বুধ, দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র। বুধ সম্পর্কে বলা চলে, পৃথিবীতে এমন মানুষ অনেক আছেন যাঁরা সারা জীবনে একবারও

এই গ্রহটি দেখতে পান না। কিন্তু ভোরের আকাশে বা সন্ধ্যার আকাশে শুক্রগ্রহ দেখেন নি এমন মানুষ সম্ভবত পৃথিবীতে একজনও নেই। সূর্য ও চন্দ্রকে বাদ দিলে শুক্র আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক (প্রভার মাত্রা—৪.৪)। শুক্র যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল তখন শুক্রের আলোয় সাদা দেওয়ালের গায়ে গাছের ছায়া পর্যন্ত দেখা যেতে পারে (এমন দৃশ্য গ্রামের দিকের অন্ধকারেই কেবল সম্ভব)। এমনকি পুরো দিনের আলোতেও সবচেয়ে উজ্জ্বল অবস্থার শুক্রগ্রহকে খালিচোখে দেখা যায় (যদি অবশ্য জানা থাকে আকাশের ঠিক কোথায় তাকাতে হবে)। দিনের বেলা 'উড়ন্ত চাকি' দেখতে পাওয়ার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়—আসলে দেখা গিয়েছে পরিষ্কার নীল আকাশে চকচকে রুপোলী চাকতির মতো শুক্রগ্রহ।

শুক্রের কক্ষ প্রায় বৃত্তাকার। সূর্য থেকে শুক্রের দূরত্ব মোটামুটি ১০ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার এবং সূর্যের চারদিকে গ্রহটির ঘোরার গড় বেগ সেকেণ্ডে ৩৫ কিলোমিটার। কক্ষটি প্রায় বৃত্তাকার বলে এসব মাত্রায় বিশেষ হেরফের ঘটে না।

সূর্যের চারদিকে সম্পূর্ণ একবার ঘুরতে শুক্রের সময় লাগে পৃথিবীর দিনের হিসেবে ২২৫ দিন। আর শুক্র পৃথিবীকে অতিক্রম করে বা পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের অন্তঃসংযোগ ঘটে প্রতি ৫৮৪ দিন পরে পরে (যুতিকাল)। অন্তঃসংযোগ ঘটার সময়ে শুক্র চলে আসে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, ৪.২ কোটি কিলোমিটারের মধ্যে। চন্দ্রকে বাদ দিলে শুক্র হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের জ্যোতিষ্ক। আবার বহিঃসংযোগ ঘটার সময়ে (যখন সূর্য থাকে পৃথিবী ও শুক্রের মাঝখানে) পৃথিবী থেকে শুক্রের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি, ২৫.৮ কোটি কিলোমিটার।

দূরত্ব এতটা বাড়ে-কমে বলেই দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে গ্রহের চাকতির ব্যাস কখনো দেখায় ছোট, কখনো বড়ো। বহিঃসংযোগ ঘটার সময়ে ছোট, অন্তঃসংযোগ ঘটার সময়ে বড়ো। যতোটা ছোট তার চেয়ে প্রায় আটগুণ বড়ো।

চাঁদের মতো শুক্রেরও কলা আছে তা প্রথম দেখেছিলেন গ্যালিলিও। শুক্রগ্রহ যখন অন্তঃসংযোগের অবস্থায় তখন শুক্রের অন্ধকার দিক পৃথিবীর দিকে, অর্থাৎ চাঁদের বেলায় আমরা যাকে বলি অমাবস্যা শুক্রের বেলাতেও তাই। তারপরে শুক্র একটু একটু করে সরে আর একটু একটু করে প্রকাশ পায়। তেমনি প্রথমে কাস্তের মতো ফালি, বড়ো হতে হতে আধখানা, বড়ো হতে হতে বহিঃ-সংযোগের অবস্থায় পুরোটা (অর্থাৎ চাঁদের বেলায় যে-অবস্থাকে বলা হয় পূর্ণিমা, তাই)। তবে শুক্রের চাকতির পুরোটা যখন প্রকাশ পাচ্ছে তখন কিন্তু শুক্র পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে। পৃথিবীর কাছে শুক্র সবচেয়ে উজ্জ্বল হয় ফালি অবস্থায়, তখন তার প্রভার মাত্রা —৪'৪। শুক্র তখন আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের চেয়েও বারোগুণ বেশি উজ্জ্বল। শুক্র যখন সবচেয়ে অনুজ্জ্বল তখনো তার প্রভাব মাত্রা —৩'৩, তখনো লুব্ধকের চেয়ে চারগুণ বেশি উজ্জ্বল। সূর্য এবং চন্দ্রের পরেই চোখে পড়ার মতো জ্যোতিষ্ক হচ্ছে শুক্র —সব সময়েই।

শুক্রকে বলা হয় পৃথিবীর যমজ—কেননা বিষুববৃত্তে শুক্রগ্রহের ব্যাস ১২,৩০০ কিলোমিটার আর পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৫৭ কিলো-মিটার। অর্থাৎ, এই দুটি গ্রহের আকার প্রায় সমান। মিল শুধু আকারে নয়—ভরেও, মহ কর্ষেও। কিন্তু প্রকাণ্ড অমিল বায়ুমণ্ডলে। শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর মতো আদৌ নয়। শুক্রগ্রহ ঘিরে রয়েছে ঘন একটি মেঘের আবরণ। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে যা দেখা যায় তা হচ্ছে এই ঘন মেঘের বাইরে থেকে ঠিকরে আসা সূর্যের আলো। এই মেঘ একেবারে নিশ্ছিদ্র, অনেক পর্যবেক্ষণ চালিয়েও কোথাও একটু ফাঁক পাওয়া যায়নি যার মধ্যে দিয়ে ভিতরের দিকে দৃষ্টি চালানো যেতে পারে।

অক্ষ-আবর্তন

শুক্রগ্রহ রয়েছে ঘন মেঘের আড়ালে, তাই দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে

গ্রহের উপরিতলকে কোনোক্রমেই দেখা সম্ভব নয়। এমনকি সেই মেঘও সবদিক থেকে একই রকম, কোথাও আলাদা করে কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না।

আলাদা করে কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না বলেই সরাসরি চোখের দেখা দেখে বা ফটো তুলে কিছুতেই ঠিক করা যায় না গ্রহটি কতখানি সময় নিয়ে নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খাচ্ছে।

এই অবস্থায় শুক্র যে কতখানি সময় নিয়ে নিজের অক্ষের চার-দিকে একবার পাক খায় তা নিয়ে নানা মত প্রচলিত ছিল, নিশ্চিত-ভাবে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়েছে একেবারে সম্প্রতিকালে রেডার পদ্ধতির সাহায্যে।
পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের অন্তঃসংযোগ ঘটার সময়ে নানাভাবে যাচাই করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন রেডার পদ্ধতিতে নির্ণীত মাপটি নির্ভুল।

এখন নিশ্চিতভাবে বলা চলে, শুক্রগ্রহ নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে সময় নেয়, পৃথিবীর দিনের হিসেবে, ২৪৩ দিন। এই হচ্ছে শুক্রের অক্ষ-আবর্তনের কাল। এবং শুক্রগ্রহের পাক খাওয়া অন্য সব গ্রহের মতো পশ্চিম থেকে পুবে নয়—উল্‌টোদিকে, পুব থেকে পশ্চিমে।

উপরিতল

দূরবীন যতো শক্তিশালী হোক, তার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে শুক্রের উপরিতল সম্পর্কে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও শুক্রের উপরিতল সম্পর্কে নানা মতের ও নানা তথ্যের অভাব হয়নি। কেউ কেউ শুক্রের উপরিতলের মানচিত্র পর্যন্ত উপস্থিত করেছিলেন। সেই মানচিত্রে ছিল মহাদেশ, মহাসাগর, সাগর, উপসাগর প্রভৃতি। অনেকটা পৃথিবীর উপরিতলের মতোই যেন। কেউ কেউ বলেছিলেন, শুক্রগ্রহের উপরিতল শুকনো খটখটে এবং প্রচণ্ড রকমের উত্তপ্ত। কারও ধারণা হয়েছিল, শুক্রগ্রহের উপরিতলের বেশির ভাগটাই জলে

ঢাকা এবং সেই জলে প্রাথমিক ধরনের জীবন থাকাটাও অসম্ভব নয়। শুক্রগ্রহ সম্পর্কে এমনি আরো নানা কথা নানা বিজ্ঞানীর মুখে শোনা গিয়েছিল। শুক্রকে সঠিকভাবেই বলা হত "রহস্যময় গ্রহ"।

তাই মহাকাশে অনুসন্ধানী রকেট পাঠানো শুরু হতে অনেকখানি মনোযোগ গিয়ে পড়ে শুক্রগ্রহের ওপরে।

শুক্রগ্রহে অনুসন্ধানী ব্যোমযান

অনুসন্ধানী ব্যোমযান পাঠিয়ে শুক্রগ্রহের পর্যবেক্ষণ চালানোর ব্যাপারে প্রথম বড়োরকমের ঘটনা ঘটে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে। ২৬শে আগস্ট তারিখে উৎক্ষিপ্ত আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মেরিনার-২ ওই দিন শুক্রের ৩৪,৮০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে গ্রহটির পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবং ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ কিলো-মিটার দূরের পৃথিবীতে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে কিছু নতুন খবর পাঠায়। একটি খবর এই যে শুক্রের চুম্বকত্ব পৃথিবীর চুম্বকত্বের ত্রিশভাগের একভাগ এবং পৃথিবীর ভ্যান অ্যালেন বলয়ের মতো কোনো বলয়ের অস্তিত্ব শুক্রে নেই। আরো বড়ো খবর, শুক্রগ্রহের উপরিতল খুবই উত্তপ্ত এবং শুক্রগ্রহের মেঘের আবরণ নিশ্ছিদ্র।

মেরিনার-২ অনুসন্ধানী ব্যোমযানের পরে একই উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি ব্যোমযান শুক্রগ্রহে পাঠানো হয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রথম চেষ্টা করেন মাপজোক নেবার যন্ত্রপাতি সমেত একটি আধার শুক্রগ্রহে নামাতে। গ্রহ-অনুসন্ধানী ভেনাস-৪ (রুশভাষায় ভেনেরা-৪, ১২ই জুন তারিখে উৎক্ষিপ্ত) শুক্রগ্রহে পৌঁছয় ১৮ই অক্টোবর তারিখে এবং যন্ত্রপাতি সমেত একটি আধার প্যারাসুটের সাহায্যে শুক্রগ্রহের উপরিতলে ধীরে অবতরণের জন্য নামিয়ে দেয়। শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে ভাসতে ভাসতে আধারটি নিচে নামে এবং শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের গড়ন চাপ উত্তাপ ইত্যাদি সম্পর্কে খবর পাঠায়। সম্ভবত আধারটি খুব বেশি দূর নামতে পারেনি, যতোই নিচে নেমেছে ততোই শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের চাপ

বেড়েছে এবং শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে ডিমের খোলার মতো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। যতোদূর পর্যন্ত খবর ধরা গিয়েছিল তা থেকে জানা যায়—শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, সর্বোচ্চ চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ১৮ গুণ, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের ৯০ শতাংশই কার্বন ডাই-অক্সাইড।

ভেনাস-৪ ব্যোমযানের ৩৪ ঘণ্টা পরে শুক্রগ্রহের এলাকায় হাজির হয়েছিল আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মেরিনার-৫। তা থেকে যন্ত্রপাতি সমেত কোনো আধার নিচে নামানো হয়নি, শুক্রগ্রহের ৪০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে মেরিনার-৫ থেকে নানারকম মাপজোক নেওয়া হয়। জানা যায়—শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৭২ থেকে ৮৭ শতাংশ, অক্সিজেন নেই, হাইড্রোজেন আছে, গ্রহের সূর্যালোকিত দিকে আয়নোস্ফিয়ার আছে এমন লক্ষণ বর্তমান। মেরিনার-৫ থেকে পাওয়া খবরে আরো জানা যায়, শুক্রগ্রহের চুম্বকত্ব পৃথিবীর চুম্বকত্বের ৩০০ ভাগের ১ভাগ।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভেনাস-৫ (৫ জানুআরি ১৯৫৯ তারিখে উৎক্ষিপ্ত) ও ভেনাস-৬ (১০ জানুআরি তারিখে উৎক্ষিপ্ত) শুক্রগ্রহে পৌঁছয় যথাক্রমে ১৬ই ও ১৭ই মে তারিখে। এবারে এই দুটি ব্যোমযান থেকে যন্ত্রপাতি সমেত যে দুটি আধার শুক্রগ্রহের নামিয়ে দেওয়া হয় তা ছিল অনেক শক্তপোক্ত—অনেক বেশি চাপ ও উত্তাপ সহ্য করতে সক্ষম। বায়ুমণ্ডল দিয়ে নামার সময়ে এই দুটি আধারের যন্ত্রপাতির সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের চাপ ও উত্তাপের মাপ নেওয়া হয়। জানা যায়, শুক্রগ্রহের উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ৬০ থেকে ১৪০ গুণ এবং তাপমাত্রা ৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ৫৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। আরো জানা যায়, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে ৯৫ শতাংশ, নাইট্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস ৩ শতাংশ, অক্সিজেন

অনধিক ০'৫ শতাংশ, জলীয় বাষ্প অতি যৎসামান্য। এ থেকে ধরে নিতে হয়, শুক্রগ্রহের উপরিতলের অবস্থা অতিমাত্রায় শুষ্ক, তাপমাত্রা অতি উচ্চ। তার মানে, শুক্রেগ্রহের উপরিতলে প্রায় সব সময়েই প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভেনাস-৮ উৎক্ষিপ্ত হয় ২৭শে মার্চ তারিখে, শুক্রগ্রহে পৌঁছয় ২২শে জুলাই তারিখে। এই ব্যোমযানের সাহায্যেও গ্রহের ও বায়ুমণ্ডলের উপরিতলের মাপজোক নেওয়া হয়।

৬ই জুন তারিখে উৎক্ষিপ্ত হয় ভেনাস-৯ ও ১৬ই জুন তারিখে ভেনাস-১০। প্রথম ব্যোমযানটি ১৩৬ দিন পরে শুক্রগ্রহে পৌঁছয়, যন্ত্রপাতি সমেত একটি আধার শুক্রগ্রহের মাটিতে নামায়, এবং ২২শে অক্টোবর তারিখে শুক্রগ্রহের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে ওঠে। আধারের যন্ত্রপাতি শুক্রগ্রহের মাটিতে ৫৩ মিনিট সক্রিয় থাকে। এই পুরোটা সময় ধরে আধারের যন্ত্রপাতির নানা মাপজোকের খবর কক্ষ-পরিক্রমারত ব্যোমযানে পৌঁছয়, সেখান থেকে পাঠানো হয় পৃথিবীতে। এই মাপজোকের মধ্যে ছিল শুক্র গ্রহের উপরিতলের আলোকচিত্র। জানা যায়, ঘন মেঘে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও শুক্রগ্রহের উপরিতলে আলোকচিত্র নেবার মতো যথেষ্ট আলো রয়েছে। আলোকচিত্রে দেখা যায় শুক্রগ্রহের উপরিতল ধারালো কিনারওলা পাথরে ঢাকা এবং পাথরগুলো অপেক্ষাকৃত নবীন। আরো জানা যায়, শুক্রগ্রহের উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর সমুদ্রতলে বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে ৯০ গুণ অধিক এবং তাপমাত্রা ৪৮৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৯০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট)।

অনুরূপভাবে ভেনাস-১০ শুক্রগ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহ হয় ২৫শে অক্টোবর তারিখে এবং এই ব্যোমযান থেকে যন্ত্রপাতি সমেত একটি আধার শুক্রগ্রহের মাটিতে নামে। আধারটি ৬৫ মিনিট সক্রিয় থাকে এবং এই ৬৫ মিনিট ধরে নেওয়া মাপজোক অনুরূপভাবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। এবারের আলোকচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় টুকরো

টুকরো পাথর—অনেকটা ঠাণ্ডা হওয়া লাভার মতো বা ক্ষয় হওয়া শিলার মতো। জানা যায়, উপরিতলে চাপের মাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ৯২ গুণ, তাপমাত্রা ৪৬৫° সেন্টিগ্রেড (৮৬৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট), বায়ুর বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৩'৫ মিটার (ঘণ্টায় ১২'৫ কিলোমিটার)।

শুক্রগ্রহের জগৎ

এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবারে শুক্রগ্রহের জগৎটি কল্পনা করা যেতে পারে।

শুক্রগ্রহকে তুলনা করা চলে অতি-উত্তপ্ত এক হট্‌হাউসের সঙ্গে (পৃথিবীতে কোনো কোনো ফুল ফলের চাষে কাচের ছাদবিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হয়, যাতে ভিতরটা উষ্ণ থাকে—এটিকে বলা হয় হট্‌হাউস)। শুক্রগ্রহের উপরিতলে তাপমাত্রা প্রায় ৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ১০০ গুণ।

শুক্রগ্রহের জগৎটি আশ্চর্য। পৃথিবীর সময়ের হিসেবে প্রায় চারমাস ধরে চলে শুক্রগ্রহের একটি দিন ও একটি রাত। সূর্য ওঠে পশ্চিমে, অস্ত যায় পুবে। শুক্রগ্রহের ২৪৩ দিনের একটি বছরে (পৃথিবীর হিসেবে) সূর্য ওঠে দু-বার, অস্ত যায় দু-বার। শুক্রগ্রহে ঋতু নেই। এমনকি মধ্যাহ্নবেলাতেও উপরিতলের আলো পৃথিবীর ঊষাকালের মতো। তখনো কিন্তু সূর্য অদৃশ্য। দিনের বেলাতেও দেখতে পাওয়ার সীমানা বেশিদূর পর্যন্ত নয়।

শুক্রগ্রহের আকাশে রয়েছে অতিশয় ঘন মেঘ, খাড়াদিকে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়ানো। মেঘের তলার দিক মাটি থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার উঁচুতে।

কিন্তু মেঘের এলাকাটি ছেদহীন নয়, একটানা একরকমও নয়। শুক্রগ্রহের মেঘের এলাকা স্তরে স্তরে বিভক্ত—এক-একটি স্তর এক-একরকম পদার্থে তৈরী। আগে মনে করা হত শুক্রগ্রহের মেঘ পৃথিবীর মেঘের মতোই, তাতে আছে জল ও বরফের কণা। এখন

জানা গিয়েছে, মোটেই তা নয়। অন্ততপক্ষে, শুক্রগ্রহের মেঘের আবরণের যে বাইরের দিকটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় সেখানে আছে প্রধানত সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘন জলীয় দ্রবণ, তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক ও অন্যান্য অ্যাসিড।

উত্তাপ যদি অধিক হয় তাহলে গ্রহের অভ্যন্তর থেকে নানা পদার্থ ও তাদের যৌগ (compounds) গ্যাসীয় আকারে নিঃসরিত হতে পারে—যথা, সহজেই গলে যায় এমন সব ধাতু, ব্রোমিন, আয়োডিন ইত্যাদি। এই পদার্থগুলো বায়ুমণ্ডলে থেকে যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তর গড়ে তোলে। শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলেও তাই হয়েছে। শুক্র-গ্রহের অবস্থাটাই এমন যে তার বায়ুমণ্ডলে বহু রকমের পদার্থ জড়ো হয়ে চলবেই।

জানা গিয়েছে, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন স্তরের গ্যাস বিভিন্ন বেগে চলাচল করে। তলার দিকে এই বেগ খুবই কম, যতো ওপরে ওঠা যায় ততো বেশি। একেবারে ওপরে সেকেণ্ডে ১০০ মিটার পর্যন্ত —অর্থাৎ, যে বেগে শুক্র পাক খাচ্ছে তার চেয়েও ৬০ গুণ অধিক বেগে। সারা গ্রহের আকাশে মেঘের এই চলাচলের জন্য (তার সঙ্গে হট্‌হাউসের অবস্থা থাকার জন্য) গ্রহের উপরিতলে সর্বত্র বজায় থাকে একই তাপমাত্রা—কি দিনে কি রাতে, কি বিষুব-অঞ্চলে কি মেরু-অঞ্চলে।

যে গ্রহকে বলা হয় পৃথিবীর যমজ তার অবস্থার সঙ্গে পৃথিবীর কতই না তফাত।

ভেনাস-৯ ও ভেনাস-১০ কিন্তু তারপরেও কৃত্রিম উপগ্রহের মতো শুক্রগ্রহের চারদিকে ঘুরে চলেছে। প্রথম তিনমাসে ভেনাস-৯ ঘুরে-ছিল ৪৬ বার, ভেনাস-১০ ৪৪ বার। শুক্রগ্রহ ততোদিনে পৃথিবী থেকে আরো ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে সরে গিয়েছিল। এই দুটি কৃত্রিম উপগ্রহের মারফত শুক্রগ্রহ সম্পর্কে ও শুক্রগ্রহের চারদিকের মহাশূন্য সম্পর্কে অনেক খবর জানা গিয়েছে।

মঙ্গল

পৃথিবীর পরের গ্রহ মঙ্গল, লাল গ্রহ মঙ্গল। এই গ্রহটি সম্পর্কে মানুষের সবসময়েই একটা বিশেষ আগ্রহ থেকে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগেও মনে করা হত মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীব বাস করে। এমন কথাও শোনা যেত যে মঙ্গলের বুদ্ধিমান জীবরা নাকি সংকেত পাঠাচ্ছে। এখন আর এসব কথা কেউ বলেন না। এমনকি কিছুকাল আগেও অনেকের যে-ধারণা ছিল যে মঙ্গলগ্রহে হয়তো প্রাথমিক ধরনের প্রাণ বা উদ্ভিদ থাকতে পারে—মঙ্গলগ্রহে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের ভাইকিং অভিযানের পরে তাও আর বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তবুও মঙ্গলগ্রহের আকর্ষণ কমেনি। বরং, মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে যতো বেশি জানা যাচ্ছে ততো যেন এই আগ্রহ বাড়ছে।
শীতকালে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মেরিনার-৯ মঙ্গলের উপরিতলের অজস্র আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। খুব সামনে থেকে তোলা সেইসব ছবি দেখে ধারণা হয়েছিল মঙ্গলের উপরিতলের চেহারা কি-রকম এবং পুরনো অনেক ধারণা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ছবি থেকে জানা যায় মঙ্গলের উপরিতলে রয়েছে বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরি, অদ্ভুত অদ্ভুত গহ্বর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফাটল। এমনও ধারণা হতে পারে যে আগ্নেয়গিরিগুলো মৃত নয়। মঙ্গলগ্রহের জগতে সাড়া আছে তা মানতেই হয়।

প্রথমে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে কিছু খবর জেনে নেওয়া যাক।

মঙ্গলগ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘোরে মোটামুটি ৩২ কোটি ৬৪ লক্ষ কিলোমিটার (১৪ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল) দূরে থেকে। মঙ্গলের কক্ষ নিশ্চিতরূপেই উৎকেন্দ্রিক, বা চাপা। ফলে যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে বা অপসূরে তখন সূর্য থেকে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় ২৪ কোটি ৬৪ লক্ষ কিলোমিটার (১৫ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল)। যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছে বা অনুসূরে তখন দূরত্ব ২০ কোটি ৭২ লক্ষ কিলোমিটার (১২ কোটি ৯৫ লক্ষ মাইল)। অর্থাৎ, সূর্য থেকে গ্রহটির

সবচেয়ে দূরে থাকা ও সবচেয়ে কাছে থাকার মধ্যে প্রায় চারকোটি কিলোমিটারের তফাত। তার ধাক্কা গিয়ে পড়ে মঙ্গলগ্রহের ঋতুর ওপরে।

মঙ্গলগ্রহ সূর্যের চারদিকে পুরো একবার ঘুরতে সময় নেয়, পৃথিবীর হিসেবে, ৬৮৭ দিন। এই হচ্ছে মঙ্গলের একটি বছর। মঙ্গলের অক্ষ তার কক্ষতলে ২৪ ডিগ্রী হেলানো (যেমন পৃথিবীর অক্ষ ২৩½ ডিগ্রী হেলানো, যার ফলে পৃথিবীতে ঋতু-পরিবর্তন হয়)। মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল আসে মঙ্গল যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে, অর্থাৎ মঙ্গলের চক্রবেগ যখন সবচেয়ে বেশি। ফলে উত্তর গোলার্ধের চেয়ে দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্ম আরো গরম ও আরো স্বল্পস্থায়ী। তেমনি শীতকাল আরো ঠাণ্ডা ও আরো দীর্ঘস্থায়ী।

মঙ্গলের জগৎটি ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মকালের গরম দিনেও দুপুরের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ওপরে ওঠে না। আর মঙ্গলের যে-কোনো রাত পৃথিবীর মেরু-অঞ্চলের রাতের চেয়েও ঠাণ্ডা। সূর্যাস্ত হবার অনেক আগেই তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে যায়।

নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে মঙ্গলগ্রহের সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২·৬ সেকেণ্ড। মঙ্গলগ্রহের অক্ষ-আবর্তন এমন নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে পৃথিবী থেকে দূরবীন্ দিয়ে তাকিয়ে মঙ্গলের উপরিতলের স্থায়ী কিছু চিহ্ন ধরা সম্ভব।

মঙ্গলগ্রহ আকারে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। মঙ্গলের ব্যাস ৬,৭৯০ কিলোমিটার (পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৫৬ কিলোমিটার)। অর্থাৎ, পৃথিবীর ব্যাস যদি হয় ১·০০০, মঙ্গলের ব্যাস ০·৫৩২। আয়তন পৃথিবীর যদি হয় ১·০০০, মঙ্গলের ০·১৫০। ভর পৃথিবীর যদি হয় ১·০০০, মঙ্গলের ০·১০৭। ঘনত্ব জলের যদি হয় এক, পৃথিবীর ৫·৫১৭, মঙ্গলের ৩·৯৪। উপরিতলে অভিকর্ষ পৃথিবীতে যদি হয় ১·০০০, মঙ্গলে ০·৩৮০।

কক্ষপথে ছুটের বেগ বা চক্রবেগ মঙ্গলের সেকেণ্ডে ২৪ কিলোমিটার (পৃথিবীর সেকেণ্ডে ২৯'৬ কিলোমিটার)।

মঙ্গল থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ সেকেণ্ডে ৫'০৩ কিলোমিটার (পৃথিবী থেকে সেকেণ্ডে ১১'১৮ কিলোমিটার)। তার মানে, মঙ্গল থেকে কোনো রকেট যদি মহাশূন্যে পাঠাতে হয় তাহলে তাকে সেকেণ্ডে ৫'০৩ কিলোমিটার বেগে ছুট দেওয়াতে হবে।

অক্ষ-আবর্তনের কথা আগে বলেছি, মঙ্গলের একটি পাক ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২'৬ সেকেণ্ডে (পৃথিবীর একটি পাক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে)। ভবিষ্যতের নভশ্চররা যখন মঙ্গলে বাস করবেন তখন মঙ্গলের দিন-রাত্রি তাঁদের কাছে পৃথিবীর মতোই মনে হবে। তবে মঙ্গলের ঋতু হবে পৃথিবীর চেয়ে অবশ্যই অনেক দীর্ঘ। এই নভশ্চররা তাঁদের রকেটের বেগ সেকেণ্ডে ১১'১৮ কিলোমিটারে তুলে পৃথিবী ছাড়িয়ে আসতে পেরেছেন। আবার মঙ্গল থেকে ফিরে আসবার সময়ে তাঁদের রকেটের বেগ তুলতে হবে সেকেণ্ডে ৫'০৩ কিলোমিটারে।

মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিযোগ ঘটে (পৃথিবী যখন মঙ্গল ও সূর্যের মাঝখানে) মোটামুটি ৭৮০ দিন পরে পরে বা দু-বছর পরে পরে। সত্তরের দশকে মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিযোগ ঘটেছিল এবং ঘটবার কথা।

কিন্তু মঙ্গলের কক্ষের উৎকেন্দ্রিকতার দরুন (অর্থাৎ মঙ্গলের উপবৃত্ত চাপা হওয়ার দরুন) সমস্ত প্রতিযোগের সময়েই মঙ্গল পৃথিবীর সমান কাছাকাছি আসে না। প্রতিযোগের সময়ে (সে-সময়ে মঙ্গল ছিল তার কক্ষের অনুসূরে বা সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের অবস্থানে) মঙ্গল এসেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে (দুই গ্রহের মধ্যে দূরত্ব তখন ৫ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটারেরও কম ছিল)। আবার প্রতিযোগের সময়ে মঙ্গল থাকবে তার অপসূরে বা সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের অবস্থানে, আর তখন দুই গ্রহের মধ্যে দূরত্ব হবে ১০,২৬,৪০,০০০ কিলোমিটার। দেখা যাচ্ছে,

মঙ্গল সবসময়ে পৃথিবার সমান কাছে আসে না, তার কাছে আসার মধ্যেও প্রায় পাঁচকোটি কিলোমিটারের হেরফের ঘটে থাকে। সবচেয়ে কাছে যখন আসে তখন
সূর্য চন্দ্র ও শুক্রকে বাদ দিলে মঙ্গল হয়ে ওঠে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক (প্রভার মাত্রা –২.৮)।
মতো দূরে থেকে যখন প্রতিযোগ ঘটবে তখন মঙ্গলের প্রভার মাত্রা হবে –১.১ এবং তখনো সেটি হবে লুব্ধকের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। আর সংযোগ ঘটার সময়ে (যখন সূর্য থাকে পৃথিবী ও মঙ্গলের মাঝখানে) মঙ্গলের প্রভা হয় ১.৬, তখন জোরালো লাল হওয়া সত্ত্বেও মঙ্গল ধ্রুবতারার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল নয়।

দূরবীন দিয়ে দেখলে মঙ্গলের চাকতির কিছু হ্রাসবৃদ্ধিও চোখে পড়ে। হ্রাস বলতে পূর্ণিমার দিনকয়েক আগে বা পরে চাঁদের যেমন চেহারা হয় ততোখানি পর্যন্ত। আধা চেহারায় বা ফালি চেহারায় পৃথিবী থেকে মঙ্গলকে দেখা সম্ভব নয়।

প্রতিযোগের সময়ে মঙ্গল যদিও পৃথিবীর খুবই কাছে চলে আসে (৫,৬০,০০,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে) তখনো মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণ করা তেমন সহজ নয়। কেননা মাত্র ৬,৭৯০ কিলোমিটার ব্যাসের এই গ্রহটি এতই ছোট যে জোরালো দূরবীন দিয়ে দেখলেও সেটি বাইনোকুলার দিয়ে চাঁদ দেখার চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয় না। এ-কারণে গ্রহ-অনুসন্ধানী ব্যোমযানের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ শুরু হবার আগে পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহের চেহারা নিয়ে জল্পনাকল্পনার অন্ত ছিল না।

পৃথিবীর একটি ঘন বায়ুমণ্ডল আছে, কেননা পৃথিবীর ভর অপেক্ষাকৃত বেশি, পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ অপেক্ষাকৃত উচ্চমাত্রার। ক্ষুদে চাঁদের কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, থাকা সম্ভবও নয়। অতএব, আশা করা চলে, পৃথিবী ও চাঁদের মাঝামাঝি আকারের এই মঙ্গল-গ্রহের পাতলা বায়ুমণ্ডল আছে। এই আশা মিথ্যে নয়, তবে
আগে যা আমরা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি পাতলা।

মঙ্গলে পৃথিবীর মতো উন্নত জীব বাস করতে পারে এমন কথা অবশ্য কোনো সময়েই বলা হয়নি।

বায়ুমণ্ডল শুক্রেরও আছে, কিন্তু শুক্রের সঙ্গে মঙ্গলের তফাত এই যে বায়ুমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও মঙ্গলের উপরিতলের নানা দাগ ও চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। তারই ওপরে নির্ভর করে মঙ্গলের উপরিতলের একটি ছবি প্রথমে আঁকেন হল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স, সেই ১৬৫৯ সালে। তারপরে উনিশ শতক শেষ হবার আগেই মঙ্গলগ্রহের উপরিতলের মোটামুটি সঠিক একটি মানচিত্র আঁকা হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রধান প্রধান এলাকার নামকরণও। আজও আমরা সেই সময়কার নামের ভিত্তিতেই নাম ব্যবহার করি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে স্মরণীয় নাম—ইতালীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী গিওভানি ভার্জিনিও শিয়াপারেলি। ১৮৭৭ সালে মঙ্গলের প্রতিযোগের সময়ে তিনি গ্রহটিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন এলাকার নামকরণ সহ মঙ্গলের একটি মানচিত্র আঁকেন। তাঁর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার ছিল মঙ্গলের খাল (ইতালীয় ভাষায় 'কানালি')। পরে আমরা জেনেছি, যে অর্থে তিনি খাল বলেছিলেন তা ঠিক নয়। কিন্তু নামটি থেকে গিয়েছে, সেই সঙ্গে শিয়াপারেলির নামও। খাল নিয়ে আলোচনা একটু পরেই আমরা তুলব।

দেখার উপযুক্ত সময়ে যদি মাঝারিগোছের দূরবীন দিয়েও দেখা যায় তাহলে মঙ্গলের অনেক কিছু দেখা যেতে পারে। চোখে পড়ে মঙ্গলের উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরুতেই রয়েছে বরফের মতো সাদা টুপি। অন্যান্য অংশ কোথাও গাঢ়, কোথাও লালচে। এক-সময়ে ধরে নেওয়া হয়েছিল গাঢ় অংশ হচ্ছে সমুদ্র, আর লালচে অংশ শুকনো জমি।

মঙ্গলে যে ঋতুচক্র আছে তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় মঙ্গলের দুই মেরুর সাদা টুপি সারা বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করলে। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তখন উত্তর মেরুর টুপি ছোট হতে

থাকে এবং দক্ষিণ মেরুর (দক্ষিণ মেরুতে তখন শীতকাল) টুপি বাড়তে থাকে। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল (উত্তর গোলার্ধে শীতকাল) তখন ঘটে উল্টো ব্যাপারটি।

বাড়ে-কমে গাঢ় ছোপের এলাকাও। সাদা টুপি যতো কমে ততোই মেরু থেকে বিষুব পর্যন্ত একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ার মতো ছড়িয়ে পড়ে গাঢ় ছোপের এলাকা।

শিয়াপারেলি আরো আবিষ্কার করেন মঙ্গলগ্রহের জমির ওপরে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম কালো কালো দাগ। তিনি এই দাগগুলোর নাম দেন 'কানালি'। ইংরেজি অর্থে চ্যানেল। কিন্তু 'ক্যানাল' বা খাল অর্থেই দাগগুলো পরিচিত হয়ে এসেছে।

শিয়াপারেলি নানাভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেন যে এই খালগুলো বিভিন্ন সমুদ্রকে যুক্ত করেছে, এবং খালগুলোর স্পষ্ট একটা জ্যামিতিক বিন্যাস আছে। এবং যেহেতু খালগুলোর জ্যামিতিক বিন্যাস আছে অতএব খালগুলো নিশ্চয়ই কৃত্রিম। অতএব নিশ্চয়ই একদল বুদ্ধিমান জীব খালগুলো তৈরি করেছে।

তারপর ১৮৯৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী লোয়েল (Lowell) মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে কতকগুলো তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মঙ্গলগ্রহের যে-সব অংশকে সমুদ্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছে সেইসব অংশেও সূক্ষ্ম কালো কালো দাগ আছে। এই কালো দাগগুলোকে যদি খাল বলে ধরে নেওয়া হয়—তাহলে ঘোর ছোপটুকু কিছুতেই সমুদ্র হতে পারে না। সমুদ্রের ওপরে তো আর সত্যি সত্যিই খাল থাকতে পারে না। মঙ্গলগ্রহকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং নানা যুক্তিতর্ক তুলে শেষপর্যন্ত লোয়েল বললেন, মঙ্গলগ্রহের ঘোর ছোপগুলো আসলে উদ্ভিদে ঢাকা জমি। আর লালচে ছোপগুলো মরু অঞ্চল।

লোয়েল আরো দেখেন, মঙ্গলগ্রহের ছোপ ঋতুতে ঋতুতে পাল্টে যায়। আর এই পালটে যাওয়ার কালচক্র আছে। লোয়েল সিদ্ধান্ত করেন, গ্রীষ্মঋতুতে মঙ্গলগ্রহের মেরু-অঞ্চলের বরফ গলে

যায় আর সেই বরফগলা জল বইতে শুরু করে বিষুব-অঞ্চলের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জলসিক্ত জমিতে উদ্ভিদ জন্মাতে শুরু করে। শিয়াপারেলির একটি মতকে কিন্তু লোয়েল পুরোপুরি মেনে নেন। তিনিও বলেন যে মঙ্গলগ্রহের খালগুলোর স্পষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাস আছে। তাঁরও সিদ্ধান্ত, এই খালগুলো কৃত্রিম এবং নিশ্চয়ই একদল বুদ্ধিমান জীবের তৈরী। এসব কৃত্রিম খালখননের পিছনে তিনি একটি পরিকল্পনাও আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর মতো মঙ্গলগ্রহে সর্বত্র খাল-বিল-নদী-সমুদ্র নেই। জলের যোগান সেখানে বছরে মাত্র একটিবার। সুতরাং ব্যাপক এলাকা জুড়ে এমনভাবে খাল কাটা হয়েছে যেন মেরু-অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করলেই বরফগলা জল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর এত বড়ো একটা পরিকল্পনাকে যে গ্রহের জীবরা রূপ দিতে পেরেছে তারা মানুষের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়।

এই ছিল আগেকার কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অভিমত। মেরু-অঞ্চলের সাদা টুপিকে অনায়াসেই বরফ বা তুষার হিসেবে ধরে নেওয়া গিয়েছিল, আর গাঢ় ছোপকে উদ্ভিদ হিসেবে।

তবে মঙ্গলের জলাভাব বা শুষ্কতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। এমনিতে দেখা যেত মেরুর টুপি অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে সেই টুপি ছোট হবার সময়ে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আর্দ্রতা সৃষ্টি হয় না (হলে পৃথিবীর যন্ত্রে ধরা পড়ত)। তখন ধরে নেওয়া হয়, মেরুদেশের বরফ বা তুষারের টুপিটি খুবই পাতলা, গভীরতায় বড়ো জোর কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র। এই অবস্থায় মঙ্গলের উদ্ভিদও বড়ো জোর শ্যাওলাজাতীয় কিছু হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

ঘোররঙের ছোপের জন্য ব্যাখ্যাও ছিল। যেমন, কেউ কেউ বলেছিলেন, ছোপটি পড়ে একজাতীয় লবণ আর্দ্র হয়ে ওঠার দরুন। কেউ কেউ বলেছিলেন, ছোপটি পড়ে আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্‌গীরিত ভস্মের দরুন। তবে বেশির ভাগ ছিলেন উদ্ভিদ তৈরি হওয়ার তত্ত্বের পক্ষে।

বলা বাহুল্য, এই সব ব্যাখ্যার সবটাই নির্ভর করত মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের প্রসার ও গড়নের ওপরে। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ধারণা ছিল মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগটাই নাইট্রোজেন, সামান্যভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড, যৎসামান্যভাগ অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প। মঙ্গলের উপরিতলে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, এই চাপ পৃথিবীর সমুদ্রতল থেকে ১৬,০০০ মিটার উঁচুতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের সমতুল্য। সকলেই জানেন এভারেস্টের চুড়োর উচ্চতা ৯,০০০ মিটারের বেশি নয়। গ্যাস-মুখোশ ছাড়া কোনো মানুষ এভারেস্টের চুড়োয় যেতে পারে না। তার মানে, পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে সহায়ক সাজসরঞ্জাম ছাড়া মঙ্গলের মাটিতে গিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব।

মঙ্গলের আকাশে মেঘও দেখা যায়, বহুকাল ধরেই দেখা হয়েছে। কোনো মেঘ উঁচুতে, কোনো মেঘ নিচুতে। উঁচুদিকের তুলোর মতো মেঘ থেকে কখনো বৃষ্টি ঝরেছে, এমন জানা যায়নি। নিচু-দিকের হলদে মেঘ সম্ভবত ধুলোর ঝড় ওঠার দরুন। বায়ুমণ্ডল যখন আছে, ঝড় থাকতেই পারে, কিন্তু মঙ্গলের পাতলা বায়ুমণ্ডলে ঝড়ের বেগ থাকতে পারে, দাপট না থাকারই সম্ভাবনা।

অনুসন্ধানী ব্যোমযানের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ চালাবার আগে এই ছিল মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে ধারণা।

মেরিনার ব্যোমযান

তিনটি মেরিনার ব্যোমযান সাফল্যের সঙ্গে মঙ্গলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। প্রথমটি ছিল মেরিনার-৪, ২৮শে নভেম্বর উৎক্ষিপ্ত। ১৪ই জুলাই তারিখে ব্যোমযানটি মঙ্গলগ্রহের ৯,৮০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে সময়ে পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ছিল ২১ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার। চার বছর পরে উৎক্ষিপ্ত হয় যুগল মেরিনার ৬ ও ৭, যথাক্রমে ২৪ ফেব্রুআরি ও ২৪ মার্চ

তারিখে। দুটি ব্যোমযানই মঙ্গলগ্রহের ৩,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে বেরিয়ে যায়, প্রথমটি ৩১ জুলাই , দ্বিতীয়টি ৫ আগস্ট।

সে-সময়ে পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোমিটার ও ৯ কোটি ৯ লক্ষ কিলোমিটার। উভয় ব্যোমযান থেকে কয়েকটি পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয় ও মোট ২০০টি আলোকচিত্র তোলা হয়। ৭৪টি তোলা হয় মেরিনার-৬ থেকে তার বেশির ভাগই মঙ্গলের বিষুব এলাকার। ১২৬টি তোলা হয় মেরিনার-৭ থেকে, তার বেশির ভাগই মঙ্গলের দক্ষিণমেরু এলাকার।

এই আলোকচিত্রগুলো দেখে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, মঙ্গলের উপরিতলে চাঁদের উপরিতলের মতোই গহ্বর ছড়ানো—তেমনি প্রচুর সংখ্যায়, তেমনি বিন্যাসে, তেমনি চেহারায়, তেমনি আকারে। তফাত কিছু আছে অবশ্যই। যেমন, মঙ্গলের গহ্বরগুলোতে তলটি আরো সমতল, কেন্দ্রীয় চুড়ো আরো কম, ইত্যাদি। আরো একটি ব্যাপার জানা গিয়েছে, মঙ্গলের খাল আদৌ খাল নয়, পর-পর অনেকগুলো গহ্বরের কালো ছোপ দূর থেকে দেখার ফলে একটানা কালো বলে মনে হয়েছে। তাই হয়ে থাকে। একটা সাদা কাগজের ওপরে যদি সেন্টিমিটারে তিনটি করে ফুটকি বসিয়ে দশ মিটার দূর থেকে কাগজটার দিকে তাকানো যায় তাহলে আলাদা ফুটকি দেখা যায় না, মনে হয় যেন একটানা কালো একটা দাগ। মঙ্গলগ্রহের সার-সার কালো ছোপকে একটানা কালো দাগ বা খাল মনে হয়েছে এই দেখার ভুলেই।

মেরিনার-৭ মঙ্গলের মেরু-টুপির ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। মেরু-টুপিতে পৌঁছবার ঠিক আগে তাপমাত্রা পাওয়া যায় −৪৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (হিমাঙ্কের ৪৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে)। মেরু-টুপিতে পৌঁছতেই তাপমাত্রা আচমকা নেমে যায় −১১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। তারপরে আরো নিচে নেমে −১২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মাত্রায় পৌঁছয়। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড যদি জমে বরফ হয় তাহলে তার তাপমাত্রা দাঁড়ায় −১২৫

ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। মেরিনার-৭ ব্যোমযানের এই বিশেষ পর্যবেক্ষণ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে মেরু-টুপির বেশির ভাগটাই হচ্ছে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড, বা যাকে বলা হয় শুষ্ক বরফ (dry ice), তাই।

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের উপাদান সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে অন্যতম উপাদান হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। আরো জানা যায়, মঙ্গলের উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপের একশো-ভাগের এক-ভাগেরও কম। অর্থাৎ, আগে যতো কম ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও কম।

এই দুটি ব্যোমযানের পর্যবেক্ষণ থেকে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের প্রায় ১৭০ কিলোমিটার উচ্চতায় আয়নোস্ফিয়ারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রাত্রিবেলার আয়নোস্ফিয়ারে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কমে গিয়ে যেমন চেহারা দাঁড়ায়, মঙ্গলের আয়নোস্ফিয়ার সেই রকম। মঙ্গলে ভ্যান অ্যালেন বেল্টের মতো কোনো কিছু নেই। মঙ্গলের চুম্বকত্ব পৃথিবীর চুম্বকত্বের পাঁচহাজার ভাগের একভাগ।

মেরিনার-৬ ও মেরিনার-৭ থেকে পাওয়া খবরে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে অনেক জল্পনাকল্পনার অবসান হল। ধরে নিতে হল মেরু-টুপি মোটেই বরফ নয়—কঠিন অবস্থার কার্বন ডাই-অক্সাইড। ধরে নিতে হল, মঙ্গলে খাল বলে কিছু নেই, আছে অজস্র গহ্বর। ধরে নিতে হল, মঙ্গলের গাঢ় ছোপের এলাকা মোটেই উদ্ভিদের এলাকা নয়। মঙ্গল সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা হতাশ হলেন, বলা চলে।

এমনি অবস্থায় ঘটল গ্রহ-অনুসন্ধানী মেরিনার-৯ ব্যোমযানের অভিযান।

আসলে ব্যোমযান উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল দুটি—মেরিনার-৮ ও মেরিনার-৯— মে মাসে। প্রথমে উৎক্ষিপ্ত মেরিনার-৮ রওনা হবার মিনিট কয়েক পরেই দিক্ হারিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। কিন্তু মেরিনার-৯ ঠিকভাবে যাত্রা করতে পারে এবং নভেম্বর মাসে মঙ্গলের এলাকায় গিয়ে পৌঁছয়। মঙ্গলে তখন বড়ো রকমের একটি

ধূলিঝড় চলছিল এবং মঙ্গলের প্রায় গোটা উপরিতল ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

মেরিনার-৯ ব্যোমযানকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি, করে তোলা হয় মঙ্গলগ্রহের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। মঙ্গলের কক্ষে ঘুরতে ঘুরতে মেরিনার-৯ ধূলিঝড় থামার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ঝড় থামে ডিসেম্বরে। শুরু হয় মেরিনার-৯ ব্যোমযানের পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ।

এই একটিমাত্র ব্যোমযান থেকে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এত প্রচুর খবর পাওয়া গিয়েছে, যার কোনো তুলনা নেই। পাওয়া গিয়েছে দুই-কিলোমিটারের ভাগে ভাগে মঙ্গলের গোটা উপরিতলের ৭,০০০ আলোকচিত্র (কিছু আলোকচিত্র ১০০ মিটারের ভাগে ভাগে)। আরো পাওয়া গিয়েছে তিনহাজার-কোটি টুকরো খবর, যার মোট পরিমাণ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সমগ্র পাঠ্যাংশের ৩৬ গুণ।

এই সমস্ত খবরের সাহায্যে মঙ্গলের একটি বিস্তৃত মানচিত্র তৈরি করা অবশ্যই সম্ভব হবে। সেই মানচিত্রে দেখানো থাকবে বহু হাজার পৃথক পৃথক গহ্বর, পর্বত, উপত্যকা ও সমতল-ভূমি। ল্যাটিন নাম দেওয়া থাকবে পৃথক পৃথক অঞ্চলের—কোথাও বা গর্ডিয়ান গিঁট (Notus Gordii), কোথাও বা তারুণ্যের ফোয়ারা (Fons Iuventus), কোথাও বা সূর্যের হ্রদ (Solis Lacus)।

মঙ্গলগ্রহে মহাদেশ নেই, সমুদ্র নেই। বিভাগ যদি করতেই হয় তাহলে চোখে পড়ার মতো বিভাগ রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে। একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দক্ষিণ গোলার্ধে গহ্বরের ছড়াছড়ি, অনেকটা চাঁদের উপরিতলের মতো। অতীতের কোনো এক সময়ে প্রচণ্ড উল্কার আঘাতেই নিশ্চয় এই সমস্ত গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর গোলার্ধে গহ্বর অপেক্ষাকৃত কম, বেশির ভাগটাই মসৃণ সমতলভূমি—অনেকটা চাঁদের 'সাগর' এলাকার মতো। সম্ভবত তৈরি হওয়ার কারণও একই—ব্যাপক লাভা-প্রবাহ।

চাঁদের সঙ্গে মঙ্গলের মিল এইটুকুই। আমরা জানি গত ৩২০

কোটি বছর ধরে চাঁদ একেবারেই মৃত। সাড়া বলতে সেখানে আছে বড়ো জোর কোথাও-বা মৃদু একটু ভূকম্পনের, কোথাও-বা সামান্য একটু উল্কাপাতের। কিন্তু মঙ্গল এক জীবন্ত গ্রহ। মঙ্গলে তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাল আগ্নেয়গিরি, যেগুলো হয়তো-বা এখনো সক্রিয়। মঙ্গলে দেখা দিয়েছে গ্রস্ত (rift) উপত্যকা, মঙ্গলের উপরি-তলে ক্ষয় ধরিয়েছে ঝঞ্ঝার বেগে ধাবিত বাতাস ও বালুঝড় এবং এমনও হতে পারে যে একসময়ে যখন মঙ্গলের আবহাওয়া অনেকটা পৃথিবীর মতো ছিল তখন বিরাট বিরাট নদী মঙ্গলের উপরিতল দিয়ে বয়ে গিয়েছে। মঙ্গল সম্পর্কে মেরিনার-৯ ব্যোমযানের এই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—গ্রহটির বিবর্তনে জলের সক্রিয় ভূমিকা থাকা।

যদি নিছক আকার নিয়ে বিচার করতে হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে মঙ্গলের আগ্নেয়গিরিগুলো অসাধারণ। মঙ্গলের সবচেয়ে বড়ো আগ্নেয়গিরিটির নাম 'নিক্‌স ওলিম্‌পিয়া' (দেবতাদের বাসস্থান)। পৃথিবীর যে-কোনো আগ্নেয়গিরির চেয়ে মঙ্গলের এই আগ্নেয়গিরি অনেক অনেক বড়ো। আকারগত মিল আছে বটে কিন্তু যেখানে নিক্‌স ওলিম্পিকা ৫০০ কিলোমিটার ব্যাসের বেড় নিয়েছে সেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আগ্নেয়গিরি হাওয়াই দ্বীপের মনা লোয়া-র মাত্র ২০০ কিলোমিটার ব্যাসের বেড়। নিক্‌স ওলিম্পিকার চুড়ো চারদিকের সমতল জমি থেকে অন্তুতপক্ষে ২৩ কিলোমিটার উঁচুতে উঠেছে। সেখানে মনা লোয়ার চুড়োর উচ্চতা প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার। নিক্‌স ওলিম্পিকা এই সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড়ো আগ্নেয়গিরি। মঙ্গলগ্রহে আগ্নেয়-গিরি আছে আরো বহু। সবগুলোই অপেক্ষাকৃত বিশাল। এমনটি হবার কারণ কী ?

জবাবে বলতে হয়, এমনটি হয়েছে গ্রহের আভ্যন্তরিক গড়নের দরুন। পৃথিবীর ত্বক যথেষ্ট পাতলা—সমুদ্রের এলাকায় মাত্র দশ কিলোমিটার পুরু। পৃথিবীর অভ্যন্তর খুবই উত্তপ্ত এবং স্থাণু নয়। ফলে ভূত্বকে ভাঙন ধরার একটা অবস্থা তৈরিই থাকে। ভূত্বকটিও

স্থাণু নয়, অভ্যন্তরের চলাচলের সঙ্গে মিল রেখে চলাচল করে। সমগ্র-ভাবে দেখলে এই হচ্ছে মহাদেশের সঞ্চরণ। তাই পৃথিবীর কোনো আগ্নেয়গিরিই একজায়গায় চিরকাল স্থির হয়ে থাকে না। ত্বক সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরে যায়। তখন তলা থেকে সরে যায় সেই উত্তাপের এলাকাটিও যার জন্য আগ্নেয়গিরি তৈরি হয়েছিল।

মঙ্গলগ্রহে মহাদেশের সঞ্চরণ কখনো ঘটেছে এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। তবে সঞ্চরণের কাছাকাছি যা ঘটেছে তা হচ্ছে বিরাট একটি ফাটল—ভ্যালিস মেরিনারিস। ফাটলটি ৫,০০০ কিলোমিটার লম্বা, গ্রহের মাঝামাঝি এলাকায় গ্রহের ত্বককে দু-ভাগ করে দিয়েছে। এই থেকেই মঙ্গলগ্রহে মহাদেশের সঞ্চরণ শুরু হয়েছিল কিন্তু হতে পারেনি। না হতে পারার কারণ, মঙ্গলগ্রহের ত্বক খুবই পুরু—প্রায় ২০০ কিলোমিটার। এত পুরু ত্বকে কখনোই ভাঙনের অবস্থা তৈরি হতে পারে না। মঙ্গলের আগ্নেয়গিরি তাই চিরকাল একই জায়গায় থেকে গিয়েছে—সম্ভবত কোটি কোটি বছর ধরে।

মঙ্গলে ঋতু-পরিবর্তন ঘটে। মেরু-টুপি বাড়ে-কমে। বিষুব অঞ্চলে গাঢ় ছোপ পড়ে। এসব থেকে কল্পবিজ্ঞানীদের কাহিনীতে মঙ্গলগ্রহের বুদ্ধিমান জীবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কল্পনার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

তবুও মঙ্গলগ্রহের পরিস্থিতি চমৎকার। ঋতু-পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে কিন্তু তার যে লক্ষণ চোখে পড়ে সেটা অনেকটাই মঙ্গলের বায়ুর জন্য। মঙ্গলের বায়ু মঙ্গলের মাটির ওপর দিয়ে বয়ে যাবার সময়ে এক জায়গার ধুলো সরিয়ে নিয়ে এসে জড়ো করে অন্য জায়গায়। মেরিনার-৯ থেকে পর্যবেক্ষণের সময়ে এমনি ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা পর-পর তোলা আলোকচিত্রে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। গোড়ায় ছিল পাতার মতো আকারের একটা গাঢ় ছোপ, তারপরে ধুলো উড়ে গিয়ে যতোই নিচের মাটি বেরিয়ে পড়েছিল ততোই বড়ো হয়ে উঠেছিল সেই গাঢ় ছোপ।

মঙ্গলের বায়ুর বেগ যে কতখানি তাও জানা গিয়েছে—ঘণ্টায়

প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ সমুদ্রতলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের দু-শোভাগের একভাগ।

মঙ্গলের মাটির গায়ে মঙ্গলের বায়ুর আঁচড় কাটারও নানা লক্ষণ ধরা পড়েছে। সাহারায় যেমন বালিয়াড়ি দেখা যায় তেমনি বালিয়াড়ির লম্বা সারি রয়েছে মঙ্গলেও। গহ্বরগুলোর কিনার অতি-মাত্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত।

পৃথিবীতে ক্ষয়ের প্রধান হেতু হচ্ছে জল, কিছুটা কম মাত্রায় বাতাস। মঙ্গলের ব্যাপারটা উল্টো। মঙ্গলে জল-হেতু ক্ষয়ের লক্ষণ খুবই কম। কিন্তু, আছে। পৃথিবীর মতো নদীপথ মঙ্গলেও আছে, মরুভূমির এলাকায় আচমকা বন্যার মতো জলের ঢল নামলে যে ধরনের নদীপথ তৈরি হয়ে থাকে। অন্য কতকগুলো নদীপথ আছে যা পৃথিবীর নদীর মতো আঁকাবাঁকা।

নদীপথের গড়নে পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে এই যে মিল তা থেকে ধারণা হয় মঙ্গলের নদীপথে একসময়ে জলের প্রবাহ ছিল। এখন আর নেই। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ কম হওয়ার দরুন জলের পক্ষে তরল অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য মঙ্গলের কিছু কিছু নদীপথ লাভাপ্রবাহেও তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

তবে আঁকাবাঁকা নদীপথগুলোতে যে জল ছিল সেটা ধরেই নিতে হয়। মঙ্গলের মেরু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ বরফ আছে। যে নদীপথ-গুলোতে জল ছিল তার ধারে ধারে হয়তো কিছু জীবনের লক্ষণও ছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহের আবহাওয়ায় বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আমাদের পৃথিবী বিরাট এক হিমযুগ থেকে সবে বেরিয়ে এসেছে। এমনি হিমযুগ গত ষাটকোটি বছরের মধ্যে আরো দু-বার এসেছিল। হিমযুগ কেন আসে তা আমরা জানি না। সূর্য থেকে পাওয়া উত্তাপ কমে যাওয়া বা এমনি কোনো বাইরের কারণের জন্য যদি হয়ে থাকে তাহলে মঙ্গলের পক্ষেও একই কারণ ঘটতে পারে। অর্থাৎ মঙ্গলেও একাধিক হিমযুগ এসে গিয়েছে।

বরং মঙ্গলে আরো বেশি করে এসেছে। কেননা মঙ্গল কখনো কখনো সূর্য থেকে অনেক দূরে চলে যায়। মঙ্গলের অক্ষ ৩৫ ডিগ্রী পর্যন্ত হেলে যেতে পারে। আমরা জানি পৃথিবীর অক্ষ ২৩½ ডিগ্রী হেলে আছে বলেই পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়ে থাকে। পৃথিবীর অক্ষ একই মাত্রায় হেলে থাকে, তার অদলবদল হয় না। যদি হত তাহলে পৃথিবীর আবহাওয়াতেও বড়ো রকমের পরিবর্তন হতে পারত।

মঙ্গলে হয়েছে। মঙ্গলে এখন চলেছে হিমযুগের অবস্থা। এক-সময়ে আরো আর্দ্র ছিল। তখনই হয়তো মঙ্গলের নদীতে ছিল জল আর নদীর ধারে ধারে জীবন। ভবিষ্যতে আবার এমনি অবস্থা ফিরে আসতেও পারে।

আমেরিকান বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে ভাইকিং পাঠিয়ে মঙ্গলে জীবন ছিল কিনা, থাকতে পারে কিনা, সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন।

ভাইকিং-১ ও ভাইকিং-২

ভাইকিং ব্যোমযান পাঠানো হয়েছে দুটি—ভাইকিং-১ ও ভাইকিং-২, ৮৫ কোটি ডলার (প্রায় ৮০০ কোটি টাকা) ব্যয়ে।

ফ্লোরিডার কেপ্ ক্যানাভেরাল থেকে ভাইকিং-১ উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। দশ মাসে ৬৭ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব পার হয়ে ভাইকিং-১ মঙ্গলে পৌঁছয় ১৯ জুন , ভাইকিং-২ ৭ আগস্ট তারিখে। পৌঁছবার পরে দুটি ভাইকিং-ই মঙ্গলের কক্ষে পরিক্রমা করতে শুরু করে। প্রথমটির অবতরণ-যান (ল্যাণ্ডার) মঙ্গলের মাটিতে নামে ২০ জুলাই (সাত বছর আগে এই তারিখেই মানুষ চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছিল)। দ্বিতীয়টির অবতরণ-যান মঙ্গলের মাটিতে নামে ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে। দুই ক্ষেত্রেই অবতরণ-যান নেমে আসার পরে মূল ভাইকিং ব্যোমযান (অরবিটার) মঙ্গলকে পরিক্রমা করে চলেছে।

এই দুটি ভাইকিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা

জানতে পেরেছেন, মঙ্গলের উপরিতল বালুকাময়, শিলাময়, বাদামী লাল মরুভূমি-ময়। মঙ্গলের আকাশ হালকা লালচে, মেঘহীন। সামান্য কুজ্‌ঝটিকার আভাস পাওয়া যায়। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৯৫ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্‌সাইড, ৩ শতাংশ নাইট্রোজেন (পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন), ১·৫ শতাংশ আর্গন, যৎসামান্য পরিমাণে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন।

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের একশো ভাগের একভাগ। মেরিনার-৯ থেকে যা জানা গিয়েছিল তার চেয়ে কিছু বেশি।

অবতরণ-স্থলে তাপমাত্রা ছিল রাত্রিবেলা −৮৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড আর দুপুরের কিছু পরে −৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। একটা ধারণা দেবার জন্য বলা চলে, পৃথিবীর কুমেরুতে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা পাওয়া গিয়েছে −৮৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে অক্‌সিজেন পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ারে প্রধান উপাদান হচ্ছে আয়নিত অক্‌সিজেন অণু। সেখানে আবিষ্ট কণিকার ঘনত্ব পৃথিবীর আয়নো-স্ফিয়ারে ইলিকট্রনের ঘনত্বের প্রায় সমান (প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় দু-লক্ষ)

মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের বিশেষ গড়নটি তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরির তৎপরতার ফলে। পৃথিবীর গোড়ার দিকের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কেও একই কথা। কিন্তু দুই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে ভিন্নতা এসেছে পরবর্তী কালে বিবর্তনের ভিন্নতার জন্য। তবে বর্তমান মঙ্গলগ্রহে নাইট্রোজেন আর্গন ইত্যাদি গ্যাসের গড়ন থেকে ধারণা হয়, অতীতে একসময়ে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল আরো ঘন ছিল। সম্ভবত সেই বায়ুমণ্ডলের চাপও ছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের মতোই। সেই অবস্থায় প্রচুর তরল জল থাকাটাও অসম্ভব ছিল না।

শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল—এই তিনটি গ্রহের মধ্যে এত মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের বায়ুমণ্ডল এত ভিন্ন হল কেন? কোনো একটি গ্রহের

বায়ুমণ্ডল কেমন হবে তা নির্ভর করে আগ্নেয়গিরির তৎপরতার ওপরে, উপরিতলে মহাকর্ষের টানের ওপরে, বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে রাসায়নিক ক্রিয়ার ওপরে ও তাপমাত্রার ওপরে।

মঙ্গলগ্রহের আয়নোস্ফিয়ারে পাওয়া যাচ্ছে আয়নিত অক্‌সিজেন অণু। জলীয় বাষ্প থাকা সম্ভব নয়, থাকলে তা ভাগ হয়ে যেত অক্‌সিজেনে ও হাইড্রোজেনে (জলের দুটি উপাদান)। আবার অক্‌সিজেন-অণু ইলেকট্রনের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হয় এবং তার ফলে তৈরি হয় বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ অক্‌সিজেন পরমাণু। এই অক্‌সিজেন পরমাণু মঙ্গলের মহাকর্ষের টান ছিঁড়ে অনায়াসেই মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতে পারে। অক্‌সিজেনের চেয়ে হাইড্রোজেন আরো হালকা, ফলে হাইড্রোজেন উধাও হয় আরো অনায়াসে। এই অক্‌সিজেন যদি উধাও না হত তাহলে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল হতে পারত এবং মঙ্গলে থেকে যেত। পৃথিবীর অভিকর্ষ মঙ্গলের চেয়ে আড়াই-গুণ বেশি। এ-কারণে পৃথিবী থেকে যদিও কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম উধাও হয়ে যায় কিন্তু অক্‌সিজেন আটক পড়ে। এই বিশেষ ঘটনার জন্যই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই রকমটি হতে পেরেছে।

ভাইকিং-এর অবতরণ-যান মঙ্গলের মাটিতে যেখানে নেমেছে সেখানে দেখা গিয়েছে নানা আকারের নানা রঙের নানা চেহারার পাথরের চাঁই—মিহি লালচে ধুলোতে ঢাকা।

এক্‌স-রে প্রকৌশলের সাহায্যে মঙ্গলের মাটি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে মঙ্গলের মাটির প্রধান প্রধান উপাদান হচ্ছে লৌহ, ক্যাল-সিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ও গন্ধক। যে টাইটেনিয়াম চাঁদের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে, মঙ্গলের মাটিতে তা যৎ-সামান্য। মঙ্গলের শিলায় রয়েছে সিলিকেট, অক্‌সাইড ও হাই-ড্রেটেড সালফেট। একটি প্রধান উপাদান ফেরিক অক্‌সাইড, যার দরুন গ্রহের রঙ লাল।

শুক্রগ্রহের মতো মঙ্গলগ্রহেও চুম্বকত্ব না-থাকার মতো। ভাইকিং-এর অনুসন্ধানেও তা ধরা পড়েছে। শুক্রগ্রহে চুম্বকত্ব না

থাকার কারণ হিসেবে বলা হয়, শুক্রের অক্ষ-আবর্তন অতি ধীরে। কিন্তু মঙ্গলের অক্ষ-আবর্তন প্রায় পৃথিবীর মতোই। তবুও মঙ্গলের চুম্বকত্ব না-থাকার কারণ সম্ভবত মঙ্গলের বস্তুপিণ্ডের কেন্দ্রীয় এলাকায় গলিত ধাতু না-থাকা।

বিশ্লেষণে জানা গিয়েছে মঙ্গলের শিলা ব্যাসল্ট-জাতীয় (আগ্নেয়-গিরির লাভা জমাট বেঁধে তৈরী)। চাঁদের শিলা ও ভারতের দাক্ষিণাত্যের শিলা ব্যাসল্ট-জাতীয়। কিন্তু শুক্রগ্রহে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভেনাস-৯ ও ভেনাস-১০ ব্যোমযানের অনুসন্ধান থেকে জানা গিয়েছে শুক্রগ্রহের শিলা গ্রানাইট-জাতীয়।

ভাইকিং অবতরণ-যানের একটি বড়ো অনুসন্ধানের বিষয় ছিল মঙ্গলগ্রহে জীবাণুর অস্তিত্ব। দুটি অবতরণ-যানের পরীক্ষাকার্যের ফল মাইক্রোব-জাতীয় প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে গিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে জৈব যৌগপদার্থের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব অনেক অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, সূর্যের আলোর যে অতি-বেগুনী বিকীরণ মঙ্গলের উপরিতলে এসে পড়ে (মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে ওজোন-স্তর নেই যে অতি-বেগুনী রশ্মি বাধা পাবে) তার দরুন হয়তো উপরিতলের জৈব যৌগপদার্থ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাটির অনেক গভীরে অনুসন্ধান চালিয়েও জৈব যৌগপদার্থের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। কোনো গ্রহে যে-কোনো ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব যদি থাকে তাহলে সেই গ্রহে জৈব যৌগপদার্থ থাকতেই হয়।

মঙ্গলে এই যৌগপদার্থের অভাব। অতএব মঙ্গলে কোনোরকম প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা সে-বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা চলে না।

মঙ্গলের উপগ্রহ

মঙ্গলের উপগ্রহ দুটি—ফোবোস (ত্রাস) ও ডাইমোস (শঙ্কা)। গ্রীক যুদ্ধ-দেবতার রথের দুই ঘোড়ার নামে এই নাম। উপগ্রহ দুটি এত ছোট আর মঙ্গলগ্রহের এত কাছে যে শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া

দেখা যায় না। তাও দেখতে হয় মঙ্গলের প্রতিযোগের সময়ে। উপগ্রহ দুটি আবিষ্কার করেন আসাফ্ হল, ১৮৭৭ সালে। এজন্য তিনি ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-মানমন্দিরের ২৬˝ ইঞ্চি দূরবীন ব্যবহার করেছিলেন। আশ্চর্যের কথা, এই দুটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হবার দেড়শো বছর আগে লেখা 'গালিভার্স ট্রাভেলস' বইয়ে মঙ্গলের দুটি উপগ্রহের কথা লিখেছিলেন সুইফ্ট। কেপ্লারের লেখা সম্ভবত তাঁর পড়া ছিল, মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ থাকতে পারে একথা প্রথম বলেছিলেন কেপ্লার।

ফোবোস ও ডাইমোস উপগ্রহ দুটির ব্যাস যথাক্রমে ১৬ কিলোমিটার ও ৮ কিলোমিটার। দুটি রয়েছে মূল গ্রহের প্রায় বিষুবতল বরাবর, প্রথমটি প্রায় ৫,৮০০ কিলোমিটার দূরে, দ্বিতীয়টি প্রায় ২০,০০০ কিলোমিটার দূরে। দুটি উপগ্রহেরই কক্ষ বৃত্তাকার, গ্রহের চারদিকে একবার ঘুরতে ফোবোস সময় নেয় ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট, ডাইমোস ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। তার মানে, নিজের অক্ষের চারদিকে একটি পাক খেতে মঙ্গল যতোটা সময় নেয় (২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট) তার চেয়ে কম সময়ে ফোবোস গ্রহের চারদিকে একবার ঘুরে আসে। এদিক থেকে ফোবোস সৌরমণ্ডলে এক অসাধারণ উপগ্রহ। ফোবোস-এর উদয় হয় পশ্চিমে, সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা আকাশে থাকার পরে অস্ত পুবে। ডাইমোসের উদয় পুবে, ৬৬ ঘণ্টা আকাশে থাকার পরে অস্ত পশ্চিমে। উপগ্রহ দুটি গ্রহের এত কাছে যে গ্রহের মেরু-অঞ্চল থেকে উপগ্রহদুটিকে কোনো সময়েই দেখা যায় না।

কল্পনাপ্রবণ কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছিলেন, মঙ্গলের এই দুটি উপগ্রহ কৃত্রিম, একসময়ে মঙ্গলে যে অতি-বুদ্ধিমান জীবরা বাস করত তাদের তৈরী। পরে মেরিনার ও ভাইকিং থেকে উপগ্রহ দুটির ছবি তোলা হয়েছে। দুই উপগ্রহেরই উপরিতলে রয়েছে অজস্র গহ্বর—যা থেকে বোঝা যায়, আর যাই হোক উপগ্রহ দুটি কৃত্রিম কিছুতেই নয়। ভাইকিং-এর অরবিটার থেকে উপগ্রহ দুটিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

বৃহস্পতি

আমরা এতক্ষণ যে-সব গ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো সবই আকারে ছোট। শুক্রগ্রহের আকার প্রায় পৃথিবীর মতো, মঙ্গলগ্রহ ও বুধগ্রহ পৃথিবীর চেয়ে ছোট। এবারে আমরা আলোচনা করব সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ বৃহস্পতি (Jupiter) নিয়ে। গ্রহটি রয়েছে সূর্য থেকে প্রায় ৭৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। আমরা জেনেছি বুধ রয়েছে সূর্য থেকে প্রায় ৬ কোটি কিলোমিটার দূরে, শুক্র প্রায় ১১ কোটি কিলোমিটার দূরে, পৃথিবী প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে, মঙ্গল প্রায় ২৩ কোটি কিলোমিটার দূরে। পর-পর এই তিনটি গ্রহের দূরত্বের দিকে চোখ রাখলে বৃহস্পতির ৭৮ কোটি কিলোমিটার দূরত্বকে বড়ো বেশি মনে হয়। ২৩ থেকে ৭৮—মাঝখানে মস্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এমনকি কেপ্‌লারের কাছেও অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, 'মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে আমি একটি গ্রহ রাখতে চাই।' রেখে তিনি যেতে পারেন নি, অর্থাৎ খুঁজে পাননি। এই ফাঁকের মধ্যে আস্ত একটি গ্রহ খুঁজে পাননি পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরাও, যদিও তাদের হাতে ছিল অনেক শক্তশালী দূরবীন। তবে তাঁরা অন্য জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন। তা হচ্ছে লাখখানেক টুকরো বস্তুপিণ্ড, যেগুলো গ্রহের মতোই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সম্ভবত এককালে আস্ত একটি গ্রহই ছিল, যে কোনো কারণেই হোক ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। গ্রহ নয়, গ্রহের টুকরো—তাই বলা হয় গ্রহাণু (Asteroid)। বিষয়টি নিয়ে পরে আমরা আলোচনা তুলব। এখন সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড়ো গ্রহটির দিকেই তাকানো যাক।

দূরবীন দিয়ে গ্রহটির দিকে প্রথম তাকিয়েছিলেন গ্যালিলিও, ১৬১০ সালে। তারপর থেকে আরও অনেকেই তাকিয়েছেন; এমনকি খুব ছোট দূরবীন দিয়ে তাকাতেও অসুবিধে নেই। সহজেই চোখে পড়ে বৃহস্পতির ঝকঝকে চাকতি আর তার গায়ে পর-পর কতগুলো

ধূসর বলয়। আরো চোখে পড়ে ভিতরের দিকের চারটি উজ্জ্বল উপগ্রহ।

বৃহস্পতিকে বলা হয় বৃহৎ (major) গ্রহ। এমনি বৃহৎ গ্রহ সৌরমণ্ডলে আছে আরো তিনটি—শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। তিনটিই বৃহস্পতি থেকে আরো দূরে। আর তুলনায় বৃহস্পতি অনেক বড়ো, সৌরমণ্ডলের অন্য সমস্ত গ্রহকে একসঙ্গে করলে যা দাঁড়ায় তার চেয়েও। বৃহস্পতির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১গুণ, কিন্তু আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১৩০০ গুণেরও বেশি বেশি (অর্থাৎ, বৃহস্পতি যতোখানি জায়গা জুড়ে আছে তার মধ্যে ১৩০০-এরও বেশি পৃথিবী পুরে রাখা চলে)।

কিন্তু বৃহস্পতির আয়তন যদিও পৃথিবীর চেয়ে ১৩০০ গুণ বেশি কিন্তু তার ভর পৃথিবীর চেয়ে ৩১৮ গুণ বেশি। তার মানে বৃহস্পতির গড় ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের চারভাগের একভাগ বা জলের ঘনত্বের প্রায় ১$\frac{১}{৩}$ গুণ। এ থেকে ধরে নেওয়া চলে, এতক্ষণ আমরা যে চারটি গ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছি তাদের গড়ন আর বৃহস্পতির গড়ন একেবারেই আলাদা। বৃহস্পতিগ্রহের ব্যাপক এলাকা জুড়ে রয়েছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের ঘন একটি বায়ুমণ্ডল। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে আমরা এই বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ মাত্র দেখি।

এই উপরিভাগ খুবই শীতল, তার তাপমাত্রা −১২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। কিন্তু বাইরের দিকে যদিও এতটা শীতল ভিতরের দিকে সম্ভবত খুবই উত্তপ্ত। একটি হিসেবে বলা হয়েছে বৃহস্পতির গোলকের কেন্দ্রীয় এলাকায় তাপমাত্রা পাঁচলক্ষ ডিগ্রীর কাছাকাছি। বৃহস্পতি থেকে যে শক্তি মহাশূন্যে নিঃসরিত হয় তাও সূর্য থেকে বৃহস্পতি যে-পরিমাণ শক্তি পেয়ে থাকে তার তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

তাহলে কি বৃহস্পতিকে 'ক্ষুদে সূর্য' বা 'ক্ষুদে তারা' বলা চলে? কুড়ির দশক পর্যন্ত অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাই বলতেন। এখন আর বলেন না। বৃহস্পতি যদি আরো হাজারগুণ বড়ো হত তাহলে

তারা হতে পারত, তার আগে নয়। গ্রহ ও তারার তফাতটা আসলে ভরের তফাত। তারা কি-ভাবে তৈরি হয় সে-আলোচনা আমরা পরে তুলব। আপাতত ধরে নেওয়া চলে, তারা তৈরি হয় ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে। মহাকর্ষের টানে সেই মেঘ যখন জমাট বাঁধতে থাকে তখন কণিকার সঙ্গে কণিকার সঙ্ঘর্ষে ভিতরকার উত্তাপও বেড়ে চলে। বাড়তে বাড়তে ভিতরকার তাপমাত্রা ১'৪ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁছলেই শুরু হয়ে যায় পারমাণবিক ক্রিয়া এবং তারাটি জ্বলে ওঠে। বৃহস্পতির ভর এত বেশি নয় যে ভিতরকার উত্তাপ তারা হবার প্রয়োজনীয় মাত্রায় পৌঁছতে পারে। অতএব বৃহস্পতি থেকে গিয়েছে গ্রহ, তারা হতে পারেনি।

কক্ষ-পরিক্রমা

সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে বৃহস্পতির সময় লাগে ১১'৮৬ বছর। ৩৯৯ দিন পরে পরে পৃথিবী বৃহস্পতিকে অতিক্রম করে যায় বা বৃহস্পতির সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিযোগ ঘটে। আমরা জানি, এই হচ্ছে বৃহস্পতির যুতিকাল (যে সময়ে মধ্যে ভিতরেব দিকের একটি গ্রহ পৃথিবীকে অতিক্রম করে বা বাইরের দিকের একটি গ্রহকে পৃথিবী অতিক্রম করে)। প্রায় সারা বছর ধরে বৃহস্পতিকে সহজেই দেখা যায়। প্রায় বারো বছরের কক্ষ-পরিক্রমায় বৃহস্পতি এক-একটি বছর কাটায় এক-একটি রাশিতে। সূর্য থেকে বৃহস্পতির গড় দূরত্ব ৭৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪০ লক্ষ কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবী যতোটা দূরে তার চেয়ে বৃহস্পতি রয়েছে ৫'২ গুণ বেশি দূরে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে আমরা বলি জ্যোতিষিক একক। তার মানে, সূর্য থেকে বৃহস্পতির গড় দূরত্ব হচ্ছে ৫'২ জ্যোতিষিক একক। পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির গড় দূরত্ব প্রতিযোগের সময়ে থাকে ৪'২ জ্যোতিষিক একক, সংযোগের সময়ে ৬'২ জ্যোতিষিক একক। প্রভার মাত্রা প্রতিযোগের সময়ে থাকে –২'৫, সংযোগের সময়ে –১'৪। লুব্ধকের চেয়েও বৃহস্পতি যথেষ্ট বেশি উজ্জ্বল। গ্রহটি

এতই দূরে যে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে তার কোনো কলা চোখে পড়ে না।

দূরবীন দিয়ে দেখলে বৃহস্পতিকে যেমনটি দেখায় তার ছবি এই বইয়ে আছে। ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, বৃহস্পতির চাকতিটি পুরো গোল নয়, ওপরে-নিচে খানিকটা চাপা—অর্থাৎ, চোখে পড়ার মতো উপবৃত্তাকার। এমনটি হওয়ার কারণ, নিজের অক্ষের চারদিকে বৃহস্পতির অতি-দ্রুত আবর্তন।

দূরবীন দিয়ে তাকালে আরো চোখে পড়ে, বৃহস্পতির গায়ে তার বিষুববৃত্তের সমান্তরালে পর-পর কতকগুলো ধূসর বাদামী-লাল মেঘের বলয় (belts) এবং দুই বলয়ের মাঝখানে হলুদ অঞ্চল (zones)। সবসময়ে একরকমের চেহারায় নয়—কখনো বেশি উজ্জ্বল কখনো কম উজ্জ্বল, কখনো বেশি চওড়া কখনো কম চওড়া। অর্থাৎ, সব-সময়েই বদলে যাচ্ছে। আবার এইসব বলয় ও অঞ্চলের ওপরে চোখে পড়ে নানা বিন্যাসের ফুট ফুট দাগ। চোখে পড়ে নানা রকমের রঙ—বাদামী, লাল, পাটল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনে, পাঁশুটে ও সাদা। এত সব অদল-বদল ও ওলোট-পালোট থেকে বোঝা যায় বৃহস্পতির ভিতরকার বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে আর তারই চেহারা বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে যে-ভাবে ফুটে ওঠে তাই আমরা পৃথিবী থেকে দেখছি। আবার অনেকে বলেন, বৃহস্পতির বিষুব
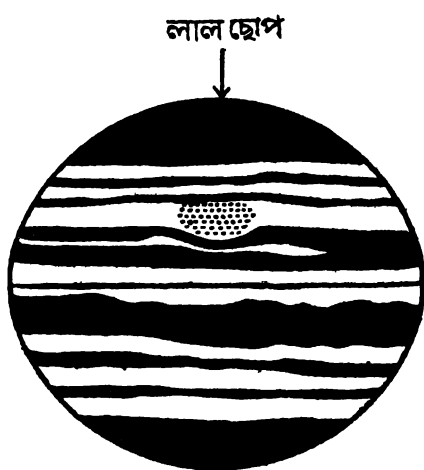
চিত্র ৩১। বৃহস্পতির বিভিন্ন অঞ্চল। ওপরে দক্ষিণ মেরুর অঞ্চল, নিচে উত্তর মেরুর অঞ্চল, মধ্যে বিষুব বলয়। বৃহস্পতির লাল ছোপটিও দেখা যাচ্ছে।

এলাকায় রঙের বদল নাকি বৃহস্পতির বছরের সঙ্গে তাল রেখে ঘটে থাকে। তাহলে ধরে নিতে হয় বৃহস্পতিতে ঋতু বদলাচ্ছে আর সেই সঙ্গে রঙ বদলাচ্ছে। কথাটা সম্ভবত ঠিক নয়। আমরা জানি, গ্রহের অক্ষ গ্রহের কক্ষতলে হেলে থাকলে তবেই সেই গ্রহে ঋতুর বদল ঘটে। বৃহস্পতির অক্ষ তার কক্ষতলে হেলে আছে মাত্র ৩ ডিগ্রী; অতএব বৃহস্পতি গ্রহে লক্ষণীয় ঋতুর বদল আশা করা চলে না।

অক্ষ-আবর্তন

বৃহস্পতির গায়ে লক্ষণীয় যে-সব দাগ রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, নিজের অক্ষের চারদিকে গ্রহটির আবর্তন অতি দ্রুত। জানা গিয়েছে, বিষুব এলাকায় একটি আবর্তন সম্পন্ন হয় ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে, মেরুর দিকে ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে। এক-এক এলাকায় এক-এক মাত্রার আবর্তন—এমনটি কোনো কঠিন বস্তুর পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। ধরে নিতে হয় বৃহস্পতির বস্তু রয়েছে গ্যাসীয় অবস্থায়। আর এই গ্যাসীয় গোলকটি অতি প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হয়ে চলেছে —ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক বেগে। প্রচণ্ড এই আবর্তনের দরুনই গ্যাসীয় গোলকটি ওপরে-নিচে চাপা, পেট-বরাবর স্ফীত।

বৃহস্পতি সম্পর্কে আরো জানা গিয়েছে যে এই গ্রহটি থেকে রেডিও-তরঙ্গ বিকীরিত হয়—একটি তরঙ্গ ১৩-মিটার ব্যাণ্ডে, অপরটি ১০-সেন্টিমিটার ব্যাণ্ডে। প্রথমটি বিকীরিত হয় দমকে দমকে, দ্বিতীয়টি অবিরামভাবে। পৃথিবীতে বজ্রসহ ঝড় হবার সময়ে যে লক্ষণ ধরা পড়ে বৃহস্পতির প্রথম রেডিও-তরঙ্গের লক্ষণও অনুরূপ। দ্বিতীয় তরঙ্গের উদ্ভব বৃহস্পতির জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্রে আটক পড়া ইলেকট্রন থেকে। বৃহস্পতির এই জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্রকে তুলনা করা চলে পৃথিবীর ভ্যান অ্যালেন বলয়ের সঙ্গে, যদিও পৃথিবীর চেয়ে সেটি অনেক বেশি জোরালো।

লাল ছোপ

বৃহস্পতি সম্পর্কে জানা গেল, বৃহস্পতির উপরিভাগের সমস্ত লক্ষণ ও চিহ্ন অনবরত বদলাচ্ছে। তার অক্ষ-আবর্তন অতি দ্রুত, তার একটি "দিন" ১০ ঘণ্টারও কম। এমনি অবস্থায় বৃহস্পতির উপরিভাগের কোনো লক্ষণ বা চিহ্ন স্থির হয়ে থাকতে পারে না—একপ্রান্তে দেখা দিয়ে সারা গায়ের ওপর দিয়ে সরতে সরতে অন্য প্রান্তে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু এতসব অদল বদলের মধ্যেও এমন কিছু কিছু লক্ষণ থেকে গিয়েছে যেগুলো কিছুটা স্থায়ী। এমনি একটি লক্ষণ হচ্ছে বৃহস্পতির বিরাট লাল ছোপ (Great Red Spot)। লম্বায় প্রায় ৫০,০০০ কিলোমিটার, ডিমের মতো আকারের এই ছোপটিকে দেখা যায় বৃহস্পতির দক্ষিণ গোলার্ধে ট্রপিক বলয়ে। দেখে মনে হয়, আকারে পৃথিবীর চেয়েও বড়ো কোনো এক কঠিন বস্তু তরল বায়ুমণ্ডলের ওপরে ভাসছে। পুরোপুরি কঠিন না হয়ে আধা-কঠিন কোনো বস্তু হওয়াও সম্ভব—আসলে যে কী তা সঠিকভাবে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

গড়ন

বিশাল এই গ্রহের গড়নটি কেমন সে-সম্পর্কে আমরা এখনো পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারি না। বর্ণালি বিশ্লেষণ থেকে আমরা শুধু বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ সম্পর্কে কিছু খবর জেনেছি। ভিতরকার খবরের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে নিছক তত্ত্বের ওপরে। মানুষের তৈরী অনুসন্ধানী ব্যোমযান বৃহস্পতির কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছতে পেরেছে মাত্র একটি—পায়োনিয়র-১১।
৬ই এপ্রিল তারিখে উৎক্ষিপ্ত এই ব্যোমযানটি ৩রা
ডিসেম্বর তারিখে ৪৩,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে ঘণ্টায় ১,৭১,০০০ কিলোমিটার বেগে (মানুষের তৈরী কোনো বস্তু এত বেগে আর কখনো ধাবিত হয়নি) বৃহস্পতি গ্রহকে পার হয়ে গিয়েছে। এখন

এই ব্যোমযানটি চলেছে শনিগ্রহের দিকে, সেপ্‌টেম্বরে সেখানে পৌঁছবার কথা।

বৃহস্পতির বর্ণালিতে চোখে পড়ার মতো কয়েকটি কালো কালো দাগ পাওয়া গিয়েছিল সেই ১৮৭২ সালেই। ১৯০৭ সালে লোয়েল এই দাগগুলোর গোটাকতক চমৎকার আলোকচিত্র নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার ব্যাখ্যার জন্য আরো অনেক কাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রুপার্ট উইল্‌ট দেখালেন, অ্যামোনিয়া ও মিথেন থেকে এই দাগগুলো এসেছে। অ্যামোনিয়া ও মিথেন, দুটিতেই আছে হাইড্রোজেন—প্রথমটিতে হাইড্রোজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন, দ্বিতীয়টিতে হাইড্রোজেনের সঙ্গে কার্বন। এ থেকে ধারণা করা হয়েছিল, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে প্রধানত রয়েছে অ্যামোনিয়া ও মিথেন। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী—এইচ স্পিনার্ড ও এল ট্র্যাফ্‌টন—বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া ও মিথেন রয়েছে মাত্র এক শতাংশ, নিওন তিন শতাংশ, হিলিয়াম ৩৬ শতাংশ, বাদবাকি ৬০ শতাংশ হাইড্রোজেন।

স্পিনার্ড- ট্র্যাফটন বিশ্লেষণ সবাই মেনে নিয়েছেন তা নয়। কেউ কেউ বলেন, বৃহস্পতি গ্রহে হাইড্রোজেনের শতকরা ভাগ আরো অনেক বেশি—আশির কাছাকাছি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বৃহস্পতি গ্রহের বেশির ভাগটাই হচ্ছে হাইড্রোজেন। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সমগ্র এই বিশ্বেও বেশির ভাগ পদার্থ হাইড্রোজেন। তাহলে পৃথিবী সমেত ভিতরের দিকের গ্রহগুলোতে হাইড্রোজেনের ভাগ এত কম কেন, তারও ব্যাখ্যা দিতে হয়। ভালো ব্যাখ্যা এখনো কেউ দিতে পারেন নি। তবে একটি ব্যাখ্যা এই যে সৌরমণ্ডল গড়ে ওঠার গোড়ার দিকে তীব্র সৌর বিকীরণ অপেক্ষাকৃত হালকা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণুগুলোকে বাইরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই ঠেলে দেওয়ার প্রক্রিয়া বৃহস্পতির এলাকায় অবশ্যই স্তিমিত হবার কথা।

আরো একটি কথা আছে। বৃহস্পতির ভর বিপুল, বৃহস্পতি থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ সেকেণ্ডে ৬০·২২ কিলোমিটার (পৃথিবী থেকে সেকেণ্ডে ১১·১৮ কিলোমিটার)। এ থেকে বোঝা যায় বৃহস্পতি গ্রহে গোড়ার দিকে যতো হাইড্রোজেন ছিল তার সবটাই গ্রহের টানে আটক পড়েছে, কিন্তু পৃথিবীর হাইড্রোজেনের সবটা আটক থাকেনি।

কারণ যাই হোক, বৃহস্পতির উপরিভাগে পাওয়া যাচ্ছে বেশির ভাইটাই হাইড্রোজেন। এখন স্থির করা দরকার গোলকের বাকি অংশের গড়ন একই রকম কিনা।

রুপার্ট উইল্ট বৃহস্পতির গড়নের একটি মডেল উপস্থিত করলেন। মডেলে বৃহস্পতিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে দেখানো হল। মধ্যভাগে রয়েছে ৫৭,৬০০ কিলোমিটার ব্যাসের শিলাময় ধাতব কেন্দ্র (core), তার ওপরে ২৫,৬০০ কিলোমিটার পুরু বরফের স্তর, তার ওপরে বায়ুমণ্ডল। বৃহস্পতির ব্যাস ১,৪২,০০০ কিলোমিটার। তার মানে, এই মডেলে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৬০,০০০ কিলোমিটার। অনুমান করা চলে, বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ থেকে হাজার তেরো কিলোমিটার নিচে চাপ এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে সেই অবস্থায় কোনো গ্যাস আর গ্যাসের মতো থাকতে পারে না।

এই মডেল কিন্তু সকলের স্বীকৃতি পেল না। মানচেস্টারের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডবলু র‍্যাম্‌জে ভিন্ন মডেল উপস্থিত করলেন। সেখানে বৃহস্পতির গোলকটি কেন্দ্র থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত আগাগোড়াই মুখ্যত হাইড্রোজেনে তৈরী। এই মডেলেও বাইরের বায়ুমণ্ডলে রয়েছে হাইড্রোজেন, তৎসহ হাইড্রোজেন থেকে উৎপন্ন মৌল পদার্থ অ্যামোনিয়া ও মিথেন এবং কিছু পরিমাণ হিলিয়াম। উপরিভাগ থেকে যতোই নিচের দিকে নামা যায় ততোই চাপ বাড়ে ততোই হাইড্রোজেনের ঘনত্ব বাড়ে, এবং হাইড্রোজেন হয়ে ওঠে কঠিন পদার্থের অনুরূপ। ৩,২০০ কিলোমিটার নিচে আসার পরে চাপের মাত্রা হয়ে দাঁড়ায় সমুদ্রতলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ২,০০,০০০ গুণ।

কঠিন হাইড্রোজেনের ঘনত্ব এখানে জলের ঘনত্বের তিনভাগের একভাগ।

৮,০০০ কিলোমিটার নিচে বায়ুমণ্ডলের চাপ আরো অনেক অনেক বেশি। এই অবস্থায় বড়ো রকমের একটা ব্যাপার ঘটে যায়। কঠিন হাইড্রোজেন হয়ে ওঠে ধাতুর লক্ষণবিশিষ্ট ধাতব হাইড্রোজেন।

তাহলে মডেলটি এই রকম দাঁড়ায়। মধ্যস্থলে রয়েছে ধাতব হাইড্রোজেনের একটি কেন্দ্র, ১,২১,৬০০ কিলোমিটার ব্যাসের। তার ওপরে ৮,০০০ কিলোমিটার পুরু কঠিন হাইড্রোজেনের একটি স্তর। তার ওপরে বায়ুমণ্ডল, অপেক্ষাকৃত অগভীর। পৃথিবী থেকে দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে এই বায়ুমণ্ডলেরই উপরিভাগ আমরা দেখি। উল্লেখ করা যেতে পারে, পায়োনিয়র-১১ বৃহস্পতির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বৃহস্পতির অভ্যন্তরের ধাতব হাইড্রোজেনের খবর পাঠিয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি তাঁদের গবেষণাগারে এই ধাতব হাইড্রোজেন তৈরি করতে পেরেছেন।

এই মডেলও সবাই স্বীকার করেন না। কারও কারও মতে বৃহস্পতির গোলকের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রয়েছে ধাতু ও শিলা, তার ওপরে ধাতব হাইড্রোজেনের স্তর, তার ওপরে কঠিন অথবা তরল হাইড্রোজেনের স্তর, তার ওপরে বায়ুমণ্ডল।

কোন মডেলটি ঠিক এখনো পর্যন্ত আমরা জানি না। আশা করা চলে, বৃহস্পতির এলাকায় অনুসন্ধানী ব্যোমযান পাঠিয়ে শীঘ্রই জানা যাবে। তবে এটুকু নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা চলে, বৃহস্পতি পৃথিবীর মতো আদৌ নয়, সূর্যের মতোও নয়, কোনো তারার মতোও নয়।

উপগ্রহ

বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা বারো (সম্প্রতি আরো একটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে)। তাদের মধ্যে আটটি খুবই ছোট। এত ছোট যে বড়ো দূরবীনের সাহায্যে আলোকচিত্র না তুললে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। বাকি চারটি আকারে চাঁদের মতো

বা চাঁদের চেয়েও বড়ো এবং যথেষ্ট উজ্জ্বল। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীন দিয়ে এই চারটি বড়ো উপগ্রহকেই দেখেছিলেন। এই চারটিকে তাই বলা হয় গ্যালিলীয় উপগ্রহ। তাদের নাম—আইও (Io), ইউরোপা (Europa), গানিমীড (Ganymede) ও ক্যালিস্টো (Callisto)। মূল গ্রহ থেকে দূরত্ব অনুসারে এক থেকে চার পর্যন্ত নম্বর দিয়ে গ্যালিলীয় উপগ্রহ চারটিকে উপস্থিত করা হয়। আর বাকি আটটিকে আবিষ্কারের কাল অনুসারে পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত নম্বর দিয়ে। এ থেকে বোঝা যায়, যে-উপগ্রহটি বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছে তার নম্বর কেন পাঁচ হল। উজ্জ্বল উপগ্রহগুলির কক্ষপথ বৃহস্পতির বিষুব-তলের প্রায় বরাবর, ফলে এই উপগ্রহগুলো বৃহস্পতির ছায়ার ঢাকা পড়ে, আবার বৃহস্পতির গায়ে ছায়া ফেলে বৃহস্পতিকে অতিক্রম করে।

বৃহস্পতির এই বারোটি উপগ্রহকে দেখে মনে হতে পারে তারা তিনটি আলাদা ঝাঁক বেঁধেছে। ১নং থেকে ৫নং পর্যন্ত প্রথম ঝাঁক, এরা রয়েছে মূল গ্রহের সবচেয়ে কাছে প্রায় তার বিষুব-তল বরাবর, কক্ষপথ বৃত্তাকার এবং গ্রহের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় দেড়দিন থেকে ষোলদিন পর্যন্ত। দ্বিতীয় ঝাঁক ৬নং, ৭নং ও ১০নং নিয়ে, এরা রয়েছে গ্রহ থেকে বেশ দূরে, কক্ষপথ উৎকেন্দ্রিক (অর্থাৎ মূলগ্রহ কক্ষের কেন্দ্রে নয়) এবং গ্রহের বিষুব-তলের সঙ্গে প্রায় ৩০ ডিগ্রী হেলানো, গ্রহের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় প্রায় আট মাস। তৃতীয় ঝাঁক ৮নং, ৯নং, ১১নং ও ১২নং নিয়ে, এরা রয়েছে গ্রহ থেকে আরো অনেক দূরে, কক্ষপথ উৎকেন্দ্রিক এবং গ্রহের বিষুব-তলের সঙ্গে প্রায় ১৫০ ডিগ্রী হেলানো (অর্থাৎ এই উপগ্রহগুলো উল্টো দিকে চলে, পশ্চিম থেকে পুবে না হয়ে পুব থেকে পশ্চিমে), গ্রহের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় প্রায় দু-বছর।

অনেকে বলেন, একেবারে বাইরের ঝাঁকের এই উপগ্রহগুলো হচ্ছে আসলে গ্রহের টানে বাঁধা পড়ে যাওয়া গ্রহাণু। আবার এমনও

হতে পারে, বাইরের দিকের ছুটি ঝাঁকের সাতটি উপগ্রহ হচ্ছে ছুটি বড়ো উপগ্রহের ভাঙা টুকরো।

বাইরের দিকের এই উপগ্রহগুলো সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। তবে এটুকু জানি যে উপগ্রহগুলো খুবই ছোট, লম্বায় দেড়শো কিলোমিটারের বেশি নয়, কোনোটি এমনকি মাত্র কুড়ি কিলোমিটার।

তবে বৃহস্পতির চারটি উজ্জ্বল উপগ্রহের আকার বেশ বড়ো—চাঁদের মতোই। সামান্য একটি বাইনোকুলার দিয়েও পৃথিবী থেকে এই চারটি উপগ্রহ দেখা যায়। এদের গ্রহণ ও মুক্তি, বৃহস্পতির চাকতির ওপর দিয়ে এদের সংক্রমণ, ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এমনই সুনিয়মিতভাবে ঘটে যে আগে থেকে হিসাব জানা থাকলে নির্ভুল সময়জ্ঞাপক ঘড়ির কাজ চলতে পারে। তবে বৃহস্পতির এই চারটি উজ্জ্বল উপগ্রহের ব্যাপার থেকে ১৬৭৫ সালে মস্ত এক আবিষ্কার ঘটে গিয়েছিল। তা হচ্ছে আলোর বেগ নির্ণয়। ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওলাউস্ রোয়েমার (Olaus Roemer) লক্ষ করেছিলেন পৃথিবী ও বৃহস্পতি যখন সূর্যের একই দিকে থাকে, তখন উপগ্রহের ব্যাপারগুলো যেন একটু আগে ঘটে যায়, পৃথিবী ও বৃহস্পতি যখন সূর্যের দুই দিকে তখন যেন একটু পরে। আগে হওয়াটাও আট মিনিটের, পরে হওয়াটাও আট মিনিটের। তখন তিনি ঘোষণা করলেন : আলোর বেগ সুনির্দিষ্ট এবং পৃথিবীর কক্ষের ব্যাস অতিক্রম করতে আলোর সময় লাগে প্রায় ১৬ মিনিট। আজ থেকে তিনশতাধিক বছর আগেকার কালের পক্ষে এই ঘোষণা রীতিমতো বৈপ্লবিক।

শনি

বৃহস্পতির পরে শনি। প্রাচীনদের কাছে এটি ছিল সবচেয়ে বাইরের দিকের গ্রহ। খালি চোখে ঝাপসা হলদে তারার মতো দেখায়। বৃহস্পতির মতো উজ্জ্বল নয় এই গ্রহটি এবং আকাশ-পথে তার চলাটাও অপেক্ষাকৃত আস্তে।

শনিগ্রহের বলয় আছে, আর এই বলয় থাকার জন্যই শনিগ্রহ অসাধারণ। বৃহস্পতি শনির চেয়ে বড়ো এবং সৌরমণ্ডলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, শুক্র ও মঙ্গল খালি চোখের দেখায় অনেক বেশি চমৎকার, কিন্তু শনি তবুও অতুলনীয়। শনির মতো বলয় অন্য কোনো গ্রহের নেই।

আবার এই বলয় থাকার জন্যই শনিগ্রহের গোলকের দিকে নজর পড়তে চায় না। এই গোলকের চেহারাও অনেকটা বৃহস্পতির মতো—তেমনি মেঘের বলয়, তেমনি ফুট ফুট দাগ ইত্যাদি। তবে শনিগ্রহে চাঞ্চল্য যেন একটু কম।

শনি বৃহস্পতির চেয়ে বেশ ছোট। শনির ব্যাস বিষুব এলাকায় ১,১৯,৩০০ কিলোমিটার (বৃহস্পতির ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার), মেরু এলাকায় ১,০৭,৭০০ কিলোমিটার (বৃহস্পতির ১,৩৩,৫০০ কিলো-মিটার)।

সূর্য থেকে শনির গড় দূরত্ব ১৪২ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবীতে আমরা আছি সূর্য থেকে ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। তার মানে, শনি সবসময়েই আমাদের থেকে অন্তত ১২৮ কোটি কিলোমিটার দূরে থেকে যায়। কক্ষপথে শনির বেগ সেকেণ্ডে ৯·৬৪ কিলোমিটার। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে শনির সময় লাগে ২৯½ বছর। বৃহস্পতির মতো শনির অক্ষ-আবর্তনও খুব দ্রুত, ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে একটি পাক সম্পূর্ণ হয়। আমরা জানি পৃথিবীর একটি পাক ২৪ ঘণ্টায় এবং পৃথিবীর একটি বছর ৩৬৫টি দিনে। শনির বেলায় হিসেব করলে দেখা যাবে, শনির একটি 'বছরে' 'দিনের' সংখ্যা হয় প্রায় ২৫,০০০।

আকারে শনির স্থান বৃহস্পতির পরেই। শনির আয়তন পৃথিবীর চেয়ে ৭০০ গুণেরও বেশি। কিন্তু শনির ভর বেশি মাত্র ৯৫ গুণ। তার কারণ শনির ঘনত্ব খুবই কম। জলের ঘনত্ব যদি হয় ১·০০ তাহলে শনির ঘনত্ব ০·৭১ (বৃহস্পতির ১·৩৩, পৃথিবীর ৫·৫২)। সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহের ঘনত্ব জলের চেয়ে কম নয়।

শনি থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ সেকেণ্ডে ৩৬'২৬ কিলোমিটার (বৃহস্পতি থেকে ৬০'২২ কিলোমিটার, পৃথিবী থেকে ১১'১৮ কিলোমিটার)। অর্থাৎ, শনির টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হলে সেকেণ্ডে ৩৬'২৬ কিলোমিটারের ছুট চাই। অর্থাৎ, টান যথেষ্টই বলতে হবে। কিন্তু শনিগ্রহের উপরিতলে কোনো মানুষ যদি গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার ওপরে কিন্তু টান তেমন প্রচণ্ড নয়। ভর যতো বেশি টান ততো বেশি, কথাটা ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দরকার যার ওপরে টান পড়ছে, টানের কেন্দ্র থেকে সে কতটা দূরে রয়েছে। যতো বেশি দূরে ততো কম টান। ধরা যাক, দুটি গোলক ভরে সমান কিন্তু আকারে ছোট-বড়ো। তাহলে ছোট গোলকটির উপরিতলে টান হবে বেশি, কেননা ছোট গোলকের বেলায় গোলকের কেন্দ্র থেকে গোলকের উপরিতলের দূরত্ব কম। শনির ভর যথেষ্ট বেশি, কিন্তু তার আকার যথেষ্ট বড়ো হওয়ার দরুন শনির কেন্দ্র থেকে তার উপরিতলের দূরত্বও যথেষ্ট বেশি। এই কারণে, পৃথিবীতে যে মানুষের ওজন ৯০ কিলোগ্রাম শনিগ্রহের উপরিতলে তার ওজন হবে ১০০ কিলোগ্রামের কিছু বেশি। একমাত্র বৃহস্পতি ছাড়া সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহেই পৃথিবীর মানুষের ওজন অস্বস্তিকর রকমের ভারী হতে পারে না।

এই দৃষ্টান্ত নিতান্তই কাল্পনিক। জলের চেয়েও যার ঘনত্ব কম এমনি এক গ্যাসের গোলকের উপরিতলে মানুষ গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। শনিগ্রহে যদি ঘাঁটি করতেই হয় তাহলে সেই ঘাঁটি হবে শনিগ্রহের কোনো উপগ্রহে।

গড়ন

শনি ও বৃহস্পতির গড়ন একই রকমের। রুপার্ট উইল্‌ট শনির একটি মডেল উপস্থিত করেছেন। তাতে রয়েছে প্রায় ৪৫,০০০ কিলোমিটার ব্যাসের কঠিন কেন্দ্রীয় এলাকা, তার ওপরে প্রায় ১০,০০০ কিলো-মিটার গভীর বরফের স্তর, তার ওপরে প্রায় ২৫,০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল। ডবলু র‍্যাম্‌জে বলেছেন, শনির ভরের ৬০ শতাংশ

হাইড্রোজেন। তার কেন্দ্রীয় এলাকায় রয়েছে ধাতব হাইড্রোজেন, ৪০,০০০ কিলোমিটার ব্যাসের। তার ওপরে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক হাইড্রোজেনের স্তর, প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটার পুরু। কেন্দ্রীয় এলাকার কাছে চাপের মাত্রা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ৫০ লক্ষ গুণ। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বলেছেন, শনির ভরের ৮০ শতাংশ হাইড্রোজেন। নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। যতোদিন-না অনুসন্ধানী ব্যোমযান শনিগ্রহে গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালাতে পারছে ততোদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

সূর্য থেকে বৃহস্পতি যতো দূরে শনি তার চেয়ে আরো বেশি দূরে। কাজেই শনি আরো বেশি শীতল। শনির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা −১৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া জমাট বেঁধে যায়। বৃহস্পতির মতো শনির বায়ুমণ্ডলেও বেশির ভাগটাই হাইড্রোজেন, তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ অ্যামোনিয়া মিথেন ও হিলিয়াম।

বৃহস্পতি গ্রহে যেমন একটি বিরাট লাল ছোপ আছে শনিগ্রহে তেমন কিছু নেই।

শনির বলয়

বলয়ের জন্যই শনির বিশেষ গৌরব। এই বলয় প্রথম দেখেছিলেন গ্যালিলিও, ১৬১০ সালের জুলাই মাসে। দেখে তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি। তাঁর ধারণা হয়েছিল সম্ভবত তিনটি গ্রহ একসঙ্গে দেখছেন—মাঝখানে একটি, তার দু-পাশে দুটি। কিন্তু বছর কয়েক পরে দেখলেন দু-পাশের দুই গ্রহ অদৃশ্য, শনিগ্রহ তেমনি একটিই আছে। কিছুকাল পরে আবার দেখলেন আগের মতো তিনটি গ্রহ। গ্যালিলিওর হাতে যে দূরবীন ছিল তা নিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু দেখা সম্ভব ছিল না। আরো জোরালো দূরবীন থাকলে তিনি বুঝতে পারতেন, আসলে তিনি দেখছেন বলয়-ঘেরা একটি গ্রহ এবং কক্ষপথে গ্রহের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে বলয়টিকে পৃথকভাবে দেখা যায় না।

ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স সর্বপ্রথম ব্যাপারটাকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করলেন। ১৬৫৯ সালে প্রকাশিত শনিগ্রহ সম্পর্কিত তাঁর বইয়ে তিনি বললেন, "একটি পাতলা চ্যাপ্‌টা বলয়ের দ্বারা শনিগ্রহ পরিবৃত। এই বলয় শনিগ্রহকে কোথাও স্পর্শ করছে না, বলয়টি রয়েছে ক্রান্তি-বৃত্তের কোনাকুনি।" একটি ছবি এঁকে তিনি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন, শনিগ্রহ যখন সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে তখন পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে ২৮ ডিগ্রী হেলানো তার বলয়টিকে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে কখন কি-রকম দেখায়।

শনিগ্রহের বলয় তিনটি। একেবারে বাইরের দিকে পাঁশুটে সাদা বলয়—'ক' (A)। মাঝখানে উজ্জ্বল সাদা বলয়—'খ' (B)। ভিতরের দিকে খানিকটা ঝাপসা খানিকটা অস্পষ্ট নীলচে ধূসর বা
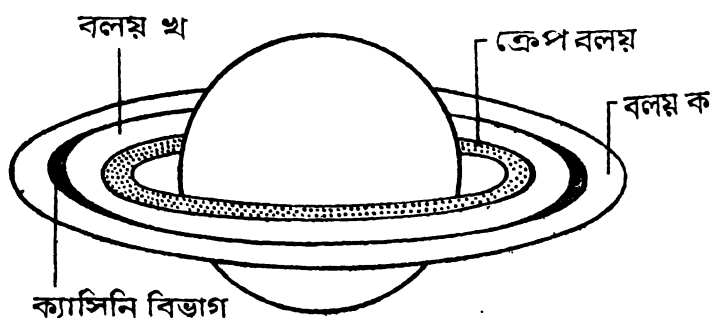
চিত্র ৩২। শনির বলয়।

স্লেটরঙের বলয়—'গ' (C) বা ক্রেপ্‌ বলয় (Crepe Ring)। 'ক' ও 'খ' বলয়ের মধ্যে খানিকটা ফাঁক রয়েছে। ১৬৭৫ সালে প্যারিসের যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই ফাঁক আবিষ্কার করেন তাঁরই নামে তার নামকরণ হয়েছে—'ক্যাসিনির বিভাগ' (Cassini's Division)। 'খ' ও 'গ' বলয়ের মধ্যে চোখে পড়ার মতো বিভাগ নেই।

'ক' বলয়ের বাইরের দিকের ব্যাস ২,৭২,৩০০ কিলোমিটার, ভিতরের দিকের ব্যাস ২,৩৯,৬০০ কিলোমিটার। এ থেকে হিসেব করে বার করা চলে এই বলয় ১৬,৩৫০ কিলোমিটার চওড়া। 'খ'

বলয়ের বাইরের দিকের ব্যাস ২,৩৪,২০০ কিলোমিটার, ভিতরের দিকের ব্যাস ১,৮১,১০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ এই বলয় ২৬,৫৫০ কিলোমিটার চওড়া। আর দুই বলয়ের মাঝখানের ফাঁক বা ক্যাসিনির বিভাগ ২,৭০০ কিলোমিটার চওড়া। 'গ' বা ক্রেপ বলয়ের ভিতরের দিকের ব্যাস ১,৪৯,৩০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ এই বলয় ১৫,৯০০ চওড়া। মেরু-অঞ্চলে শনিগ্রহের ব্যাস ১,১৯,৩০০ কিলোমিটার। তার মানে 'গ' বলয় ও শনিগ্রহের উপরিতলের মধ্যে ফাঁক রয়েছে ১৫,০০০ কিলোমিটারের। আমরা জানি পৃথিবীর ব্যাস মেরু অঞ্চলে ১২,৭৫৬ কিলোমিটার। তাহলে দেখা যাচ্ছে শনিগ্রহের উপরিতল ও তার বলয়ের মাঝখানের ফাঁকে আস্ত একটি পৃথিবী ধরে যায়।

শনির এই তিনটি বলয় যতোই চওড়া হোক, অন্যদিকে খুবই পাতলা। সম্ভবত ১০ কিলোমিটার পুরু, কিংবা তারও কম।

যতোদূর জানা গিয়েছে, শনির এই তিনটি বলয়ের উপাদান সূক্ষ্ম ধুলোর কণা থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো পাথরের টুকরো পর্যন্ত। একের সঙ্গে অপরের অনবরত ঠোকাঠুকি হবার ফলে বড়ো টুকরো-গুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

বলয় তিনটি শনির বিষুব-বরাবর। এই তিনটি বলয়ের অজস্র কণা ও টুকরো প্রত্যেকেই এক-একটি উপগ্রহের মতো শনির চারদিকে ঘুরছে। ব্যাপারটা যে তাই বর্ণালি পর্যবেক্ষণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলয়ের যে অংশ গ্রহ থেকে যতো বেশি দূরে তার চক্রবেগ ততো কম। অর্থাৎ, বলয়ের বাইরের দিকের অংশ আস্তে ঘোরে, ভিতরের দিকের অংশ জোরে। বলয়ের উদ্ভব কি ভাবে? নির্দিষ্ট-ভাবে কিছু বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন, শনির কোনো এক উপগ্রহ শনিগ্রহের খুবই কাছাকাছি চলে এসেছিল। তারই ফলে মহাকর্ষের প্রচণ্ড শক্তির ক্রিয়ায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

মূলগ্রহের যা ব্যাস তার আড়াই গুণের মধ্যে যদি কোনো উপগ্রহ এসে পড়ে তাহলে এই ব্যাপারটি ঘটতে পারে। এই কারণে ঘটে যে এই অবস্থায় উপগ্রহের সামনের দিকে যতোখানি টান পড়ে, পিছনের

দিক আরও দূরে থাকার দরুন সেখানে পড়ে আরও কম। টানের কম-বেশি থেকেই শুরু হয় ভাঙন। চাঁদ যদি কোনো কারণে পৃথিবীর খুবই কাছাকাছি চলে আসে তাহলে চাঁদেরও এই দশা হতে বাধ্য। অর্থাৎ, চাঁদ তখন হয়ে উঠবে অজস্র কণা ও টুকরো দিয়ে গড়া পৃথিবীকে ঘিরে থাকা একটি বলয়।

উপগ্রহ

শনিগ্রহের দশটি উপগ্রহ। শনিগ্রহ থেকে দূরত্ব অনুসারে এই দশটির নাম : য়ানুস (Janus), মিমাস (Mimas), এনসেলাডাস (Enceladus), টেথিস (Tethys), দিওন (Dione), রিয়া (Rhea), টাইটান (Titan), হাইপারিয়ন (Hyperion), আয়াপিটাস (Iapetus) ও ফিবি (Phoebe)।

য়ানুস রয়েছে শনিগ্রহ থেকে তার ব্যাসের ১.৩ গুণ দূরে। আর সামান্য একটু কাছে থাকলে এই উপগ্রহটিও ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। ফিবি রয়েছে শনিগ্রহের ব্যাসের ১০০ গুণ দূরে।

সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ হচ্ছে টাইটান, তার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকের কিছু কম। সৌরমণ্ডলে এইটিই একমাত্র উপগ্রহ যার বায়ুমণ্ডল (মিথেন) আছে। মিথেন দিয়ে গড়া টাইটানের এই বায়ুমণ্ডল থাকতে পেরেছে সম্ভবত এই কারণে যে উপগ্রহটি এতই শীতল যে সেখানে গ্যাসের কণিকার চঞ্চলতাও কম। ফলে কিছু কণিকা আটক পড়ে গিয়েছে। হিসেব করে দেখানো চলে, এই উপগ্রহের তাপমাত্রা যদি – ৭৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হত তাহলেই মিথেন গ্যাস সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যেত।

টাইটানকে বাদ দিলে অন্য সব উপগ্রহের ব্যাস ১৩০০ কিলোমিটারেরও কম। ফিবি সবচেয়ে ছোট, সেটির মাপ এদিকে-ওদিকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার।

ইউরেনাস

প্রাচীনকালে শনিকে মনে করা হত সবচেয়ে বাইরের দিকের গ্রহ। আরও দূরে কোনো গ্রহ থাকতে পারে একথা কেউ ভাবত না। শনি পেরিয়ে অনেক দূরে ছিল শুধু স্থির নক্ষত্রদের গোলক, আর কিছু নয়। তাছাড়া, সূর্য চন্দ্র ও পাঁচটি গ্রহ নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাত। সাত হচ্ছে পূত সংখ্যা। অতএব সবকিছু ঠিকঠাক মিলে গিয়েছিল, নতুন করে খোঁজ নেবার কিছু ছিল না।

কাজেই ১৭৮১ সালে উইলিয়ম হার্শেল যখন নতুন একটি গ্রহ আবিষ্কার করে বসলেন সেটা হয়ে দাঁড়াল প্রচণ্ড এক অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। হার্শেল আবিষ্কৃত নতুন এই গ্রহটিকে এখন আমরা বলি ইউরেনাস। হার্শেল কিন্তু নতুন একটি গ্রহ আবিষ্কার করার জন্য আকাশের দিকে তাকান নি। নিজের তৈরী দূরবীন দিয়ে তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেয়ে যান ইউরেনাসকে। প্রথমে বুঝতে পারেন নি জিনিসটা কী। তারা নয়, কেননা পুরো একটি চাকতি দেখা যাচ্ছে। ধরে নিলেন, ধূমকেতু। পরে গণিত-বিদরা অঙ্ক কষে তাঁর কক্ষ নির্ণয় করলেন। তখন দেখা গেল, ধূমকেতু হতেই পারে না—পুরোমাত্রায় গ্রহ। হার্শেল বুঝতে পারলেন, সৌর-মণ্ডলের নতুন এক গ্রহ তিনি আবিষ্কার করেছেন। সূর্য থেকে গ্রহটির গড় দূরত্ব ২৮৬ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার।

অবস্থা ভালো থাকলে ইউরেনাসকে খালি চোখে দেখা যায়। সবচেয়ে কম যতোটুকু প্রভা থাকলে খালি চোখে দেখা যেতে পারে ইউরেনাস রয়েছে সেই মাত্রায়। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই ইউরেনাসকে গ্রাহের মধ্যে আনেন নি।

ইউরেনাস একটি বৃহৎ গ্রহ। যদিও বৃহস্পতি বা শনির চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়ো। ইউরেনাসের ব্যাস বিষুব এলাকায় ৪৭,১০০ কিলোমিটার, মেরু এলাকায় ৪৩,৮০০ কিলোমিটার। ইউরেনাসের ঘনত্ব (জলের ঘনত্ব এক ধরে) ১·৭১।

অর্থাৎ, ইউরেনাসের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশি, কিন্তু ইউরেনাসের ভর পৃথিবীর চেয়ে বেশি মাত্র সাড়ে চৌদ্দ গুণ। ইউরেনাস থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ সেকেণ্ডে ২২·৫ কিলোমিটার। কিন্তু ইউরেনাসের উপরিতলে মহাকর্ষের টান পৃথিবীর চেয়ে সামান্যই বেশি। কোনো মানুষ যদি ইউরেনাসের উপরিতলে দাঁড়ায় তাহলে তার ওজন ছয় কিলোগ্রামের মতো বাড়ে।

বলা বাহুল্য, ইউরেনাসের উপরিতলে কোনো মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। কেননা, বৃহস্পতি ও শনির মতো এই গ্রহেরও উপরিতল গ্যাসের।

ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা −১৮২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই প্রচণ্ড শীতলতায় অ্যামোনিয়া জমাট বেঁধে গিয়েছে। বর্ণালি বিশ্লেষণেও পাওয়া যায় শুধু মিথেন। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে আছে।

ইউরেনাসের মডেল সম্পর্কে বলা হয়, এই গ্রহের মধ্যস্থলে আছে প্রায় ২২,০০০ কিলোমিটার ব্যাসের শিলাময় কেন্দ্র, তার ওপরে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার গভীর বরফ, তার ওপরে প্রায় ৫,০০০ কিলো-মিটার বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল।

বৃহস্পতি ও শনির মতো ইউরেনাসও নিজের অক্ষের চারদিকে অতিদ্রুত পাক খায়। ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটে এক একটি পাক। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে ইউরেনাসের সময় লাগে ৮৪ বছর। তার মানে ইউরেনাসের একটি বছরে (অর্থাৎ সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে যে সময় নেয় সেই সময়ে) দিনের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬?,০০০।

ইউরেনাসের অক্ষটি বড়ো অদ্ভুত রকমের হেলে আছে। আমরা জানি, অধিকাংশ গ্রহের অক্ষ তার কক্ষতলের ওপরে সিধে খাড়া অবস্থায় নেই, কিছুটা হেলে আছে। পৃথিবীর অক্ষ হেলে আছে ২৩½ ডিগ্রী, মঙ্গলের ২৪ ডিগ্রী, বৃহস্পতির ৩ ডিগ্রী, শনির ২৬½ ডিগ্রী। আর ইউরেনাসের ৯৮ ডিগ্রী, এক সমকোণের চেয়েও বেশি (৯০

ডিগ্রীতে এক সমকোণ)। তার মানে গ্রহটিকে আমরা বিপরীত দিকে বা পুব থেকে পশ্চিমে পাক খেতে দেখি।

উপগ্রহ

ইউরেনাসের উপগ্রহ আছে পাঁচটি। ১৭৮৭ সালে হার্শেল আবিষ্কার করেন সবচেয়ে দূরের দুটি উপগ্রহ—ওবেরন (Oberon) ও টাইটানিয়া (Titania)। ১৮৫১ সালে উইলিয়ম লাসেল আবিষ্কার করেন আরও ভিতরের দিকে তার পরের দুটি উপগ্রহ—আম্‌ব্রিয়েল (Umbriel) ও এরিয়েল (Arieal)। ১৯৪৮ সালে জি পি কুইপার আবিষ্কার করেন গ্রহ থেকে সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ মিরাণ্ডা (Miranda)। পাঁচটি উপগ্রহই রয়েছে ইউরেনাসের বিষুব-বরাবর, তাদের কক্ষ বৃত্তাকার। সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ মিরাণ্ডার দূরত্ব গ্রহ থেকে ১,২১,৬০০ কিলোমিটার, সবচেয়ে দূরের উপগ্রহ ওবেরনের দূরত্ব গ্রহ থেকে ৫,৮২,৪০০ কিলোমিটার।

উপগ্রহগুলির আকার সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। যতোদূর হিসেব করা গিয়েছে, এরিয়েল, টাইটানিয়া ও ওবেরনের ব্যাস ৩,০০০ থেকে ২,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে, আম্‌ব্রিয়েলের ব্যাস ১,০০০ থেকে ১,৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে, মিরাণ্ডার ব্যাস ৩০০ থেকে ৩৫০ কিলোমিটারের মধ্যে।

ইউরেনাসের উপগ্রহের সংখ্যা সম্ভবত এই পাঁচটিতেই শেষ নয়, আরো আছে। দুজন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী* ঘোষণা করেছেন, ইউরেনাসের আরো একটি উপগ্রহ আছে এবং এই ষষ্ঠ উপগ্রহটির অবস্থান মিরাণ্ডার চেয়েও কাছে, ব্যাস ৩০ কিলোমিটার ও কক্ষ আবর্তনের সময় প্রায় ১০ ঘণ্টা। দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী ঘোষণা

করেছেন, শনির মতো ইউরেনাসেরও সম্ভবত একটি বলয় আছে। সম্ভবত এই বলয়টি অনেকগুলো টুকরো টুকরো উপগ্রহ দিয়ে তৈরী।

স-মনুষ্য ব্যোমযান ইউরেনাসের এলাকায় পৌঁছতে পারবে, এমন কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই। দূর ভবিষ্যতের কথা যদি ভাবা যায় তাহলে হয়তো ইউরেনাসের কোনো একটি উপগ্রহে মানুষের ঘাঁটি তৈরি হবে। তবে আশা করা চলে, অনুসন্ধানী একটি ব্যোমযান কিছু কালের মধ্যে ইউরেনাসের এলাকায় হাজির হয়ে ইউরেনাসের খবর ও ছবি পাঠাতে পারবে। আর তখনই নিশ্চিতভাবে জানা যাবে ইউরেনাসের প্রকৃতই একটি বলয় আছে কিনা এবং তার উপগ্রহের সংখ্যা কত।

নেপচুন

ইউরেনাস ছাড়িয়ে আরো কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে আরো একটি বৃহৎ গ্রহ—নেপচুন। গ্রহটি আবিষ্কৃত হয় ১৮৪৬ সালে, কিন্তু গ্রহটি যে আছে সেই খবর আরো আগেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। কেমন করে?

ইউরেনাস গ্রহটিকে কিছুকাল পর্যবেক্ষণের পরে গণিতবিদরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, ইউরেনাসের চলার পথ অঙ্কের হিসেব অনুযায়ী যা হওয়া উচিত বাস্তবে তা নয়, একটু যেন সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ, অন্য কোনো একটা টান এসে পড়ছে ইউরেনাসের ওপরে। এখানে একটি কথা ভালো করে বোঝা দরকার। প্রত্যেকটি গ্রহ অন্য প্রত্যেকটি গ্রহকে টানে। কাজেই কোনো একটি গ্রহের চলার পথ হিসেব করতে হলে সেই গ্রহের ওপরে অন্য সমস্ত গ্রহের টানও হিসেবে রাখা দরকার। যেমন, পৃথিবীর চলার পথের ওপরে বিশেষ রকমের টান পরে শুক্রের, মঙ্গলের ও এমনকি বৃহস্পতির। তেমনি, ইউরেনাসের চলার পথের ওপরে সবচেয়ে বেশি টান পড়ে বৃহস্পতির ও শনির। এই সমস্ত টান হিসেবে এনেও দেখা গেল ইউরেনাসের চলার পথে গরমিল থেকে যাচ্ছে।

তখন কথা উঠল, নিশ্চয়ই আরো একটি অজানা গ্রহ থেকে গিয়েছে আর তারই টানে ইউরেনাসের চলার পথে এই গরমিল। গণিতবিদরা অঙ্ক কষে হুবহু স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন, যেখানে এই নতুন গ্রহটি থাকার কথা। এবং সেই নির্দিষ্ট স্থানেই ১৮৪৬ সালে গ্রহটি আবিষ্কৃত হল। নাম দেওয়া হল নেপচুন।

দেখা গেল নেপচুন একটি বৃহৎ গ্রহ। সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কোটি কিলোমিটার। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে গ্রহটির সময় লাগে ১৬৪৪/৫ বছর। অক্ষের চারদিকে একটি পাক সম্পূর্ণ হতে কত সময় লাগে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। কেউ বলেন ১৫.৮ ঘণ্টা, কেউ বলেন ১৪ ঘণ্টা।

নেপচুনের গড়ন ইউরেনাসের মতোই। খালি চোখে এই গ্রহটিকে দেখা যায় না।

গ্রহটির ব্যাস ৪৮,৪০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ, ইউরেনাসের চেয়েও এই গ্রহটি বড়ো।

নেপচুনের উপগ্রহ দুটি—ট্রাইটন (Triton) ও নিরিইদ (Nereid)। প্রথমটি আবিষ্কার করেন লাসেল ১৮৪৬ সালে, দ্বিতীয়টি কুইপার ১৯৪৯ সালে।

সৌরমণ্ডলে ট্রাইটন হচ্ছে একটি সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে বেশি ভরের উপগ্রহ। তার ব্যাস ৫,০০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি, ঘনত্ব (জলের ঘনত্ব এক ধরে) পাঁচের ওপরে। তার মানে এই উপগ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ বেগ যথেষ্ট বেশি। ফলে পাতলা একটি বায়ুমণ্ডল এই উপগ্রহে থেকে গিয়েছে।

নিরিইদের ব্যাস ৩০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি। গ্রহের চারদিকে এই উপগ্রহটি ঘোরে ভীষণরকমের উপবৃত্তাকার একটি কক্ষে। ফলে উপগ্রহটি কখনো চলে আসে গ্রহ থেকে ১৪ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে, কখনো চলে যায় গ্রহ থেকে ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার দূরে।

প্লুটো

নেপচুন আবিষ্কৃত হবার পরেও কিন্তু দেখা গেল বাইরের দিকের গ্রহগুলোর চলাফেরায় কিছু গরমিল থেকেই যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, সৌরমণ্ডলে কি আরো একটি গ্রহ থেকে গিয়েছে? অনুসন্ধানের ভার হাতে নিলেন স্বনামখ্যাত পার্সিভাল লোয়েল, যিনি মঙ্গলগ্রহের খাল আবিষ্কার করেছিলেন। লোয়েল ছিলেন উঁচুদরের গণিতবিদও। অঙ্ক কষে তিনি স্থির করলেন নতুন গ্রহটির কোথায় থাকা উচিত। কিন্তু শক্তিশালী দূরবীন হাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্দিষ্ট স্থানে গ্রহটি খুঁজে পেলেন না। কিন্তু সেই নতুন গ্রহটি খুঁজে পাওয়া গেল সেই নির্দিষ্ট স্থানের কাছেই, ১৯৩০ সালে, লোয়েলের মৃত্যুর চোদ্দবছর পরে। লোয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড টমবাউ গ্রহটি আবিষ্কার করলেন। নাম দেওয়া হল প্লুটো।

সূর্য থেকে ৫৯১ কোটি কিলোমিটার দূরের এই গ্রহটির অনেক কিছুই অদ্ভুত। গ্রহটি মোটেই বৃহৎ নয়, আকারে মঙ্গলগ্রহের মতো। তার কক্ষপথ অনেক বেশি হেলানো ও অনেক বেশি উপবৃত্তাকার। সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছে থাকার সময়ে প্লুটো নেপচুনের চেয়েও ভিতরে চলে আসে।

কেউ কেউ বলেন, প্লুটো আসলে গ্রহ নয়। নেপচুনের একটি উপগ্রহ যে-ভাবেই হোক নেপচুনের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে এবং আলাদা একটি গ্রহ হয়ে উঠেছে।

সৌরমণ্ডলের ভাঙচুর

গ্রহাণু

সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ২৩ কোটি কিলোমিটার, বৃহস্পতির দূরত্ব প্রায় ৭৮ কোটি কিলোমিটার। পর পর দুই গ্রহের মাঝখানে এই মস্ত ফাঁক থাকাটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কেপ্‌লার থেকে শুরু করে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীই ভাবতেন মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে আরো একটি গ্রহ থেকে গিয়েছে। তারপরে ১৭৭২ সালে যখন বোডের সূত্র (Bode's Law) প্রকাশিত হয় তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়ে ওঠে।

বোডের সূত্রে সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্বকে একটা অঙ্কের নিয়মে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কতকগুলো সংখ্যা ধরা যাক: ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮ ও ৯৬। ৩ সংখ্যাটির পরে প্রত্যেকটি সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে হয়ে চলেছে। এবারে প্রত্যেকটি সংখ্যার সঙ্গে ৪ যোগ করা যাক। তাহলে পাওয়া যাচ্ছে ৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২ ও ১০০। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে যদি ধরা হয় ১০ তাহলে পর পর এই সংখ্যাগুলো দিয়ে পর পর গ্রহের দূরত্বকে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন, বুধের দূরত্ব ৩·৯, শুক্রের ৭·২, মঙ্গলের ১৫·২, বৃহস্পতির ৫২·০ ও শনির ৯৫·৪। ন'বছর পরে ইউরেনাস আবিষ্কৃত হয়। বোডের সূত্র অনুসারে ইউরেনাসের দূরত্ব ১৯৬, আর আসল দূরত্ব পাওয়া গেল ১৯১·৮। সূত্রটি খেটে যাচ্ছে। কিন্তু এমন একটি গ্রহ পাওয়া যাচ্ছে না যার দূরত্বকে ২৮ সংখ্যাটির দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সূত্রের এই একটা জায়গায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তখন এই হারানো গ্রহটির সন্ধান করার জন্য নানা দেশের বিজ্ঞানীরা জোর তল্লাসী শুরু করে দিলেন।

সিসিলির পালের্মো মানমন্দিরের অধ্যক্ষ পিয়াৎসি (Piazzi) সে-

সময়ে তারার তালিকা করার জন্য আকাশে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। ১৮০১ সালের ১লা জানুআরি তারিখে তাঁর নজরে এসে গেল এমন একটি তারা যার চলন ঠিক তারার মতো নয়। কৌতূহলী হয়ে তিনি এই তারার চলন ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। পর্যবেক্ষণ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেল তাই নিয়ে অঙ্ক কষে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গাউস (Gauss) ঘোষণা করলেন, জ্যোতিষ্কটি আসলে তারা নয়—গ্রহ। এক বছর পরে গ্রহটিকে আবার দেখতে পাওয়া গেল। সূর্য থেকে তার দূরত্ব হিসেব করে দেখা গেল, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে যদি ১০ ধরা হয় তাহলে এই গ্রহটির দূরত্ব দাঁড়ায় ২৭.৭। বোডের সূত্রে বলা হয়েছে ২৮, পাওয়া যাচ্ছে ২৭.৭—অর্থাৎ, বোডের সূত্র চমৎকার খেটে গেল। সৌরমণ্ডলে আর কোনো ফাঁক থাকল না, সম্পূর্ণ চিত্রটিই পাওয়া গেল যেন।

পিয়াৎসি এই গ্রহের নাম দিলেন সিরিস (Ceres)। সূর্য থেকে গ্রহটির আসল দূরত্ব ৪৩,৩২,০০,০০০ কিলোমিটার। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় ৪.৬ বছর।

কিন্তু গ্রহটির ব্যাস ৮০০ কিলোমিটারেরও কম। অন্য সব গ্রহের পাশে এটিকে কিছুতেই গ্রহ বলে ভাবা যায় না। আরো অনুসন্ধান চলতে লাগল। ১৮০২ সালের মার্চে আবিষ্কৃত হল সিরিসের মতোই দ্বিতীয় আরেকটি গ্রহ। নাম দেওয়া হল পালাস (Pallas)। তার পরের পাঁচ বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত হল আরো দুটি—জুনো (Juno) ও ভেস্তা (Vasta)। এই চারটিকে গ্রহ আর বলা গেল না, বলতে হল গ্রহাণু।

এই চারটিতেই শেষ নয়। ১৮৪৫ সালে আবিষ্কৃত হল পঞ্চম গ্রহাণু—ভেস্তা থেকে দূরে, জুনো থেকে কাছে। নাম দেওয়া হল অস্ট্রিয়া (Astraea)। আকারে আরো ছোট, ব্যাস মাত্র ১৬০ কিলোমিটার। ১৮৪৭ সালে আবিষ্কৃত হল আরো তিনটি—হেবে (Hebe), আইরিস (Iris) ও ফ্লোরা (Flora)। ১৮৪৮ সালে আরো একটি। ১৮৪৯ সালে আরো একটি। তারপর থেকে প্রতি

বছরেই আরো এক বা একাধিক। ১৮৭০ সালে গ্রহাণুর সংখ্যা দাঁড়াল ১০৯, আরো কুড়ি বছরের মধ্যে ৩০০।

১৮৯১ সাল থেকে শুরু হল বহুক্ষণ ধরে তোলা ক্যামেরার আলোকচিত্রের সাহায্যে গ্রহাণুর সন্ধান। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রহাণুর
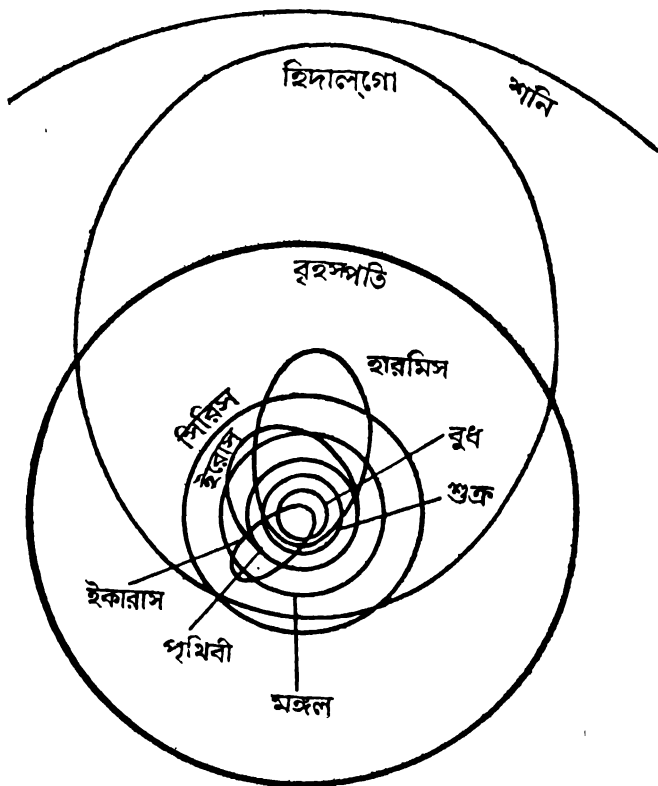
চিত্র ৩৩। কয়েকটি গ্রহাণুর কক্ষ

সন্ধান পাওয়া যেতে লাগল। আর শুধু তো সন্ধান পাওয়া নয়, তাদের চলার পথ ইত্যাদির মাপজোক নেওয়াও।

গোড়ার দিকে এমনি সন্ধান পাওয়া গ্রহাণুর সংখ্যা দাঁড়াল ১,৭৫০-এরও বেশি। এখন এই সংখ্যা দু-হাজার ছাড়িয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে একলক্ষ গ্রহাণু আছে।

প্রত্যেকটির হদিশ নেওয়া বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। সেজন্য অনেক আঁক কষতে হয়। হালের ইলেকট্রনিক কম্পিউটরে অবশ্য কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা নাম দেওয়াটাও শক্ত ব্যাপার। গোড়ার দিকে ছিল পুরাণের নাম, তারপরে আসতে লাগল বন্দরের নাম, ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের স্ত্রীর নাম, জাহাজ-কোম্পানীর নাম, উলটে নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, এমনকি মিষ্টান্নের নাম।

সিরিস, পালাস, জুনো ও ভেস্তা—এই চারটিকে বলা হয় 'বৃহৎ চার'। জুনোর ব্যাস প্রায় ২৪০ কিলোমিটার। কিন্তু বৃহৎ চারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো কোনো গ্রহাণুর ব্যাস জুনোর চেয়ে বেশি। যেমন, ১০নং গ্রহাণু হাইজিয়া (Hygeia), তার ব্যাস ৩২৫ কিলোমিটার। তবে এই মাপগুলো পুরোপুরি সঠিক এমন কথা বলা চলে না। গ্রহাণুর ব্যাস নির্ধারণ করা খুবই শক্ত। তবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সিরিস হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো গ্রহাণু, তার ব্যাস ৬৮৩ কিলোমিটার। তারপরে ভেস্তা, ব্যাস ৫৯২ কিলোমিটার। সিরিসের চেয়ে ভেস্তা সূর্যের আরো কাছে, ফলে আমাদেরও আরো কাছে। সূর্য থেকে ভেস্তার গড় দূরত্ব ৩৫,০৮,৮০,০০০ কিলোমিটার এবং একমাত্র এই গ্রহাণুটিকেই খালি চোখে দেখা যেতে পারে।

কোনো গ্রহাণুই আকারে এমন বড়ো নয় যে সেখানে ছিটেফোঁটা বায়ুমণ্ডলও থাকতে পারে। এমনকি আকারে গোলকের মতোও সম্ভবত নয়। নিছক বস্তুপিণ্ড মাত্র। এই লাখখানেক গ্রহাণুকে একসঙ্গে তাল পাকালেও চাঁদের মতো আকারের একটি গ্রহ পাওয়া যাবে না। তবুও কিন্তু গ্রহের মতোই গ্রহাণুও নিজের অক্ষের চার-দিকে পাক খাচ্ছে এবং পাক খেতে খেতে নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

অধিকাংশ গ্রহাণুর কক্ষ বৃত্তাকার, ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে সামান্য হেলানো। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় সাড়ে তিন থেকে ছ' বছর। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, হিদাল্গো

(Hidalgo)। এই গ্রহাণুর কক্ষ ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে ৪৩ ডিগ্রী হেলানো এবং এতই উপবৃত্তাকার যে অপসূরে থাকার সময়ে শনিগ্রহের কক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। অ্যাদোনিস (Adonis), অ্যাপোলো (Apollo) ও হারমিস (Hermis) অনুসূরে থাকার সময়ে চলে আসে শুক্রগ্রহের কক্ষের ভিতরে। অন্য একটি গ্রহাণু, ইকারাস, আসে আরো ভিতরে—এমনকি বুধগ্রহেরও কক্ষের ভিতরে। সূর্য থেকে তখন তার দূরত্ব হয় মাত্র ২,৮৮,০০,০০০ কিলোমিটার। অপসূরে চলে যায় মঙ্গলের কক্ষ ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গ্রহাণুর কক্ষ সবসময়ে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানের এলাকায় থাকে না। ভিতরের দিকে কখনো কখনো বুধ-গ্রহের চেয়ে ভিতরে, বাইরের দিকে কখনো কখনো শনিগ্রহের কাছা-কাছি। তাহলে এমন কি হতে পারে ভিতরের দিকে আসার সময়ে কোনো গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা আছে? ৪৩৩ নং গ্রহাণু ইরোস (Eros) ১৯৩১ সালে পৃথিবী থেকে ২,৭২,০০,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়েছিল। এই গ্রহাণুর চেহারা ডিমের মতো, লম্বায় প্রায় ৩০ কিলোমিটার চওড়ায় প্রায় ৮ কিলোমিটার। ৭১৯ নং গ্রহাণু অ্যালবার্ট (Albert, ব্যাস ৫ কিলোমিটার) ১৯১১ সালে এসেছিল পৃথিবীর ৩,২০,০০,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে। ১২২১নং গ্রহাণু অ্যামোর (Amor, লম্বায় ৮ কিলোমিটার) এসেছিল ১,৬০,০০,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে। ১৯৩২ সালে অ্যাপোলো এসেছিল ১,১২,০০,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে। অ্যাদোনিস এসেছিল ২০,০০,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে। হারমিস এসেছিল ৭,৭৬,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে (জানুআরি, ১৯৩৮)।

ধাক্কা কোনো সময়েই লাগেনি। ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা খুবই কম—বলা যেতে পারে, কোটিতে এক। তবে কখনো যদি ধাক্কা লাগে, যতো ছোট গ্রহাণুই হোক, ক্ষতির সম্ভাবনা প্রচুর। ১৯০৮ সালে একটি উল্‌কা (ব্যাস সম্ভবত আধ কিলোমিটারেরও কম) পড়েছিল সাইবেরিয়ায়, তার ফলে বহু বর্গ-কিলোমিটার ব্যাপী এলাকা

বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এদিক থেকে বড়গোছের একটি উল্‌কা আর ছোটগোছের একটি গ্রহাণুর মধ্যে কোনো তফাত নেই।

থিউলি (Thule) সবচেয়ে বাইরের গ্রহাণু (সূর্য থেকে ৬৪ কোটি কিলোমিটার দূরে)। পরে আরও দূরের গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নাম অ্যাকিলিজ (Achilles)। দেখা গেল, এই গ্রহাণু সূর্যের চারদিকে ঘোরে বৃহস্পতির কক্ষে। পরে বৃহস্পতির কক্ষে পরিক্রমারত আরো তেরটি গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলোকে একযোগে বলা হয় ট্রোজান (Trojans)। দুটি দলে ভাগ হয়ে এই ট্রোজানরা বৃহস্পতির আগু পিছু একই কক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। ন'টি আছে বৃহস্পতির সামনে, পাঁচটি পিছনে।

যাই হোক, এই যে নানা আকারের লাখখানেক গ্রহাণু, এগুলো আসলে কী? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পাথরের টুকরো মাত্র। তাঁদের আরও ধারণা, সৌরমণ্ডলের গোড়ার অবস্থায় আস্ত একটি গ্রহ সম্ভবত বৃহস্পতির টানের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। তারই খণ্ডবিখণ্ড অংশ এই সমস্ত গ্রহাণু।

ধূমকেতু

গ্রহ উপগ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়া সৌরমণ্ডলে আর যা আছে তা হচ্ছে ধূমকেতু ও উল্‌কা। এই দুয়ের কোনোটাই অখণ্ড বিরাট কিছু নয়, ভাঙচুর মাত্র।

ঝকঝকে মাথা ও ছড়ানো উজ্জ্বল লেজ নিয়ে আকাশে যখন ধূম-কেতু দেখা যায়, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। গ্রহাণুকে মানুষ দেখেছে উনিশ শতকের শুরু থেকে, কিন্তু ধূমকেতুকে দেখে এসেছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। আগেকার কালে আকাশে ধূমকেতু দেখা গেলে মনে করা হত, বড়ো রকমের যুদ্ধ বা মড়ক হতে চলেছে। ধূমকেতু ছিল খুবই খারাপ লক্ষণ। আসলে কিন্তু চোখের দেখায় ধূমকেতুকে যতোটা ভয়ানক মনে হয় তা মোটেই নয়।

ধূমকেতু হচ্ছে বস্তুর ছোট ছোট কতকগুলো টুকরো, তার সঙ্গে

খানিকটা খুবই পাতলা গ্যাস। ধূমকেতুর নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলো ধূমকেতু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে। ধূমকেতুর ভর এতই যৎসামান্য যে তার টানে পৃথিবীর কক্ষপথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। গত শতকে দু-বার পৃথিবী ধূমকেতুর লেজের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছে। কিন্তু তার ফলে অজস্র উল্কাবর্ষণ হওয়া ছাড়া পৃথিবীর কোনোই ক্ষতি হয়নি।

ধূমকেতু যদিও সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তার চলার পথ গ্রহের মতো নয়। অধিকাংশ ধূমকেতুর কক্ষের উৎকেন্দ্রতা বড়ো বেশি—অর্থাৎ, বড়ো বেশি রকমের লম্বাটে উপবৃত্তাকার। তার কক্ষতলও বড়ো বেশি হেলানো। আবার বহু ধূমকেতুরই চলাটা উলটো দিক দিয়ে—গ্রহগুলো যেদিক দিয়ে চলে সেদিক দিয়ে নয়। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে কোনো কোনো ধূমকেতুর সময় লাগে কয়েক হাজার বা এমনকি কয়েক লক্ষ বছর। এইসব ধূমকেতু এখনো পর্যন্ত মাত্র একবারই দেখা গিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের জন্য, তারপরে আবার মহাশূন্যে উধাও হয়ে গিয়েছে। যেহেতু ধূম-কেতুর নিজস্ব আলো নেই, ধূমকেতু থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আসে বলে ধূমকেতুকে আমরা দেখতে পাই, এই কারণে সূর্যের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত ধূমকেতুকে দেখা যায় না। আবার ধূমকেতুর মধ্যে বস্তু এই যৎসামান্য, অর্থাৎ প্রতিফলিত আলো এতই কম যে দূরবীন ছাড়া বহু ধূমকেতুকেই খালি চোখে দেখা অসম্ভব।

ধূমকেতুর কক্ষ দু-রকমের হতে দেখা গিয়েছে। একরকম হচ্ছে অধিবৃত্তাকর (Parabolic)। এই কক্ষ হয়ে থাকে অতি বিরাট এবং এমনি কক্ষে যে ধূমকেতু চলে তার অপসূরও হয় বহু বহু দূরে। এমনি ধূমকেতুকে এখনো পর্যন্ত মাত্র একবারই দেখা গিয়েছে। আবার কবে ফিরে আসবে, আদৌ আসবে কিনা, সে-সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা চলে না। এই হচ্ছে অ-নিয়মিত ধূমকেতু।

আরেক রকমের কক্ষ উপবৃত্তাকার। এমনি কক্ষে যে ধূমকেতু

চলে তাকে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে ফিরে আসতে দেখা গিয়েছে। এই হচ্ছে নিয়মিত ধূমকেতু।

আবার এমন হতে পারে, কোনো বৃহৎ গ্রহের টানে ধূমকেতুর অধিবৃত্তাকার কক্ষ ছোট হয়ে গিয়ে উপবৃত্তাকার হয়ে গিয়েছে। যেমন, বৃহস্পতির টানে ডজন দুয়েক ধূমকেতু এই দশা প্রাপ্ত। তাদের কক্ষ বৃহস্পতির কক্ষকে ছাড়িয়ে দূরে যেতে পারেনি। আবার এমনও হতে পারে, বৃহৎ কোনো গ্রহের টানে কোনো ধূমকেতু একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তাও হয়েছে। যেমন, বিয়েলার ধূমকেতু (Biela's Comet)। এই ধূমকেতুটি প্রায় সাত বছর পরে পরে ফিরে আসত। ১৮৪৫ সালে দেখা গেল ধূমকেতুটি দু-খণ্ড হয়ে গিয়েছে। ১৮৫২ সালে সেই দুটি খণ্ডকেই পৃথকভাবে দেখা গেল। তারপরে আর দেখা যায়নি। আরো পরে, ১৮৭২ সালে, এই ধূমকেতুর ধ্বংসস্তূপকে উল্‌কা হয়ে ঝরে পড়তে দেখা গিয়েছে।

নিয়মিত ধূমকেতুর সবচেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হচ্ছে হ্যালির ধূমকেতু (Halley's Comet)। ১৬৮২ সালে একটি উজ্জ্বল ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। এডমণ্ড হ্যালি এই ধূমকেতুটি পর্যবেক্ষণ করেন। তার ধারণা হয়, ১৬০৭ ও ১৫৩১ সালে যে ধূমকেতু দেখা গিয়েছে তাও এই একই ধূমকেতু। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ১৭৫৮ সালে ধূম-কেতুটিকে আবার দেখা যাবে। সত্যিই দেখা গেল। আবার দেখা গেল ১৮৩৫ সালে ও ১৯১০ সালে। অর্থাৎ, ৭৬ বছর পরে পরে ফিরে আসছে।

ধূমকেতুর লেজ আকাশের অনেকখানি অংশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু আসলে এই লেজটি অতি পল্‌কা। এই লেজের মধ্যে যে-সব কণিকা রয়েছে তা খুবই ছোট। সৌর বায়ু (সূর্য থেকে নিঃসৃত পারমাণবিক কণিকার প্রবাহ) ধূমকেতুর লেজকে মাথা থেকে বাইরের দিকে ঠেলা দেয়। ধূমকেতুর লেজ তাই থাকে যেদিকে সূর্য তার অন্যদিকে। ধূমকেতু যখন সূর্যের দিকে আসছে তখন লেজটি পিছনের দিকে, আবার ধূমকেতু যখন সূর্যকে ঘুরে বাইরের

দিকে যাচ্ছে তখন লেজটি সামনের দিকে। আসলে ধূমকেতুর লেজ বরাবরের ব্যাপার নয়। ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছাকাছি আসে তখন সৌর বায়ুর ঠেলায় ধূমকেতুর মাথা থেকে কিছু কণিকা পিছনদিকে ছড়িয়ে পড়ে—তৈরি হয়ে যায় ধূমকেতুর লেজ। ধূমকেতু যতো সূর্য থেকে দূরে যায় ততো তার লেজ ছোট হতে থাকে এবং শেষে এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ধূমকেতু যদি ছোট হয় তাহলে এমনও
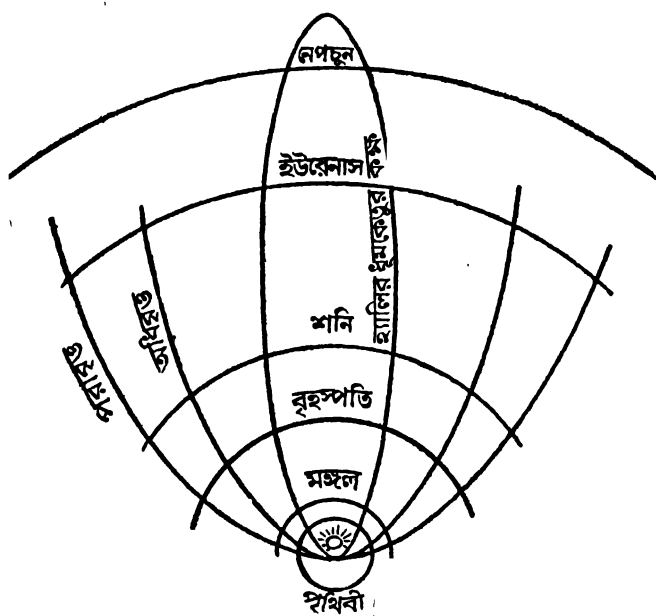
চিত্র ৩৪। হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষ

হতে পারে কোনো সময়েই তার লেজ তৈরি হয় না। রাতের আকাশে এইসব ধূমকেতুকে দেখায় আবছা একটু আলোর পোঁচের মতো।

ধূমকেতুর মাথাটি হয়তো-বা বরফে তৈরী, বিজ্ঞানীরা সেটিকে বলেন "নোংরা একটা বরফের গোলা"। ধূমকেতু যতোবার সূর্যের

কাছাকাছি আসে ও তার একটি লেজ গজায় ততোবারই ধূমকেতুর মাথা থেকে কিছু পদার্থ উবে যায়। ধূমকেতুর মোট পদার্থ অতি সামান্য, উবে যাওয়ার ব্যাপারটি চলতে চলতে ধূমকেতুর আয়ুও শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই ধূমকেতু বেশ বড়োগোছের না হলে তার আয়ুও বেশি নয়। আমাদের এই শতকে বড়োগোছের ধূম-কেতু একবার দেখা গিয়েছে ১৯১০ সালে (হ্যালির ধূমকেতু), আর একবার (কোহুতেক)। তুলনায় উনিশ শতকে দেখা গিয়েছিল আরো অনেক বেশিবার (যেমন, ১৮১১, ১৮৪৩, ১৮৫৮, ১৮৬১ ও ১৮৮২ সালে)।

উল্‌কা

ধূমকেতুর কথা বললে উল্‌কার কথা বলতেই হয়, দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে। উল্‌কা হচ্ছে অতিক্ষুদ্র একটি কণিকা, বালুর কণার চেয়েও ক্ষুদ্র, সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এমনিতে আমরা এই কণিকাকে দেখতে পাই না। কিন্তু কণিকাটি যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং বায়ুকণিকার ঘষায় উত্তপ্ত হয়ে জ্বলতে শুরু করে তখনই আমরা সেটিকে দেখি। মুখের কথায় আমরা বলি, তারা খসা। দূর থেকে তাকিয়ে মনে হয়, আকাশের একটি তারাই যেন খসে পড়ছে। সাধারণত দেখা গিয়েছে, বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে কণিকাটির নেমে আসার বেগ ওঠে সেকেণ্ডে ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত, ১৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় কণিকাটিতে আগুন ধরে, ৮০ কিলোমিটার উচ্চতায় কণিকাটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, শেষপর্যন্ত মাটিতে এসে পৌঁছয় খানিকটা গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই মাত্র। উল্‌কা যদি বড়ো হয় তাহলে আরো উঁচুতে থাকতেই জ্বলে ওঠে, জ্বলতে জ্বলতে আরো নিচে নেমে আসে।

উল্‌কাপাত যখন-তখন হতে পারে। আবার নির্দিষ্ট কতকগুলো সময়ে প্রায় বৃষ্টির মতো হয়ে থাকে। উল্‌কার ঝাঁক সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এক-একটি ঝাঁক এক-এক সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে

এসে পড়ে আর তখনই শুরু হয় উল্‌কার বর্ষণ (meteor showers)। কোনো একটি ঝাঁকের উল্‌কাগুলো চলে সমান্তরাল পথে কিন্তু দেখে মনে হয় উলকাগুলো যেন দূরের কোনো একটি বিন্দু থেকে বেরিয়ে এসেছে (দুটি সমান্তরাল রেলের লাইনের দিকে তাকিয়েও যেমন মনে হয় দূরের একটি বিন্দুতে লাইনদুটি মিশেছে)। এই বিন্দুটিকে বলে বিকিরক (radiant)। যে তারামণ্ডলে এই বিন্দুটি রয়েছে তারই নামে সেই বিশেষ ঝাঁকের নাম হয়ে থাকে। যেমন, সিংহরাশির ঝাঁক, মিথুনরাশির ঝাঁক, বৃষরাশির ঝাঁক। পৃথিবীর কক্ষ অনেকগুলো উল্‌কাঝাঁকের কক্ষের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী বছরের এক-একটা সময়ে এক-একটা ঝাঁকের কক্ষ পার হয়ে যায় আর তখনই প্রচুর উল্‌কাবর্ষণ হতে থাকে। যেমন, সিংহরাশির ঝাঁক থেকে উল্‌কাবর্ষণ হয় নভেম্বর মাসের ১৪ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে, মিথুনরাশি থেকে ডিসেম্বর মাসের ৭ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে, কালপুরুষ থেকে অক্‌টোবর মাসের ১৮ থেকে ২৬ তারিখের মধ্যে, ইত্যাদি। সারা বছরে পৃথিবী এমনি ঝাঁক পার হয় এগারোটি।

ধূমকেতুর সঙ্গে উল্‌কার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জেনেছি, ধূমকেতুর মাথার উপকরণ লেজ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এমনিভাবে উপকরণগুলো ছড়িয়ে পড়ে ধূমকেতুর কক্ষে। অর্থাৎ উল্‌কা হয়ে যায়। ছিল ধূমকেতু, হয়ে গেল উল্‌কার ঝাঁক—এমন দৃষ্টান্ত বেশ কয়েকটি আছে। একটির কথা আগে আমরা জেনেছি—বিয়েলার ধূমকেতু।

উল্‌কাপিণ্ড

এমনও হতে পারে, উল্‌কাটি যথেষ্ট বড়ো, জ্বলতে শুরু করার পরেও সবটা পুড়ে ছাই হতে পারেনি। খানিকটা বাকি থাকতেই মাটিতে এসে পড়েছে। এমনি যদি হয় তাহলে আমরা বলি উল্‌কাপিণ্ড (meteorite)।

এই শতকে সাইবেরিয়ায় দুটি বড়ো উল্‌কাপিণ্ড পড়েছে—১৯০৮ সালে ও ১৯৪৭ সালে। প্রথমবারে অনেকখানি এলাকা জুড়ে অরণ্য ধ্বংস হয়েছে, দ্বিতীয়বারে অনেকগুলো ছোট গহ্বর তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৭০ টন ওজনের উল্‌কাপিণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড থেকে ৩৪ টন ওজনের। উল্‌কাপিণ্ড পড়ে সবচেয়ে বড়ো গহ্বর তৈরি হয়েছে আরিজোনায়—ব্যাসে ১,১৮০ মিটার, গভীরতায় ১৭৫ মিটার।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে তাই রক্ষে, অধিকাংশ উল্‌কা মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, উল্‌কাপিণ্ড পড়ে পড়ে চাঁদের উপরতলের কী হাল হয়েছে তা আমরা জেনেছি। মঙ্গলে পাতলা বায়ুমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও উল্‌কাপিণ্ড থেকে মঙ্গলের উপরিতল খুব বেশি রক্ষা পায়নি।

সূর্য

পৃথিবী থেকে সূর্য ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল) দূরে। এই দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য আমরা আগে বলেছি, ঘণ্টায় ১৬০০ কিলোমিটার বেগে যদি একটি জেট-বিমান সূর্যের দিকে যাত্রা করতে পারত তাহলে সূর্যে পৌঁছতে সময় নিত ৩,৮৭৪ দিন বা সাড়ে-দশ বছরের কিছু বেশি। আলোর বেগ সেকেণ্ডে প্রায় তিনলক্ষ কিলোমিটার, এই বেগ নিয়েও সূর্য থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে আলোর সময় লাগে ৮·২ মিনিট। মনে হতে পারে এই দূরত্ব বুঝি খুবই বেশি। কিন্তু তারাজগতের দিকে তাকালে এই দূরত্বকে সামান্য মনে হয়। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারাটি রয়েছে ৪·৩ আলো বছর দূরে। আমাদের জেট-বিমানটি ঘণ্টায় ১৬০০ কিলোমিটার বেগে যদি এই নিকটতম তারার দিকে যাত্রা করত তাহলে সেখানে পৌঁছতে সময় নিত ত্রিশলক্ষ বছর।

সবচেয়ে কাছের তারাটিও যে কত দূরে তা বোঝাবার জন্য আরো বলা চলে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে যদি ধরা হয় পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে পৃথিবী থেকে এই নিকটতম তারার দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় প্রায় তেরো কিলোমিটার। সূর্য আমাদের এত কাছে বলেই সূর্য আমাদের কাছে এত বড়ো, এত উত্তপ্ত।

পৃথিবীর তুলনায় সূর্য অনেক অনেক বড়ো। আমরা জানি, পৃথিবীর আয়তন যদি হয় ১ তাহলে বৃহস্পতির আয়তন ১৩১৮·৭। অর্থাৎ ১৩১৮টি পৃথিবী এবং তারও কিছু বেশি বৃহস্পতির মধ্যে পুরে রাখা চলে। আর পৃথিবীর আয়তন যদি হয় ১ তাহলে সূর্যের আয়তন ১৩,০০,০০০। অর্থাৎ, তেরো লক্ষ পৃথিবী সূর্যের মধ্যে পুরে রাখা চলে। সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের ৩,৩৩,০০০ গুণ। সূর্যের ব্যাস ১,৩৮,৪০০ কিলোমিটার, পৃথিবীর ব্যাসের ১০০ গুণের চেয়েও বেশি। জলের

ঘনত্ব যদি হয় ১ তাহলে পৃথিবীর ঘনত্ব ৫.৫২, বৃহস্পতির ঘনত্ব ১.৩৩, আর সূর্যের ঘনত্ব ১.৪।

ঘনত্বের এই মাপ থেকে ধরে নেওয়া চলে সূর্যের বিশাল গোলকটি শুধুই গ্যাসে তৈরী, তার মধ্যে কঠিন বস্তু কিছু নেই। শুধু সূর্য নয়, বিশ্বের সমস্ত তারা এমনি গ্যাসে তৈরী।

চোখের দেখায় সূর্যকে স্পষ্ট গোল দেখায়। কিন্তু সূর্যের এই গ্যাসের গোলকটি এমন স্পষ্ট কিনারওলা নয়। যেমন, ফুটবলের ভিতরকার বাতাস একটি আবরণের মধ্যে থাকে বলে স্পষ্ট কিনারওলা হয়ে ওঠে, সূর্যের গ্যাসের গোলকটি সম্পর্কে তেমন কথা বলা চলে না। সূর্যের গ্যাস ক্রমেই পাতলা হতে হতে মহাশূন্যে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। তাহলে পৃথিবী থেকে আমরা এমন একটা স্পষ্ট কিনারওলা চেহারায় সূর্যকে দেখি কেন? এই কারণে যে পৃথিবীতে সূর্যের যে আলো এসে পৌঁছয় তার প্রায় সবটাই আসে কয়েক-শো কিলো-মিটার পুরু একটি স্তর থেকে। এই স্তরটিকে বলা হয় আলোকমণ্ডল (Photosphere)। পৃথিবী থেকে আমরা দেখি এই আলোকমণ্ডলকে, তাই আমাদের চোখে সূর্যের এমন স্পষ্ট কিনার। আলোকমণ্ডলকে আমরা ধরে নিতে পারি সূর্যের উপরিতল হিসেবে। আলোকমণ্ডলের উপরের স্তরকে বলা হয় ছটামণ্ডল বা কিরীট (Corona)। মহাশূন্যের বহু লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত এই ছটামণ্ডল ছড়িয়ে গিয়েছে। ছটামণ্ডলের ঘনত্ব খুবই কম। এত কম যে পৃথিবীর কোনো গবেষণা-গারে যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্যতার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু ছটামণ্ডলের তাপ খুবই বেশি, সম্ভবত আলোকমণ্ডলের তাপের তিনশো-গুণ। আমরা বলেছি, আলোক-মণ্ডলের উপরের স্তর হচ্ছে ছটামণ্ডল, কিন্তু একটির পরেই অপরটি নয়। রূপান্তরটি ঘটেছে আরো একটি মণ্ডলের মধ্যে দিয়ে। দুই মণ্ডলের মাঝখানের এই মণ্ডলকে বলা হয় বর্ণমণ্ডল (Chromosphere)। ছটামণ্ডল ও বর্ণমণ্ডলের আলো কম, আলোকমণ্ডলের আলো বেশি। এই কারণে আলোকমণ্ডকেই আমরা দেখি। একমাত্র

যখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয় এবং সূর্যের আলোকমণ্ডল চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়ে তখন এই বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডলকে দেখা যেতে পারে। আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল—এই তিনটিকে একসঙ্গে বলা হয় সূর্যর আবহমণ্ডল (Atmosphere)।

সূর্যের আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা, অর্থাৎ উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবীতে সূর্যের যে বিকীরণ এসে পৌঁছয় তার প্রায় সবটাই এই আলোকমণ্ডল থেকে। সূর্যের বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল থেকে বিকীরণ না-থাকার মতো। আমরা জানি, বস্তু উত্তপ্ত হলে বিকীরণ ঘটে। কিন্তু বস্তুটি থাকা চাই— তা কঠিন হোক, তরল হোক, গ্যাসীয় হোক। সূর্যের বর্ণমণ্ডলে ও ছটামণ্ডলে বস্তু খুবই কম। ফলে বিকীরণও কম।

আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা ওপর থেকে যতোই নিচের দিকে নামা যায় ততোই বাড়তে থাকে। আর সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে তাপমাত্রার মাপ প্রায় ১,৫০,০০,০০০ ডিগ্রা সেন্টিগ্রেড। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে তুলনা করে সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলেব এই তাপমাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। এ এক ধারণাতীত ব্যাপার।

পৃথিবী থেকে তাকিয়ে সূর্যের গোলকটিকে যখন আমরা দেখি*— সেটি সবজায়গায় সমান উজ্জ্বল নয়। যদিও আমরা দেখি সূর্যের উপরিতল মাত্র, একটি চাকতির আকারে, কিন্তু চোখের দেখায় চাকতির কেন্দ্রের দিকে উজ্জ্বলতা বেশি, কিনারের দিকে কম। তার কারণ এই যে কেন্দ্রের দিকে আমাদের চোখের দৃষ্টি অনেক বেশি উত্তপ্ত গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে, কিনারের দিকে অনেক কম

* এখানে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান করার আছে। দূরবীন দিয়ে বা এমনকি বাইনোকুলার দিয়ে সরাসরি সূর্যের দিকে তাকালে চোখের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী এমনিভাবে অন্ধ হয়েছেন। সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করা হয় পর্দার ওপরে ফুটিয়ে তোলা সূর্যের প্রতিচ্ছবি থেকে।

উত্তপ্ত গভীরতা পর্যন্ত। সাদা আলোয় তোলা সূর্যের চাকতির ছবিতে তাই দেখা যায় কিনারের দিক অপেক্ষাকৃত কালো।

সূর্যের কেন্দ্রীয় এলাকা আমাদের চোখের দেখার বাইরে। কাজেই কেন্দ্রীয় এলাকায় এই প্রচণ্ড উত্তাপ কি-ভাবে তৈরি হচ্ছে তা জানার জন্য আমরা একটা তত্ত্ব খাড়া করতে পারি। মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, তত্ত্বটি নির্ভুল।

সূর্যের মধ্যে আসলে ব্যাপারটা কী চলছে? সূর্য আসলে কী? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হলে প্রথমে জানা দরকার সূর্যের মধ্যে কী কী মৌলিক পদার্থ আছে। তা জানা যায় বর্ণালিবীক্ষণ থেকে।

বর্ণালিবীক্ষণ

বর্ণালিবীক্ষণ শুরু করেছিলেন নিউটন। একটি প্রিজমের (prism) মধ্যে তিনি সূর্যের আলো প্রবিষ্ট করিয়েছিলেন। প্রিজমের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার পরে সূর্যের আলো ভেঙে গিয়ে রামধনুর চেহারা নিয়েছিল। তখন ধারণা করতে পেরেছিলেন, সূর্যের আলোর মধ্যে রয়েছে রামধনুর সাতটি রঙ। তবে সূর্যের আলো নিয়ে বর্ণালিবীক্ষণ উনিশ শতকের আগে শুরু হয়নি। এ-কাজ করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী জে ফ্রাউনহোফার (J. Fraunhofer)।

ফ্রাউনহোফার সূর্যের আলোকে নিয়ে এসেছিলেন সরু একটি ফুটোর মধ্যে দিয়ে, তারপরে একটি প্রিজমের মধ্যে দিয়ে। দেখেছিলেন সূর্যের বর্ণালিতে রয়েছে রামধনুর সাতটি রঙের সমাবেশ আর তার উপরে টানা টানা কালো দাগ। আরো দেখেছিলেন, এই দাগগুলো সব সময়ে একই রকম থাকে, একই জায়গায় থেকে যায় এবং একই তীব্রতাবিশিষ্ট হয়। যেমন, বর্ণালির হলুদ অংশে ছিল পাশাপাশি দুটি কালো দাগ। এমনি প্রায় পাঁচশো দাগের সন্ধান পেয়েছিলেন।

ফ্রাউনহোফারের মৃত্যুর অনেক পরে, ১৮৫৯ সালে, গুস্টাফ কির্চ্‌হফ (Gusfav Kirchhoff) নামে অপর একজন জার্মান বিজ্ঞানী কালো দাগগুলোর কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান, জ্বলন্ত বস্তুর বর্ণালি

একটানা বা অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে—সেই বস্তু কঠিন হোক, তরল হোক বা উচ্চচাপের মধ্যে থাকা গ্যাস হোক। আর নিম্নচাপের মধ্যে থাকা জ্বলন্ত গ্যাসের বর্ণালি পাওয়া যায় কাটা-কাটা বা বিচ্ছিন্ন কতকগুলো উজ্জ্বল দাগ হিসেবে। বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থের বেলায় পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ দাগ—যেন একেবারে মার্কামারা। যেমন, সোডিয়াম থেকে পাওয়া যায় পাশাপাশি দুটি উজ্জ্বল হলুদ দাগ (সঙ্গে আরও অনেকগুলো)। এমনি দুটি দাগ পাওয়া মানেই সোডিয়াম থাকা।

এবারে সূর্যের দিকে তাকানো যাক। সূর্যের আলোকমণ্ডলে আছে উচ্চচাপের মধ্যে থাকা গ্যাস। অতএব তার বর্ণালি অবিচ্ছিন্ন। আর বর্ণমণ্ডলের গ্যাস খুবই পাতলা, এতএব এই বর্ণমণ্ডল থেকে পাওয়া উচিত টানা টানা দাগ। বিশেষ কারণে বর্ণমণ্ডলের দাগগুলো উজ্জ্বল না হয়ে কালো হয়।

কিন্তু সেই আসল কথাটা থেকেই যায়। দাগগুলোর অবস্থান ও তীব্রতা কোনোক্রমেই বদলায় না। অর্থাৎ, সূর্যের বর্ণালিতে হলুদ অংশে আমরা যদি দুটি কালো দাগ পাই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিতে পারি, সূর্যে সোডিয়াম আছে। এমনিভাবে বর্ণালি বিশ্লেষণ করে আজ পর্যন্ত সূর্যে ৭০টিরও বেশি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে (পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় ৯২টি মৌলিক পদার্থ)। সূর্যের একটি মৌলিক পদার্থ হচ্ছে হিলিয়াম। এই পদার্থটির সন্ধান সূর্যেই প্রথম পাওয়া গিয়েছিল, পৃথিবীতে পরে। হিলিয়াম হচ্ছে হাইড্রোজেনের পরেই সবচেয়ে হালকা গ্যাস আর এই বিশ্বে আছেও প্রচুর পরিমাণে।

বর্ণালি বিশ্লেষণ থেকে জানা গিয়েছে সূর্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে আছে হাইড্রোজেন। আর হাইড্রোজেনই হচ্ছে সূর্যের "জ্বালানি"। এই জ্বালানি থাকার জন্যই সূর্য জ্বলন্ত অবস্থায় থাকে। কি ভাবে?

যে কোনো বস্তুর মধ্যে দুটি শক্তি কাজ করে। পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর বৈদ্যুতিক শক্তি ও কণিকার সঙ্গে কণিকার মহাকর্ষগত শক্তি। বস্তুটি ছোট হলে মহাকর্ষগত শক্তিও হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তখন সেই শক্তিকে অগ্রাহ্য করে বৈদ্যুতিক শক্তি পরমাণুগুলোকে এঁটে ধরতে পারে। ফলে বস্তুর কাঠামোটি শক্ত হয়। কিন্তু বস্তু যদি অতি-বৃহৎ হয় এবং বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয় (অর্থাৎ, ভিতরকার পজিটিভ চার্জ ও নেগেটিভ চার্জ সমান, ফলে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে শূন্য—বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কোনোটাই তখন আর থাকে না) তাহলে মহাকর্ষগত শক্তিও হয় প্রবল। বস্তুর ভিতরকার কণিকাগুলো পরস্পরকে প্রবলভাবে টানতে থাকে, কণিকাগুলো আরো কাছাকাছি আসে, মহাকর্ষের টান আরো বেড়ে যায়। বস্তুটি তখন সংকুচিত হতে শুরু করে। সংকোচন বাড়তেই থাকে যদি-না এমন কিছু ঘটে যাতে এই সংকোচন ঠেকানো যায়। সূর্য বা তারার মধ্যে এই ঠেকানোর ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছে। সূর্য যে সূর্য হয়েছে, তারা যে তারা, তা এই সংকোচন ঠেকাতে পারার জন্যই।

কল্পনা করা যাক, ঠাণ্ডা গ্যাসের প্রকাণ্ড একটি মেঘ মহাকর্ষের টানে সংকুচিত হচ্ছে। যতোই সংকুচিত হচ্ছে, সংকোচনের মাত্রা ততোই বাড়ছে। ভিতরকার কণিকাগুলো আরো কাছাকাছি আসছে আর পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দিচ্ছে। ঠোকাঠুকির ফলে তৈরি হচ্ছে উত্তাপ, উত্তাপের ফলে গ্যাস ফুলে উঠতে চাইছে ও সংকোচনের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ছে, চাপ বাড়ার ফলে সংকোচনের মাত্রা কমছে (চুপসানো বেলুন গরম করলে যেমন ফুলে ওঠে)। কিন্তু শুধু এইটুকু উত্তাপই যথেষ্ট নয়, তাছাড়া এই উত্তাপেরও খানিকটা আবার মেঘের উপরিতল থেকে উবে যায়। চুপসানোটাকে পুরোপুরি বন্ধ করতে হলে উত্তাপের আরও যোগান থাকা দরকার। আমাদের এই সূর্য প্রায় পাঁচশত-কোটি বছর ধরে একই অবস্থায় রয়েছে। সেখানে

বাড়তি উত্তাপ যোগান দেবার উৎসটি কী? ১৯৩৮ সালে বেথে (Bethe) ও ফন ভাইস্‌ৎস্যাকার (Von Weiszaecker) এই উৎসটির একটি ছক উপস্থিত করেন। তাকে বলা হয়, নিউক্লিয়র ফিউসন (nuclear fusion), বাংলায় বলা যেতে পারে পারমাণবিক একীভবন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার।

বস্তু গঠিত হয় পরমাণু দিয়ে, পরমাণু গঠিত হয় গোটাকতক ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক কণিকা দিয়ে। আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই তার জন্য চারটি কণিকাকে চিনে নেওয়া দরকার—প্রোটন (Proton), নিউট্রন (Neutron), ইলেকট্রন (Electron) ও পজিট্রন (Positron)। প্রোটন ও নিউট্রন হচ্ছে ভারী কণিকা, এ দুটি থাকে পরমাণুর কেন্দ্রীণে বা নিউক্লিয়াসে। কণিকাদুটির মধ্যে অমিল শুধু এইটুকু যে প্রোটনে আছে পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ, নিউট্রনে কোনো চার্জ নেই। এ ছাড়া আর সব বিষয়ে কণিকাদুটি একই রকম। ইলেকট্রন ও পজিট্রন অনেক বেশি হালকা এবং এই দুটির মধ্যেও অমিল শুধু এইটুকু যে ইলেকট্রনে আছে নেগেটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ, আর পজিট্রনে পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ। পরমাণুর মধ্যে তার কেন্দ্রে আছে একটি নিউক্লিয়াস, যার মধ্যে আছে প্রোটন ও নিউট্রন। নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে (সূর্যের চারদিকে যেমন গ্রহ ঘোরে) কয়েকটি ইলেকট্রন। পরমাণুর রাসায়নিক চরিত্র কী হবে এবং পরমাণু থেকে কেমন ভাবে আলো নিঃসৃত হবে তা নির্ধারণ করে এই ইলেকট্রনগুলো। সাধারণ একটি পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। তা হতে পারে তখনই যখন চারদিকে ঘুরে চলা ইলেকট্রনের সংখ্যা আর নিউক্লিয়াসের মধ্যেকার প্রোটনের সংখ্যা সমান হয়। এই সংখ্যাটিকে বলা হয় পরমাণু-অঙ্ক (Atomic Number)। ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু-অঙ্ক। হাইড্রোজেনে আছে একটি প্রোটন, হিলিয়ামে দুটি, লিথিয়ামে তিনটি, কার্বনে ছ'টি, অক্‌সিজেনে আটটি, লৌহে ছাব্বিশটি, ইউরেনিয়ামে বিরানব্বইটি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ছাড়াও আছে নিউট্রন,

এবং এই নিউট্রনের সংখ্যা কম-বেশি হলেও পরমাণুর রাসায়নিক চরিত্র বদলায় না। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার নিউট্রন সমন্বিত নিউ-ক্লিয়াস অবশ্যই হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার নিউট্রন নিয়ে নিউক্লিয়াসের এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধরন—তাদের বলা হয় আইসোটোপ (Isotope)। যেমন, হাইড্রোজেন থাকতে পারে সাধারণ হাইড্রোজেন হিসেবে, যখন তার নিউক্লিয়াসে একটিমাত্র প্রোটন ছাড়া আর কিছু নেই। আবার থাকতে পারে ভারী হাইড্রোজেন (ডিউটেরিয়াম) হিসেবে, যখন তার নিউক্লিয়াসে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন। সাধারণ জলে থাকে সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণু, ভারী জলে সে-জায়গায় ডিউটেরিয়াম আইসোটোপ—যদিও দুই জলে তফাত বিশেষ নেই। তেমনি সাধারণ হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে আছে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন (হিলিয়াম৪), কিন্তু হিলিয়াম৩ আইসো-টোপের নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন ও মাত্র একটি নিউট্রন।

নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যা যতোই হোক তার ফলে পরমাণুর রাসায়নিক চরিত্রে হেরফের হয় না। নিউক্লিয়াসের বাঁধন কতখানি শক্ত হবে তার বিচার অনেকখানি হয়ে থাকে এই নিউট্রনের সংখ্যা দিয়ে। এমনও দেখা গিয়েছে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে যদি নিউট্রনের তুলনায় প্রোটনের সংখ্যা বেশি থাকে তাহলে একটি প্রোটন তার পজিটিভ চার্জ ত্যাগ করে (অর্থাৎ, প্রোটন থেকে একটি পজিট্রন বেরিয়ে আসে) এবং প্রোটন হয়ে ওঠে নিউট্রন। তখন নিউক্লিয়াসটি আরও সুস্থিত চেহারা নেয়। হিলিয়াম৪ এমন এক দারুণ সুস্থিত নিউক্লিয়াস, তার বাঁধন খুবই শক্ত। এই বাঁধন আলগা করতে হলে প্রচুর শক্তি ছাই। তেমনি, উলটো দিক থেকে, দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন একীভূত করে যদি একটি হিলিয়াম৪ নিউক্লিয়াস গঠন করা হয় তাহলেও প্রচুর শক্তি ছাড়া পেয়ে থাকে। একই অবস্থা ঘটে যদি আমরা চারটি প্রোটন নিই, দুটি রূপান্তরিত করি নিউট্রনে, এবং তারপরে বাকি দুটি প্রোটন ও সেই দুটি নিউট্রন একীভূত করে গঠন করি হিলিয়াম৭ নিউক্লিয়াস। এটিকে বলা হয় ফিউসন

প্রক্রিয়া এবং এই হচ্ছে সৌর শক্তির প্রধান উৎস। এই প্রক্রিয়া হাইড্রোজেন বোমারও ভিত্তি।

আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা, এই প্রক্রিয়া সাধারণ তাপ-মাত্রায় শুরু হতে পারে না। শুরু হয় তখনই যখন প্রোটনে প্রোটনে অতি-উচ্চ বেগে ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। তার জন্য চাই অতি উচ্চ তাপমাত্রা—এক-কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কম কিছুতেই নয়। হাইড্রোজেন বোমার বেলায় এই প্রক্রিয়া শুরু করা হয় একটি পরমাণু-বোমা ফাটিয়ে। আর সূর্যের বেলায় শুরু হয় মহাকর্ষগত টানে সংকোচনের ব্যাপারটি প্রবলভাবে চলার কালে কণিকায় কণিকায় ঠোকাঠুকি হয়ে উৎপন্ন উত্তাপে।

তাহলে সূর্যের অভ্যন্তরে ব্যাপারটি ঘটে এই যে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস একীভূত হয়ে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস হয়—চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস থেকে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ বস্তু খোয়া যায়। যেমন, এক-কিলোগ্রাম হাইড্রোজেন থেকে ৯৯২ গ্রাম হিলিয়াম তৈরি হতে পারে। বাকি আট-গ্রাম কোথায়? এই আট-গ্রাম বস্তুই রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০,০০,০০০ টন বস্তু খোয়া যাচ্ছে। কিন্তু সূর্যের বস্তুভাণ্ডার এতই বিশাল ও বিপুল যে আগামী কয়েক হাজার-কোটি বছরে এই বস্তুক্ষয়ের দরুন সূর্যের চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটবে না।

তাহলে আমরা বলতে পারি, সূর্য ও অন্য সব তারা যে জ্বলছে তার কারণ, তাদের বস্তুভাণ্ডার এত বিশাল ও বিপুল যে মহাকর্ষগত টানের দরুন কণিকায় কণিকায় ঠোকাঠুকি হয়ে অভ্যন্তরের উত্তাপ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মাত্রায় পৌঁছে যেতে পেরেছে। বৃহস্পতি যে তারা হতে পারেনি তার কারণ, তার বস্তুভাণ্ডার তারা হবার পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম।

ব্যাপারটা যেন দাঁড়াচ্ছে এই যে সূর্যের চুল্লিটিকে জ্বলন্ত রাখার জন্য প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ-লক্ষ টন হাইড্রোজেন জ্বালানি

পোড়াতে হচ্ছে। এমনি চলতে থাকলে একদিন-না-একদিন জ্বালানির ভাণ্ডার শেষ হবার কথা। শেষ হয়ও। আমাদের এই তারাজগতে নিভে-যাওয়া তারাও আছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

সৌর কলঙ্ক

কথাটা আবার বলি, সূর্যকে যখন আমরা দেখি তখন দেখতে পাই শুধু তার "বাইরের দিক"। এই বাইরের দিকের নাম আলোক-মণ্ডল। সূর্যের ঘনত্ব বাইরের দিকে কম, কিন্তু ভিতরের দিকে বেশি। এত প্রচণ্ডভাবে এই ঘনত্ব বাড়তে থাকে যে কয়েক কিলোমিটার নিচে গ্যাস অস্বচ্ছ হয়ে যায়। কাজেই সূর্যকে আমরা দেখতে পাই উপরিতল থেকে কয়েক-শো কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত, সূর্য তাই আমাদের চোখে স্পষ্ট কিনার বিশিষ্ট কঠিন একটি চাকতির মতো।

কিন্তু সূর্যের যতোটুকু আমরা দেখতে পাই, অর্থাৎ তার বাইরের দিক বা উপরিতল, সেখানেও অনেক কিছু দেখার আছে।* সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে সূর্যের গায়ে কোথাও কোথাও কালো দাগ— উদ্ভাসিত আলোকমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ছায়া যেন। মনে হতে পারে, এই দাগ বা ছায়ার এলাকায় কোনো কারণে সূর্যের আগুন নিভে গিয়েছে, তাই উত্তাপহীন ও কালো। আসলে কিন্তু তা নয়। দাগের এলাকাতে তাপমাত্রা হয়ে থাকে প্রায় ৪,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সূর্যের উপরিতলে তাপমাত্রা হচ্ছে, আমরা জানি, ৬,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বেশি উত্তাপের মধ্যে কম উত্তাপের এলাকাকে দূর

* আরো একবার সাবধান করতে চাই। দূরবীন দিয়ে বা বাইনোকুলার দিয়ে সূর্যের দিকে সরাসরি তাকালে চিরকালের মতো অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এমনকি খালি চোখেও দুপুরের সূর্যের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকলে বিপদ ঘটতে পারে।

থেকে কালো দেখায়। কোনো কোনো দাগ আকারে বড়ো। তার কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত বেশি কালো, তাকে বলা হয় প্রচ্ছায়া (umbra)। প্রচ্ছায়াকে ঘিরে থাকে অপেক্ষাকৃত হালকা কালো, তাকে বলা হয় উপচ্ছায়া (penumbra। অধিকাংশ সময়েই দাগগুলো জটিল আকার নিয়ে দেখা দেয়, একা বড়ো একটা নয়, প্রায়ই দল বেঁধে।

সূর্যের গায়ে এই দাগ বেশিক্ষণ থাকে না। যতো বড়ো দাগই হোক, কয়েক সপ্তাহ বা বড়ো জোর কয়েক মাসের মধ্যে মিলিয়ে যায়। আয়ু ঘণ্টাকয়েক মাত্র।

এই দাগগুলোকে পর-পর পর্যবেক্ষণ করে আরো একটি ব্যাপার জানা গিয়েছে। দাগগুলো একটানা গতিতে সূর্যের চাকতি অতিক্রম করে। তার মানে, সূর্যও তার অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে, যেমন পাক খায় পৃথিবী। তবে পৃথিবীর পাক খাওয়াটা কঠিন বস্তুর, ফলে একটি পাক সম্পূর্ণ করার সময় সকল অক্ষাংশেই সমান। সূর্যের পাক খাওয়া গ্যাসীয় একটি গোলকের। পৃথিবীর পাক-খাওয়া যেদিকে সূর্যেরও সেইদিকে—পশ্চিম থেকে পুবে (উত্তর মেরুর উপর থেকে তাকিয়ে দেখলে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে)। সূর্যের বেলায় একটি পাক সম্পূর্ণ করার সময় সমস্ত অক্ষাংশে সমান নয়। বিষুব-বৃত্তে সম্পূর্ণ হয় ২৫ দিনে, ৪৫ ডিগ্রী অক্ষাংশ প্রায় ৩৩ দিনে।

সূর্যের গায়ে দাগের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়ে-কমে। কখনো কখনো এমনও হয় যে সূর্যের গায়ে একটিও দাগ নেই। কখনো কখনো দাগের সংখ্যা প্রচুর। নথিপত্রের সাক্ষ্য থেকে দেখা গিয়েছে, সূর্যের গায়ে দাগ একেবারে না-থাকা এবং প্রচুর সংখ্যায় থাকার ব্যাপারটা ঘটে প্রায় এগারো বছরের একটি চক্রে। দাগ বাড়তে থাকে প্রায় সাড়ে-চার বছর ধরে, দাগ কমতে থাকে তারপরের প্রায় সাড়ে-ছয় বছর ধরে। তারপরে কিছুকাল দাগ একেবারে না-থাকা বা সবচেয়ে কম সংখ্যায় থাকা। এই অবস্থাকে বলা হয় শান্ত সূর্য।

আবার শুরু হয় নতুন একটি চক্র। সূর্যের গায়ে শেষবার সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দাগ দেখা গিয়েছে ১৯৬৯ সালে।

এখন জানা গিয়েছে যে সূর্যের গায়ে এই দাগগুলো হচ্ছে জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্রের কেন্দ্র। আরও জানা গিয়েছে, সূর্যের গায়ে দাগ তৈরি হওয়ার মূলেও আছে চৌম্বক শক্তি।

সূর্যের গায়ে দাগ তৈরি হবার সময়ে আরো একটি ব্যাপার ঘটতে পারে, তাকে বলা হয় ঝলক (flare)। দাগের কাছাকাছি এলাকায় আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলতা আচমকা প্রচণ্ডরকমের বেড়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটে এবং আধঘণ্টার মধ্যেই আবার মিলিয়ে যায়। অতি প্রচণ্ড একটা উদ্গীরণ ঘটে বলা চলে। সাধারণ দূরবীনে এই উদ্গীরণ দেখা যায় না, তার হদিশ পাওয়া যায় বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে। ফলে নিঃসৃত হয় অতিবেগুনী বিকীরণ ও তৎসহ তড়িতাবিষ্ট কণিকার প্রবাহ। অতিবেগুনী বিকীরণ আলোর সমান বেগে ধাবিত হয় এবং আট মিনিটের মতো সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। পৃথিবীর আয়নমণ্ডলের যে স্তর থেকে রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় সেই স্তরটিকে এই অতিবেগুনী আলো বিপর্যস্ত করে তোলে এবং তার ফলে পৃথিবীতে শর্টওয়েভ রেডিও-যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তড়িতাবিষ্ট কণিকা-গুলো ধাবিত হয় আরও কম বেগে, ফলে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় একদিন পরে। পৌঁছেই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করে তোলে ও চৌম্বক ঝড় তোলে। এই অবস্থায় এমনকি কম্পাসের কাঁটা পর্যন্ত এলোমেলো হয়ে যায়। অন্যদিকে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে চালিত হয়ে তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলো হাজির হয় মেরু-এলাকায়, সেখানে তাদের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের কণিকার ঠোকাঠুকি লাগে, তার ফলে সৃষ্টি হয় মেরু-জ্যোতি (Aurora Borealis)।

সূর্যের গায়ে কালো দাগ দেখার সময়ে প্রায়ই দেখা যায় কোথাও কোথাও অল্প খানিকটা জায়গা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল

চাকতির ওপরে আরো উজ্জ্বল দাগের মতো, যার নাম ফ্যাকুলা (facula)। সাধারণত দেখা যায়, কালো দাগ ফুটে ওঠার ঠিক আগে একই জায়গায় এই সাদা দাগ ফুটে ওঠে এবং কালো দাগ মিলিয়ে যাবার পরেও কিছু সময় থেকে যায়।

দেখা যাচ্ছে, সূর্যের গায়ে কালো দাগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সূর্যের তৎপরতার সম্পর্ক আছে। দাগ যখন বেশি তৎপরতাও তখন প্রচণ্ড।

ভালো অবস্থার মধ্যে সূর্যের যে-সব আলোকচিত্র তোলা হয়েছে তাতে দেখা যায়, সূর্যের উপরিতলটি মসৃণ নয়, দানা-দানা মতো। পাত্রে জল থাকলে তার উপরিতল যেমন মসৃণ হয় তেমনি নয়, পাত্রে দানাশস্য থাকলে তার উপরিতল যেমন হয় তেমনি। সূর্যের মধ্যে যে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন চলছে, এটা তারই লক্ষণ। কেন্দ্র থেকে উত্তপ্ত গ্যাস উপরিতলে উঠে আসছে, তাকেই আমরা দেখি দানার মতো; উপরিতল থেকে ঠাণ্ডা গ্যাস কেন্দ্রে নেমে যাচ্ছে, তাকেই আমরা দেখি দানার পাশে কালো একটি রেখার মতো।

সূর্যগ্রহণ

অমাবস্যার দিন চাঁদ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপর পড়লে সূর্যগ্রহণ হয়। কেননা পৃথিবীর যে-এলাকায় চাঁদে ছায়া এসে পড়েছে সেখান থেকে তাকিয়ে সূর্যকে আর দেখা যায় না, সূর্য চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়ে।

কিন্তু প্রত্যেক অমাবস্যার দিন সূর্যগ্রহণ হয় না। সূর্যগ্রহণ হতে হলে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপরে এসে পড়া চাই। তা পড়তে পারে তখনই যখন সূর্য চাঁদ ও পৃথিবী এক লাইন বরাবর থাকে। কিন্তু প্রায়ই থাকে না, তার কারণ চাঁদের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষ থেকে ৫ ডিগ্রী হেলানো।

একটা মডেল খাড়া করলে বুঝতে সুবিধে হবে। সূর্য যদি হয় একটা টেবিলটেনিসের বল, তাহলে পৃথিবী হবে এই টেবিলটেনিসের

বল থেকে প্রায় চার-মিটার দূরে ০.০৩৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি দানা। আর এই দানা থেকে সোয়া-এক সেন্টিমিটার দূরে থেকে তার চারদিকে ঘুরছে ০.০০৮৮ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি কণার মতো চাঁদ (চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চারভাগের একভাগ আর সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে একশোগুণেরও বেশি)। সূর্যগ্রহণ হতে হলে এই কণার ছায়াটি পড়া চাই দানার ওপরে। কিন্তু প্রায়ই পড়ে না। তার কারণ, কণার কক্ষ আর দানার কক্ষ একই তলে নয়।

ঘটনার আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে, আমাদের এই ছোট্ট চাঁদ পৃথিবীর এত কাছে (চারলক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে) যে আকাশে তার প্রতীয়মান ব্যাস পনেরো-কোটি কিলোমিটার দূরের প্রায় ১৪ লক্ষ কিলোমিটার ব্যাসের সূর্যের প্রতীয়মান ব্যাসের প্রায় সমান। অর্থাৎ আকাশে আমরা যে প্রতীয়মান চাঁদ ও সূর্য দেখি তা প্রায় সমান মাপের। এই কারণে চাঁদ অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য হলেও সূর্যকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলতে পারে। যাকে আমরা বলি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

কখনো কখনো এমন হয় যে সূর্য-চাঁদ-পৃথিবী একই লাইনে থাকা সত্ত্বেও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হতে পারে না। কেননা চাঁদ রয়েছে পৃথিবী থেকে এত দূরে যে চাঁদের ছায়া পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। এমনি হলে সূর্যের মধ্যভাগ ঢাকা পড়ে, চারদিকের বেড় থেকে যায়, সূর্যকে আমরা দেখি একটা চাকার মতো।

এমনও হতে পারে সূর্য ও পৃথিবীর লাইনে বরাবর না থেকে চাঁদ রয়েছে একটু ওপরে বা নিচে। তখন আর সূর্যের সবটুকু ঢাকা পড়ে না। সূর্যগ্রহণ হয় আংশিক।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের মহিমা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। আলোকমণ্ডলের শেষটুকু চাঁদের আড়ালে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যের আলো মিলিয়ে যায়। তখনই সূর্যের চারিদিক চোখে পড়ে। আলোকমণ্ডল তখন কালো একটি চাকতির মতো, তাকে ঘিরে আছে কয়েক-হাজার কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বর্ণমণ্ডল, তার রঙ লাল। তারপরে বহু লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছটামণ্ডল।

আলোকচিত্রে দেখা যায় উত্তপ্ত গ্যাসের লকলকে শিখা সূর্যের উপরিতল থেকে বেরিয়ে এসেছে। উত্তপ্ত গ্যাসের অগ্নিময় জিহ্বা বর্ণমণ্ডল থেকে ছটামণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অগ্নিময় জিহ্বাকে বলা হয় সমুত্থান (prominence)। সমুত্থানের লাল আভা ছটামণ্ডলের ম্লান সাদা আলোর পাশে বড়োই চমৎকার দেখায়। কোনো কোনো সমুত্থান প্রবলভাবে নড়াচড়া করে আর নানারকমের চেহারা নিয়ে থাকে। কোনোটা স্তম্ভের মতো, একই রকম থেকে যায়। কোনোটা অতি উদ্ভট চেহারার, কখনো-বা প্রচণ্ড ঝাঁপ দেয়। সমুত্থানের প্রবল নড়াচড়া চলচ্চিত্রে তোলা হয়েছে। দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

এই হচ্ছে আমাদের সূর্য। আরো একবার বলি, কুণ্ডলি-পাকানো চাকতির মতো এই যে আমাদের বিশ্ব বা গ্যালাক্‌সি তার মধ্যে আছে দশ-হাজার কোটি তারা। সূর্য সেখানে একটি মাঝারিগোছের তারা মাত্র। সেটি রয়েছে গ্যালাক্‌সির একটি কুণ্ডলিতে, গ্যালাক্‌সির কেন্দ্র থেকে পঁচিশ-হাজার আলো-বছর দূরে। নয়টি গ্রহ নিয়ে একটি গ্রহমণ্ডল আছে আমাদের সূর্যের, এই গ্রহমণ্ডলের একটি পৃথিবী। পৃথিবীর অধিবাসী আমরা এই বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছি, এমন কথা কোনোক্রমেই বলা চলে না।

এই যে গ্যালাক্‌সি সেটিও কিন্তু নিজের কেন্দ্রের চারদিকে পাক খাচ্ছে। যে তারা কেন্দ্রের যতো কাছে, কেন্দ্রের চারদিকে তার পাক খাওয়ার বেগ ততো বেশি (যেমন, যে গ্রহ সূর্যের যতো কাছে তার চক্রবেগ ততো বেশি)। আমাদের সূর্য গ্যালাক্‌সির কেন্দ্রের চারদিকে একটি পাক সম্পূর্ণ করে প্রায় ২০ কোটি বছরে। সূর্যের বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর। কাজেই জন্মের পরে আমাদের এই সূর্যের গোটা পঁচিশ পাক খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

আমাদের এই গ্যালাক্‌সিতে বা বিশ্বে তারার সংখ্যা দশহাজার কোটি। সূর্য একটি মাঝারি তারা। সূর্যের চেয়ে ছোট তারা যেমন আছে, তেমনি আছে বহুগুণ বড়ো তারাও। যেমন আছে সূর্যের চেয়ে শীতল তারা, তেমনি আছে সূর্যের চেয়ে উত্তপ্ত তারাও। আমাদের

সূর্যকেই অতি বিরাট মনে হয়। সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড়ো তারার বিরাটত্ব কল্পনা করাও শক্ত। তবুও কিন্তু, তারার এমন ভিড় থাকা সত্ত্বেও, আমাদের এই গ্যালাক্সিতে স্থানাভাব্ নেই। সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের তারাটির দূরত্বও চার আলো-বছরের বেশি।

আমাদের এই গ্যালাক্সির মতো গ্যালাক্সি মহাবিশ্বে আছে কোটি কোটি। অধিকাংশ গ্যালাক্সি আমাদের এই গ্যালাক্সির মতোই কুণ্ডলি-পাকানো চাকতির মতো। কোনো কোনো গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সির চেয়েও বড়ো। সেখানেও আছে দশহাজার কোটি বা তারও বেশি তারা। আমাদের নিকটতম গ্যালাক্সিকে দেখা যায় অ্যান্ড্রোমিডা তারামণ্ডলের দিকে তাকালে। আমাদের গ্যালাক্সি থেকে সেটির দূরত্ব ২০ লক্ষ আলো-বছর। আর সবচেয়ে দূরের যে-সব গ্যালাক্সির সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তাদের দূরত্ব ৫০০ কোটি আলো-বছর। এই মহাবিশ্বের কথা চিন্তা করলে নিজেদের কত সামান্যই না মনে হয়!

তবে একথাও ঠিক, সূর্য যতোদিন আছে আমরাও আছি (যদি-না ইতিমধ্যে নিউক্লিয়র যুদ্ধ বাধিয়ে নিজেদের ধ্বংস করি)। আমাদের এই সূর্যই হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবন নির্ভর করে সূর্যের আলো ও উত্তাপের ওপরে। আমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি, সূর্যের যেমন গ্রহমণ্ডল রয়েছে তেমনি গ্রহমণ্ডল রয়েছে গ্যালাক্সির দশহাজার কোটি তারার মধ্যে আরো অনেক তারারই। এইসব গ্রহমণ্ডলের মধ্যে এমন গ্রহ নিশ্চয়ই থাকতে পারে যেখানকার জলহাওয়ার অবস্থা আমাদের এই পৃথিবীর মতো। অতএব পৃথিবীর মতো জীবনও সেখানে থাকতে পারে। এই মহাবিশ্বে মানুষের মতো বা মানুষের চেয়েও উন্নত জীবের অস্তিত্ব প্রচুর হবারই সম্ভাবনা। তবে এখনো পর্যন্ত কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ হয়নি।

আমরা জানি, সূর্যের এই গ্রহমণ্ডলে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। পৃথিবী রয়েছে সূর্য থেকে এমন একটা সঠিক দূরত্বে যার ফলে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। পৃথিবী

যদি সূর্যের আরো একটু কাছে হত তাহলে গরমে ঝলসে যেত, যদি আরো একটু দূরে থাকত তাহলে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধত। আমাদের খাদ্য, আমাদের বস্ত্র, আমাদের শক্তি (কয়লা, তেল ও জল), আমাদের ঋতু, আমাদের বর্ষা—সবই সূর্যের কল্যাণে। আগামী কয়েক হাজার-কোটি বছর ধরে সূর্য এমনি কিরণ দিয়ে চলবে, অতএব আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই।

আরো একটি কথা। পৃথিবীর অধিবাসী আমরা ভাবতে পারি মহাশূন্যে আমরা বোধহয় স্থির হয়ে আছি। আদপেই তা নয়। সূর্য সেকেণ্ডে প্রায় ২০ কিলোমিটার বেগে ছুটছে, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের টানে বাঁধা পড়া পৃথিবীও। অতএব সূর্যের ছুট আমরাও পেয়েছি। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ছুটছে। এই ছুট আমাদেরও। পৃথিবী তার নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে, বিষুববৃত্তে এই পাকের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। এই বেগে আমরাও পাক খাচ্ছি। সব মিলিয়ে পৃথিবীর মানুষ আমরা মহাশূন্যে অতি জটিল ও প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছি।

তারার জন্ম

আমাদের এই গ্যালাক্‌সিতে বা বিশ্বে দশহাজার কোটি তারা আছে। সূর্য একটি মাঝারি তারা, গ্যালাক্‌সির কেন্দ্র থেকে ২৫,০০০ আলো বছর দূরে। তারা ছাড়াও গ্যালাক্‌সির মহাশূন্যে ছড়ানো আছে ধুলো ও গ্যাসের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এতসব তারাই বা কেন, মেঘই বা কেন? সূর্য নিয়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা দেখেছি, সূর্যের বস্তুভাণ্ডারের ক্ষয় হয়ে চলেছে এবং একসময়ে সূর্য নিভে যাবে। নিভবে সমস্ত তারাও, সূর্যের চেয়ে বড়ো তারাগুলো বরং আরো তাড়াতাড়ি (কেননা বড়ো তারাতে বস্তুর ক্ষয় আরো বেশি)। তখন কী হয়? আর এই তারাগুলোর জন্মই বা কি-ভাবে? নতুন করে কি তারার জন্ম হতে পারে না? পরের অধ্যায়ে এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আমাদের আলোচনা তুলতে হবে। তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়। গ্যালাক্‌সি তো আর এই একটি নয়, কোটি কোটি—তাই বা কেন? এই কোটি কোটি গ্যালাক্‌সির উদ্ভব কি-ভাবে? কী তার ভবিষ্যৎ? এইসব প্রশ্ন নিয়েও আমরা আলোচনা তুলব।

কিন্তু তার আগে আরো ছোট একটি ব্যাপার দেখে নিতে চাই। ধরে নেওয়া যাক, আজ থেকে পাঁচশো-কোটি বছর আগে সূর্য নামক তারাটির জন্ম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই তারাটিকে ঘিরে এতসব গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু ও উল্‌কা তৈরি হল কি করে? আর সূর্যকে ঘিরেই যদি তৈরি হতে পারে তাহলে অন্য কোনো তারাকে ঘিরে তৈরি না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু অন্য কোনো তারাকে ঘিরে সত্যি সত্যিই তৈরি হয়েছে কিনা তা চোখে দেখার মতো জোরালো দূরবীন আমাদের হাতে নেই। তবে কোনো কোনো তারার চলাফেরায় সামান্য হেরফের চোখে পড়েছে, যা থেকে মনে হয় অদৃশ্য কোনো

কিছুর টান পড়ছে ওই তারার ওপরে। এই অদৃশ্য কোনো কিছু ওই তারার গ্রহমণ্ডলও হতে পারে।

যাই হোক, আমাদের সৌরমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে জানতে চেষ্টা করি, কি-ভাবে তার উদ্ভব। কল্পনা করা যাক, আজ থেকে পাঁচশো কোটি বছর আগে আমরা উপস্থিত হয়েছি।

সেই পাঁচশো কোটি বছর আগেও সূর্যের চেহারা মোটামুটি এখনকার মতোই। হয়তো-বা আরেকটু উজ্জ্বল, হয়তো-বা আরেকটু বড়ো। সূর্যের জীবনকালে পাঁচশো কোটি বছর এমন কিছু নয়। পাঁচশো কোটি বছর আগেও সূর্যের বস্তুভাণ্ডার প্রায় আজকের মতোই।

কালের মাপ বোঝাতে গিয়ে আমরা 'বছর' শব্দটি ব্যবহার করছি বটে কিন্তু আসলে তখন বছর বলে কিছু নেই। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে যে-সময় লাগে তাকে আমরা বলি বছর। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখনো পৃথিবীর জন্ম হয়নি। পৃথিবীর নয়, সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহেরও নয়। উল্কা বা ধূমকেতুরও নয়। শুধু ছিল মস্ত একটা সূর্য। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে আকাশকে নতুন মনে হত। পাঁচশো কোটি বছরের মধ্যে তারার বিন্যাসে যথেষ্ট অদলবদল হয়েছে।

সূর্য একা ছিল না। ধুলো আর গ্যাসের তৈরী মস্ত একখণ্ড মেঘ সূর্যের টানে বাঁধা পড়ে গিয়ে চাক্‌তির মতো সূর্যকে ঘিরে পাক খাচ্ছিল। 'একখণ্ড' বললাম বটে কিন্তু যেমন-তেমন খণ্ড নয়, বহু কোটি কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মস্ত একটি খণ্ড। হালের সৌরমণ্ডল সূর্যের চারদিকে যতোখানি জায়গা জুড়ে আছে প্রায় ততোখানি জায়গা জুড়ে। ৩৫নং চিত্রটি দেখলে ব্যাপারটা খানিকটা বোঝা যাবে। ছবিতে পুরো চাক্‌তিটি দেখানো হয়নি। চাক্‌তির খানিকটা অংশ কাটা। এভাবে কেটে দেখানোর উদ্দেশ্য, চাক্‌তিটি কতটা চওড়া সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া। ছবি দেখে বোঝা যাবে, চাক্‌তিটি

ক্রমেই মোটা থেকে সরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি ব্যাপার ঘটেছে যা বিশেষ করে লক্ষ করার মতো। ধুলোর কণাগুলো গোড়ার দিকে ছিল ছড়ানো ছিটনো, শেষের দিকে তা যেন জায়গায় জায়গায়
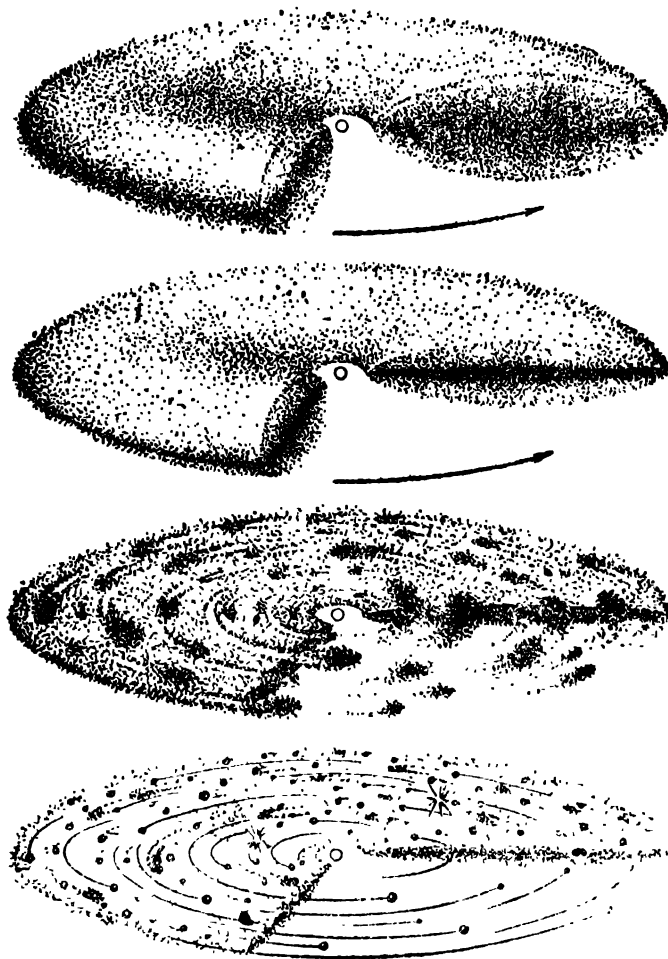
চিত্র ৩৫। সূর্যকে ঘিরে ধুলো ও গ্যাসের মেঘ

পিণ্ড পাকিয়েছে। এই পিণ্ডগুলোকে আমরা বলতে পারি গ্রহকণা বা গ্রহাণু। এতক্ষণে আমরা যেন আমাদের সৌরমণ্ডলের নিতান্তই প্রাথমিক ধরনের একটা চেহারা দেখতে পাচ্ছি।

গ্রহগুলোকে আলাদা আলাদা চেনা না যাক, অসংখ্য গ্রহাণু যেন প্রায় একই ধরনে সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে। পাক খেতে খেতে একটার সঙ্গে আরেকটার ঠোকাঠুকি হচ্ছে, একটার গায়ে আরেকটা
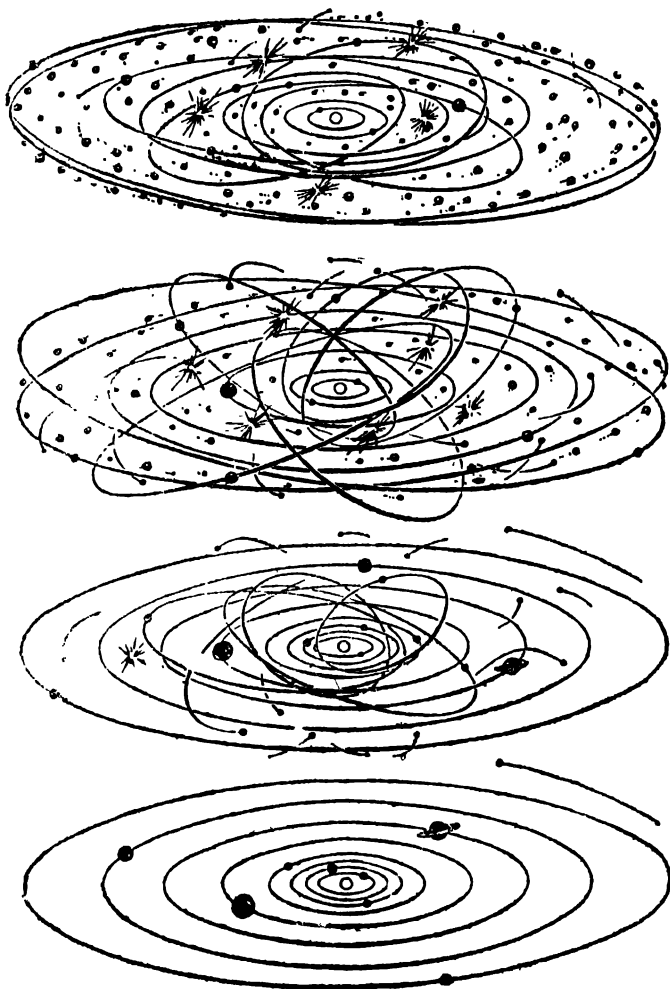
চিত্র ৩৬। সৌরমণ্ডলের জন্ম

জুড়ে যাচ্ছে—এমনি আরো নানান ধরনের ব্যাপার ঘটছে। ফলে গ্রহাণুগুলো ক্রমেই বড়ো হচ্ছে আর যে-সব গ্রহাণু এলোমেলোভাবে

ছুটোছুটি করছিল তারাও নানান টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে একটা নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে। এই ব্যাপারটা কিছুকাল ধরে চলতে চলতেই শেষপর্যন্ত আমাদের সৌরমণ্ডলের জন্ম। ৩৬নং চিত্র দেখলে ব্যাপারটা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হবে।

বাইরের মহাশূন্য থেকে তাকিয়ে দেখলে আমাদের এই সৌর-মণ্ডলের চেহারা কেমন দেখাবে তার একটা ছবি নিচে দেওয়া হল।

চিত্র ৩৭। বাইরের মহাশূন্য থেকে সৌরমণ্ডল

ছবিটি দেখলে মনে হবে গ্রহগুলোর চলাফেরা এলোমেলো নয়—একটা নিয়ম ও ছন্দ যেন বজায় আছে। প্রথমত, গ্রহদের কক্ষগুলো প্রায়-বৃত্ত, উপবৃত্ত বলে সহজে চেনা যায় না। দ্বিতীয়ত, গ্রহদের কক্ষ-গুলো প্রায় একই তলে রয়েছে। তৃতীয়ত, গ্রহগুলো একই দিকে ঘুরছে। যেখানে এতখানি মিল সেখানে এটুকু ধরে নেওয়া চলে যে গ্রহগুলোর জন্ম একই সময়ে একই ঘটনার মধ্যে দিয়ে। আলাদা-আলাদা ছাড়া-ছাড়া ঘটনার মধ্যে দিয়ে আলাদা-আলাদা ছাড়া-ছাড়া-ভাবে নয়।

কিছুকাল আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, গোড়ায় পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ছিল জ্বলন্ত গ্যাসীয় অবস্থায়। পরে ঠাণ্ডা হতে হতে এসব গ্রহের উপরিতল জমাট বেঁধেছে। কাজেই সৌরমণ্ডলের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য সে-সময়ে যে-সব তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল তা আসলে এই ব্যাপারটাকেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত। যেমন, ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার জেম্‌স জীন্‌স এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যে আজ থেকে চারশো কোটি বছর আগে অন্য একটি কাছ-ঘেঁষে-যাওয়া তারার টানে আমাদের এই সূর্যের গা থেকে খানিকটা বস্তু ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছিল এবং অতিকায় একটা চুরুটের আকার নিয়ে সূর্যের চারদিকে পাক খেতে শুরু করেছিল। এই চুরুটটাই ঠাণ্ডা হতে হতে জমে গিয়ে কয়েকটি ফোঁটায় ভাগ হয়ে পড়ে আর এই ফোঁটাগুলোই আমাদের এই সৌরমণ্ডলের এক-একটি গ্রহ। নিচের ছবি দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।
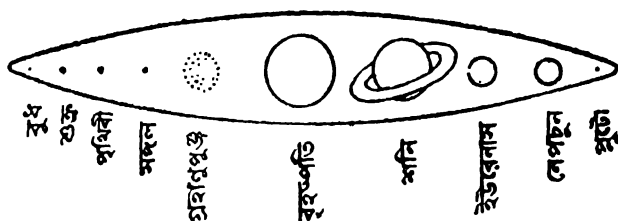
চিত্র ৩৮। জেম্‌স জীন্‌স-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সৌরমণ্ডলের জন্ম

এই শতকের গোড়ার দিকে এই তত্ত্বটি অনেকে মানতেন। কিন্তু হালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তত্ত্বটিকে বাতিল করেছেন, কারণ তত্ত্বটির সাহায্যে সৌরমণ্ডলের অনেক ব্যাপারকেই ব্যাখ্যা করা চলে না।

হালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে একমত যে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি জ্বলন্ত গ্যাসীয় অবস্থা থেকে নয়—ধুলো ও গ্যাসের ঠাণ্ডা মেঘ থেকে। ঠিক কি-ভাবে উৎপত্তি তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনও হতে পারে সূর্য ও গ্রহের জন্ম একই সময়ে। আগে সূর্য পরে গ্রহ—এমন হয়তো হয়। তবে যখনই হোক, মূল

প্রক্রিয়াটি একই। ধরে নেওয়া যাক সূর্য আগে থেকেই ছিল, ধুলো ও গ্যাসের একটা মেঘ সেই সূর্যকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। ধুলো বলতে আমরা বুঝব এমন পদার্থ যা কঠিন অবস্থায় রয়েছে। গ্যাস মানে গ্যাসীয় অবস্থার পদার্থ। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে দুটি গ্যাসের কণার মধ্যে ঠোকাঠুকি হলে তাদের বেগ কমে না, ঠোকাঠুকি হবার পরে ঠোকাঠুকি হবার আগের বেগেই তারা দু-দিকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়। কিন্তু দুটি ধুলোর কণার মধ্যে ঠোকাঠুকি হলে তাদের বেগ কমে এবং খানিকটা উত্তাপ সৃষ্টি হয়। আর ঠোকাঠুকি হবার পরে কণাদুটো সবসময়ে আলাদা আলাদা দিকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে নাও পারে--অনেক সময়ে গায়ে গায়ে জুড়ে যায়। এবারে আবার সেই ধুলো ও গ্যাসের চাক্‌তিটার কথা ভাবা যাক। ধুলোর কণাগুলোর মধ্যে অনবরত ঠোকাঠুকি হচ্ছিল, ফলে তাদের বেগ কমছিল আর গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে তারা জমাট বাঁধছিল। এই প্রক্রিয়াটি চলতে চলতেই সারা চাক্‌তির মধ্যে ছোট-বড়ো অসংখ্য গ্রহাণু তৈরি হয়েছিল। এই গ্রহাণুগুলোর মধ্যেও আবার ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। ফলে কতকগুলো গ্রহাণু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কতকগুলো হয়তো আস্ত থাকে। তারপরেও নতুন নতুন ধুলোর কণা এসে জমতে থাকে ছোট-বড়ো টুকরোগুলোর গায়ে। এই ছড়ানো-ছিটনো ছোট-বড়ো টুকরোগুলোই নানাভাবে চেহারা পালটাতে পালটাতে শেষপর্যন্ত গ্রহ-উপগ্রহ-উল্‌কা-ধূমকেতু হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমরা আগে বলেছি, স্বাভাবিক নিয়মেই সূর্যের মতো আরো অনেক তারার গ্রহমণ্ডল থাকা উচিত। খুব সম্ভবত আছেও। 'খুব সম্ভবত' বললাম এজন্য যে আমাদের হাতে সবচেয়ে জোরালো দূরবীন যা আছে তা দিয়ে সবচেয়ে কাছের তারার গ্রহমণ্ডলকেও (যদি থাকে) চাক্ষুষ দেখা সম্ভব নয়। আর এইটেই হয়েছে আমাদের মস্ত একটা অসুবিধে। অন্য একটি গ্রহমণ্ডলের হালচালকে যদি খুঁটিয়ে পরখ করা যেত তাহলে আমাদের এই সৌরমণ্ডল সম্পর্কেও অনেক

কথা চূড়ান্তভাবে বলতে পারতাম। এখনো পর্যন্ত আমাদের পর্যবেক্ষণের নাগালের মধ্যে গ্রহমণ্ডল বলতে আমাদের এই সৌরমণ্ডলকেই পেয়েছি। কাজেই জোর গলায় কিছুতেই বলা চলে না সৌরমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য কিনা—অর্থাৎ অন্য সমস্ত গ্রহমণ্ডলেও এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কিনা। এ-অবস্থায় আমাদের এই সৌরমণ্ডলের কোন্‌টা সাধারণ লক্ষণ আর কোন্‌টা বিশেষ লক্ষণ তা চূড়ান্তভাবে জানা সম্ভব নয়—কাজেই সৌরমণ্ডল সম্পর্কে চূড়ান্ত কথাটিও বলা চলে না।

অভ্যন্তরের উত্তাপ

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি, সূর্য তৈরি হয়ে গিয়েছে আর সূর্যকে ঘিরে এক-একটি গ্রহের বস্তুপুঞ্জ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। সূর্য নিয়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা দেখেছি, বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষের শক্তি কাজ করে এবং তার ফলে বস্তু সংকুচিত হয়। যতোই সংকুচিত হয় ততোই মহাকর্ষের শক্তি ছাড়া পায় ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, বস্তু থাকলেই সংকোচন, সংকোচন থাকলেই উত্তাপ। বস্তু যদি ছোট হয়—যথা, একটি ধূমকেতুর মাথায় যতোখানি বস্তু আছে, ততোখানি—তাহলে ভিতরকার এই উত্তাপ জমা হতে পারে না, উবে যায়। কিন্তু বস্তু যদি বড়ো হয় তাহলে তার সংকোচনও বেশি, উত্তাপও বেশি, এবং বেশ কিছুটা উত্তাপ বস্তুর ভিতরেই আটক পড়ে—বিশেষ করে তার কেন্দ্রীয় এলাকায়। আরও সংকোচন, আরও উত্তাপ। দুই-ই বেড়ে চলে। তারপরে এমন একটা অবস্থা আসে যখন সংকুচিত উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় এলাকা বাইরের দিকে এমন একটা চাপ সৃষ্টি করে যার ফলে সংকোচন বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুর আকার যদি একটি বিশেষ মাত্রার চেয়েও বিশাল হয় তাহলে এই অবস্থা সৃষ্টি হবার আগেই আরো একটি ব্যাপার ঘটে—নিউক্লিয়র শক্তি মুক্তি পায়। তখন সেই বস্তুপুঞ্জ হয়ে ওঠে একটি তারা। কিন্তু বস্তুর আকার যখন বিশেষ মাত্রার চেয়ে ছোট কিন্তু যথেষ্ট বড়ো, তখন

আমরা পাই গ্রহ। গ্রহের কেন্দ্রীয় এলাকায় উত্তাপ এত বেশি নয় যে নিউক্লিয়র ক্রিয়া শুরু হতে পারে। কিন্তু এত কমও নয় যে জমাট শীতল অবস্থায় থাকতে পারে। এই উত্তাপে কেন্দ্রীয় এলাকা তরল বা বাষ্প হয়ে পড়ে। ওদিকে সংকোচন বন্ধ হলে কেন্দ্রীয় এলাকার উত্তাপও আর বাড়তে পারে না। তবে অভ্যন্তরের উত্তাপ অন্য এক কারণেও সামান্য বাড়তে পারে। তা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা। পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জে তেজস্ক্রিয় পদার্থ অবশ্যই কিছু আছে, যেমন থোরিয়াম ইত্যাদি। এইসব তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর মধ্যে অনবরত ভাঙাচোরা চলে এবং তার ফলে শক্তি নিঃসৃত হয় ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়। প্রতিটি গ্রহের অভ্যন্তরের উত্তাপের এই হচ্ছে কারণ।

যাই হোক, সংকোচন বন্ধ হবার পরে নতুন করে যখন আর উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে না তখন গ্রহের কেন্দ্রীয় এলাকা ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় এলাকার উত্তাপ সারা গ্রহের বস্তুপুঞ্জের মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে যায়। সেই গড়ে-ওঠা গ্রহের গড়নটি তখন এই রকম: ঘনীভূত উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় এলাকা আর তাকে ঘিরে কম-ঘন একটি বেষ্টনী। উত্তাপ ও ঘনত্ব কেন্দ্রে অধিক, উপরিতলের দিকে ক্রমেই কম। উপরিতলের উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে একদিকে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা উত্তাপ থেকে, অন্যদিকে সূর্য থেকে পাওয়া বিকীরণ থেকে। এমনি অবস্থা বহুকাল ধরে চলে—সম্পূর্ণ গলিত অবস্থার এক বস্তুপুঞ্জ। আর তখনই অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থগুলো কেন্দ্রের দিকে ডুবে যায় আর অপেক্ষাকৃত হালকা পদার্থগুলো উপরিতলে ভেসে ওঠে। তৈরি হয় একটি আবরণ বা ম্যান্‌টল। উত্তাপ আরো কমলে তরল গ্রহটি কঠিন রূপ নিতে শুরু করে—ভিতরের দিকে নয়, আবরণের তলা থেকে বাইরের দিকে। আর আবরণটি যেই কঠিন হয়ে ওঠে তখন ভিতরের উত্তাপ বাইরে বেরুবার পথ পায় না—ভিতরেই থেকে যায়। এই কারণে গ্রহের কেন্দ্রীয় এলাকা হয় উত্তপ্ত এবং সম্ভবত তরল। আবরণের ওপরে যে-সব হালকা পদার্থ ভেসে উঠেছিল, কঠিন হবার পরে তাই নিয়েই তৈরি হয় গ্রহের ত্বক।

পৃথিবীর বেলায় দেখা গিয়েছে, ভূত্বকের সবচেয়ে প্রাচীন শিলার বয়স ৩৭০ কোটি বছরের কিছু বেশি। আর এই অবস্থায় পৌঁছতে সম্ভবত ১০০ কোটি বছর সময় লেগেছিল। চাঁদ থেকে নিয়ে আসা শিলার বয়স সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে ৪৬০ কোটি বছর।

পৃথিবী কেন তারা হয়নি? পৃথিবীকে তারা হতে হলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপ ও চাপ এত বেশি হওয়া দরকার যে নিউক্লিয়র ক্রিয়া শুরু হতে পারে। কিন্তু পৃথিবী যতোটা বড়ো হলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় মাত্রার উত্তাপ ও চাপ তৈরি হতে পারত ততোটা বড়ো পৃথিবী নয়। পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়ো বৃহস্পতিও গ্রহই থেকে গিয়েছে—তারা হতে পারেনি। হতে পারত যদি বৃহস্পতির ভর হত আরো অনেক বেশি।

যেমন হয়েছে সূর্য। গোড়ায় নিশ্চয়ই ছিল ধুলো ও গ্যাসের প্রকাণ্ড মেঘ। জড়ো হতে হতে, জড়ো হতে হতে, পাক খেয়ে চলা গোলকের চেহারা নেয়। মহাকর্ষের টানে সংকুচিত হতে শুরু করে। যতো সংকুচিত হয় ততো অভ্যন্তরের উত্তাপ ও চাপ বাড়ে। বাড়তে বাড়তে এমন এক মাত্রায় পৌঁছয় যখন নিউক্লিয়র ক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। আর তখনই হয়ে ওঠে সূর্য, বা তারা।

পৃথিবী তারা হতে পারেনি, বৃহস্পতিও নয়। হতে পারত যদি ভর হত আরো অনেক অনেক বেশি।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে তারার জন্ম। ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে গ্রহমণ্ডলেরও জন্ম। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ, আমরাও যেন বলতে পারি, খানিকটা মহাশূন্য (space) যদি থাকে আর খানিকটা বস্তু (matter) যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমরাও এমনি একটা বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন।

তারা-র দূরত্ব

পৃথিবী থেকে কতদূরে এক-একটি তারা? কোন্ উপায়ে তা জানা যায়?

যারা জমি জরিপ করে তারা খুব সহজ একটা উপায়ে দূরের জিনিসের দূরত্ব বার করে। দুই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দূরের জিনিসটিকে পর্যবেক্ষণ করে তারা স্থির করে একবিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে স্থান-পরিবর্তনের দরুন দূরের জিনিসটি কতখানি দিক-পরিবর্তন করেছে। সেই মাপটি যদি জানতে পারা যায় আর নির্দিষ্ট বিন্দুটির মধ্যেকার দূরত্ব যদি জানা থাকে—তাহলেই আঁক কষে অনায়াসেই বার করে নেওয়া চলে যে-কোনো একটি বিন্দু থেকে দূরের জিনিসটি কত দূরে। এই উপায়ে পর্বতের চুড়োয় না উঠেও জানা যেতে পারে পর্বতের চুড়োটি কত উঁচু, শত্রুর কামানের কাছে হাজির না হয়েও বলে দেওয়া যায় কামানটি কত দূরে।

আর ঠিক এই একই প্রক্রিয়ায় আকাশের তারার দূরত্বও বার করা চলে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু পাওয়ার ব্যাপারে। পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে পর্যবেক্ষণ করলেও কোন তারা কিছুমাত্র দিক-পরিবর্তন করে না। তার মানে, তারার অবস্থানে লক্ষণীয় দিক-পরিবর্তন পেতে হলে আরও অনেক বেশি দূরের দুটি বিন্দু থেকে তারাটিকে দেখা দরকার।

কক্ষপথে পৃথিবীর বার্ষিক গতির সুযোগ নিয়ে আমরা এমনি দুটি বিন্দু পেতে পারি।

বছরের কোনো এক সময়ে পৃথিবী সূর্যের যেদিকে থাকে, ছ-মাস পরে থাকে ঠিক তার বিপরীত দিকে। হিসেব করে দেখা গেছে এই ছ-মাসে পৃথিবী প্রায় ৩০ কোটি কিলোমিটার সরে আসে। এইভাবে পৃথিবীর কক্ষপথের দুই প্রান্তে দুটি বিন্দু পাওয়া যায়—মহাশূন্যে যে-দুটি বিন্দুর মাঝখানের দূরত্ব প্রায় ৩০ কোটি কিলোমিটার। মহাশূন্যের এই দুটি বিন্দু থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় কোনো কোনো তারা

অতি সামান্য দিক-পরিবর্তন করেছে। এত সামান্য যে সাধারণ চোখে ধরা যায় না। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ৩০ কোটি কিলোমিটারের এই দূরত্বকে যদি পাঁচ সেন্টিমিটারের সমান বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে সবচেয়ে সামনের তারার দূরত্ব দাঁড়ায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার। 'মাত্র পাঁচ সেন্টিমিটার পরিমাণ স্থান-পরিবর্তনের ফলে সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরের কোনো বস্তু কতটুকু দিক-পরিবর্তন করে? প্রায় কিছুই না। তবুও যেটুকু করে, তা থেকেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের কয়েকটি তারার দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারার নাম প্রক্সিমা সেণ্টরি; এই-ভাবে হিসেব করে দেখা গেছে, পৃথিবী থেকে এই তারাটির দূরত্ব ৪০ লক্ষ কোটি কিলোমিটার বা ৪.৩ আলো-বছর।

যে সব তারার দূরত্ব ৫০০ আলো-বছরেরও বেশি, তাদের দূরত্ব এই উপায়ে বার করার চেষ্টা না করাই ভালো। তাতে নিশ্চিত কোনো ফল পাওয়া যায় না।

দূরের তারার দূরত্ব বার করবার জন্য বিজ্ঞানীরা অন্য একটি অনেক বেশি নির্ভুল উপায় বার করেছেন।

কালচক্র

কোন্ বাতি কতটা দীপ্তি নিয়ে জ্বলছে, তার মাপকে ইংরেজিতে বলে ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার। তেমনি কোনো একটা তারা কতটা দীপ্তি নিয়ে জ্বলছে, তার মাপটাও বার করা হয় এই ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারেই। কিন্তু দেখা গেছে আকাশের তারার দীপ্তি সবসময়ে সমান থাকে না; নির্দিষ্ট সময় পরে পরে তারার দীপ্তি বাড়ে-কমে। আর এই দীপ্তি বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে তারা এক-একবার ফুলে ওঠে, আবার কুঁচকে যায়। আমাদের শরীরের ভিতরে হৃৎপিণ্ড যেমন এক-একবার ফুলে ওঠে, অবার কুঁচকে যায়; তেমনি আকাশের তারার শরীরেও যেন এক হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চলেছে। আমাদের শরীরের হৃৎপিণ্ড ফুলে ওঠে ও কুঁচকে গিয়ে রক্তের প্রবাহ সৃষ্টি করে; আকাশের তারার হৃৎপিণ্ড

সৃষ্টি করে দীপ্তির প্রবাহ। প্রবাহ না বলে বলা উচিত জোয়ার-ভাটা। জোয়ারের সময় তারার দীপ্তি বেড়ে যায়, ভাটার সময় দীপ্তি কমে। এই জোয়ার ও ভাটা মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ চক্রের সময় যদি হিসেব করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যে-কোনো একটি তারার পক্ষে এই সময়ের হিসেবটা সবসময়েই সমান থাকে। সময়ের এই হিসেবটার নাম দেওয়া যাক কালচক্র। সব তারার কালচক্র সমান নয়, এক-একটি তারার এক-এক মাপের। কোনো কোনো তারার কালচক্র কয়েক ঘণ্টা মাত্র, কোনো কোনোটার ত্রিশদিন। এবার প্রত্যেকটি তারার কালচক্র হিসেব করে নিয়ে তাদের কালচক্রের ক্রমানুসারে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে, তারা-গুলোকে কালচক্রের ক্রমানুসারে সাজিয়ে যে সারবন্দী চেহারা পাওয়া যায়, তারাগুলোকে দীপ্তির ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিলেও সেই সারবন্দী লাইনে কোনো অদলবদল হয় না। তার মানে তারার কালচক্রের সঙ্গে তারার দীপ্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। কোনো স্কুলের ত্রিশজন ছেলেকে প্রথমে সাজানো হল কে কতটা লম্বা সেই হিসেবে, তারপর সাজানো হল কার কত বয়স সেই হিসেবে—দু-বারেই যদি সারবন্দী লাইন একই রকম থেকে যায় তাহলে বুঝতে হবে, কোন ছেলে কতটা লম্বা তার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন ছেলের কত বয়স। এটুকু জানার পর, প্রত্যেক ছেলের বয়সের খোঁজ না করলেও চলে, ছেলেটি কতটা লম্বা তা জানতে পারলেই জেনে নেওয়া যায় ছেলেটির বয়স কত। তেমনি আকাশের কোন তারার কালচক্রের মাপ কত, তা জানতে পারলেই হিসেব করে বার করে নেওয়া যায় সেই তারার দীপ্তি কতখানি।

এবার মনে করা যাক, কোনো একটি সিধে রাস্তায় সার সার বাতি জ্বলছে ; প্রত্যেকটি আলোর ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার বা দীপ্তি একই মাপের। এবার যদি কোনো একটি জায়গা থেকে সেই আলোর সারির দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, তাহলে কোন বাতি কতখানি নিষ্প্রভ হয়েছে তা থেকে হিসেব করে নেওয়া চলে কোন বাতি

কতটা দূরে। কিন্তু বাতিগুলোর দীপ্তি যদি একই মাপের না হয়—তাহলে জানতে হবে কোন বাতির দীপ্তি কতখানি। এবার আকাশের তারাগুলোকে একরাশ বাতি বলে কল্পনা করা যাক। যদি প্রত্যেকটি বাতির সত্যিকারের দীপ্তির মাপ জানা থাকে, আর পৃথিবীতে পৌঁছতে গিয়ে সেই দীপ্তি কতখানি কমছে সেটুকু যদি জেনে নিতে পারা যায়—তাহলেই তারার দূরত্ব বার করে নেওয়া চলে।

যে তারার কালচক্র যতো দীর্ঘ—সে তারার দীপ্তি বা ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারও ততো বেশি। যেমন, যে তারার কালচক্র দু-দিনে সম্পূর্ণ হয় সে-তারার দীপ্তি আমাদের সূর্যের ২৬০ গুণ বেশি। কালচক্র যদি ১০ দিন হয়, তাহলে দীপ্তি সূর্যের ১,৭০০ গুণ বেশি। কালচক্র ৩৬ দিন হলে দীপ্তি ৯,৬০০ গুণ। যে ক'টি দৃষ্টান্ত নেওয়া হল তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারার দীপ্তি সূর্যের চেয়ে বহু গুণ বেশি হচ্ছে। বাস্তবেও দেখা গেছে, অধিকাংশ তারাই সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি দীপ্তিশীল। এজন্য অনেক অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও এইসব তারাকে পৃথিবী থেকে দেখা যায়। কিন্তু এতটা দূরত্ব থেকে আমাদের সূর্যের মতো একটা মাঝারি গোছের তারাকে দেখা যায় না।

আগে বলেছি সরাসরি হিসেব করে বড়ো জোর ৫০০ আলো-বছর দূরের তারার দূরত্ব বার করা যায়। কিন্তু এই মহাবিশ্বে ৫০০ আলো-বছর দূরত্বটা কিছুই নয়, তার বাইরেও রয়েছে বিপুল বিরাট মহাশূন্য। এই মহাবিশ্বের ব্যাপ্তির তুলনায় ৫০০ আলো-বছর দূরত্বটা প্রায় আমাদের পাড়ার চৌহদ্দির মধ্যেই পড়ে। তার বাইরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা করতে হলে ওপরে বর্ণিত উপায়ের সাহায্য নিতে হবে।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে যেমন অসংখ্য তারা দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় কোথাও কোথাও যেন খানিকটা চূর্ণ আলো লেপা রয়েছে। আসলে এই চূর্ণ-আলোর মধ্যে অনেকগুলো তারা আছে। এখন যদি দূরবীনের সাহায্যে দেখা যায় যে এই চূর্ণ-আলোর মধ্যেকার কোনো একটি তারার কালচক্র

৩৬ দিন, তাহলে বলে দেওয়া চলে যে এই তারাটির দীপ্তি সূর্যের চেয়ে ৯,৬০০ গুণ বেশি এবং পৃথিবী থেকে তারাটির দূরত্ব ৫০,০০০ আলো-বছর। ৫০,০০০ আলো-বছর! ভাবতে অবাক লাগে, কিন্তু আমরা জেনেছি মহাবিশ্বের ব্যাপ্তির তুলনায় ৫০,০০০ আলো বছর দূরত্বটা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।

তারার রূপ

বস্তু কঠিন হোক বা তরল হোক বা গ্যাসীয় হোক—সকল বস্তুর উপাদান ৯২টি মৌলিক পদার্থের পরমাণু। মৌলিক পদার্থ বলতে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্‌সিজেন, সোনা, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি। এই ৯২টি ছাড়া আরও ১৩টি কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরিতে উৎপন্ন হয়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে মহাবিশ্বের তাবৎ বস্তু এই সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণু দিয়ে তৈরী—কি পৃথিবীতে, কি সূর্যে, কি তারায়, কি গ্যালাক্‌সিতে, কি মহাশূন্যে।

এই সমস্ত মৌলিক পদার্থের উদ্ভব কি-ভাবে? তুলনাগত বিচারে কোন পদার্থ কতখানি করে আছে? অর্থাৎ কোন পদার্থ বেশি ও কোন পদার্থ কম?

দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব পাওয়া গিয়েছে উল্‌কাখণ্ড ও ভূ-ত্বকের রাসায়নিক ও ভৌত বিশ্লেষণ থেকে এবং সূর্য ও অন্যান্য তারা থেকে নিঃসৃত আলোর বর্ণালি বিশ্লেষণ থেকে।

জানা গিয়েছে, মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে হাইড্রোজেন, তারপরে হিলিয়াম। দুয়ে মিলিয়ে শতকরা ৯৮ ভাগ। প্রায় দু-ভাগে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্‌সিজেন ও নিয়ন।

তবে পৃথক পৃথকভাবে দেখলে সর্বত্রই যে এই মাত্রা বজায় আছে তা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম-বেশির মাত্রা অন্যরকম। কোনো কোনো তারায় ভারী মৌলিক পদার্থগুলোর পরিমাণ বেশি। কোনো কোনো তারায় হিলিয়ামের চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থের একান্তই অভাব।

এমনটি কেন হয় ? এখন এই প্রশ্নের একটা জবাব আমরা দিতে পারি। এখন মানে এই বিশ শতকে। উনিশ শতকেও আমরা ভাবতাম, পরমাণুকে আর ভাগ করা যায় না। কিন্তু বিশ শতকে এসে জেনেছি, পরমাণুরও একটি কাঠামো আছে—পরমাণুর গঠনে আছে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন। শুধু তাই নয়, আরো জেনেছি—আধুনিক নিউক্লিয়র ল্যাবরেটরিতে এক মৌলিক পদার্থ অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। বুঝতে পেরেছি—ল্যাবরেটরিতে যা ঘটতে পারে তাই আরো অনেক বড়ো আকারে ঘটতে পারে তারার ভিতরে। আর তা থেকেই তারার শক্তি, তার আলো বিকিরণ (তারার ভিতরে নিউক্লিয়র প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে, একথা প্রথম বলেন এডিংটন ১৯২০ সালে)। পরে জেনেছি—তারার ভিতরকার নিউক্লিয়র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মৌলিক পদার্থের উদ্ভবের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। তারার ভিতরে কোন মৌলিক পদার্থ বেশি থাকবে কোন মৌলিক পদার্থ কম, তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তারার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বে ঘটে-চলা নিউক্লিয়র প্রক্রিয়ার মধ্যে।

আমরা জেনেছি, মহাশূন্যে ধুলো ও গ্যাসের মেঘ ছড়ানো রয়েছে। এই মেঘ থেকেই তারার জন্ম। মেঘের কণিকাগুলো পরস্পরকে টানে। শুরু হয় সংকোচন। মহাকর্ষগত শক্তি মুক্তি পায়। এই শক্তির খানিকটা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, বাকিটা ভিতরকার উত্তাপ ও চাপ বাড়িয়ে তোলে। উত্তাপ বাড়তে বাড়তে এককোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মাত্রা ছাড়ালেই শুরু হয়ে যায় হাইড্রোজেনের দহন। সংকোচন বন্ধ হয়। এই হচ্ছে তারা।

তারা গড়ে ওঠার এই গোড়ার পর্বে যদি দেখা যায় তারার উজ্জ্বলতা পুরোপুরিভাবেই হাইড্রোজেনের দহন থেকে—তাহলে সেটিকে বলা হয় প্রধান অনুক্রমের তারা। তারার বয়স হিসেব করা হয় এই প্রধান অনুক্রম শুরু হবার সময় থেকে। আমাদের সূর্য একটি প্রধান অনুক্রমের তারা।

তারার জীবনের বেশির ভাগটাই কাটে প্রধান অনুক্রমে। এই

সময়ে হাইড্রোজেনের দহন চলতে থাকে ও হিলিয়াম তৈরি হয়। তারা যতো বড়ো, তার প্রধান অনুক্রমে থাকার সময় ততো কম।

তারপরে দহন চলতে চলতে তারার ভিতরকার সমস্ত হাইড্রোজেন যখন নিঃশেষ হয়ে যায় ও তৈরি হয় হিলিয়াম—তখন? তখন ভিতরকার তাপজনিত চাপ সংকোচন ঠেকাবার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না। তখন আবার শুরু হয় মহাকর্ষগত সংকোচন। তারার প্রধান অনুক্রমে থাকা এখানেই শেষ।

সংকোচন যতোই চলে ততোই ভিতরকার উত্তাপ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে এমন মাত্রায় পৌঁছে যায় যখন হিলিয়ামের একীভবন বা ফিউসন শুরু হতে পারে এবং কার্বন-অক্সিজেন ভস্ম তৈরি হয়। পরের পর্বে তারাটির দশা কী দাঁড়াবে তা নির্ভর করে তার আদি ভরের ওপরে। আদি ভর যদি যথেষ্ট বেশি না হয় তাহলে তারাটি হয়ে ওঠে—যাকে বলা হয় 'সাদা বামন' (White Dwarf)—তাই। এক্ষেত্রে কার্বন-অক্সিজেন শীতল হতে শুরু করে। আদি ভর যদি যথেষ্ট বেশি হয় তাহলে হিলিয়াম নিঃশেষিত হবার পরে আবার শুরু হয় মহাকর্ষগত সংকোচন। আবার ভিতরকার উত্তাপ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে এক সময়ে কার্বন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তৈরি হয় আরো ভারী সব মৌলিক পদার্থ। এমনিভাবে উত্তরোত্তর আরো ভারী মৌলিক পদার্থের দহন চলে এবং তারাটি এমন এক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয় যখন তার ভিতরকার বস্তু হয়ে ওঠে লোহা বা কাছাকাছি মৌলিক পদার্থ। তারপরে? তারপরের পর্বগুলো আরো জটিল। হয়তো একটি বিস্ফোরণ ঘটে, বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, এবং যেটুকু বাকি থাকে তার পরিণতি ঘটে একটি নিউট্রন তারায় বা কালো বিবরে।

তারার রূপ দেখতে গিয়ে সাদা বামন ও কালো বিবরের উল্লেখ করতে হল। পরের অধ্যায়ে এই দুটি ব্যাপারকে আমরা বিশদভাবে বলার চেষ্টা করব।

মহাবিশ্বের সংবাদ

এবারে আমরা 'আকাশগঙ্গা' গ্যালাক্‌সি ও এই গ্যালাক্‌সির বাইরে অন্যান্য গ্যালাক্‌সি ও সব মিলিয়ে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরো কিছু খবর নিতে চেষ্টা করব। আগে আমরা দেখেছি, মহাবিশ্ব সম্পর্কে প্রথম একটা ধারণা আমরা করতে পেরেছিলাম শক্তিশালী দূরবীন হাতে আসার পরে। এই দূরবীনকে বলা হয় অপ্‌টিকাল দূরবীন বা দৃশ্যমান আলোর দূরবীন। আমরা খালি চোখে যা দেখি, এই দূরবীনের সাহায্যে তাই অনেক বড়ো আকারে দেখতে পাই। অর্থাৎ, আমাদের চোখের দেখার ক্ষমতাকে এই দূরবীনের সাহায্যে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলি। ফলে দূরের কোনো আবছা জিনিস হয়তো খালি চোখে দেখতে পাই না কিন্তু এই দূরবীনের সাহায্যে দেখি। অ্যান্‌ড্রোমিডা তারা মণ্ডলের আবছা আলোটা যে পৃথক একটি গ্যালাক্‌সি তা এই দূরবীন দিয়ে তাকিয়েই আমরা টের পেয়েছিলাম।

তারপরে বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে রেডিও-দূরবীন (Radio Telescope) ও আরো বহুবিধ যন্ত্র। পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেটের সাহায্য নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আমরা আগে জেনেছি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মহাকাশের অনেক বার্তাই আটক করে। কাজেই পৃথিবীর মাটি থেকে পর্যবেক্ষণ করে মহাকাশের সম্পূর্ণ খবর পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। সেজন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। মহাকাশ-গবেষণার যুগে সেই সুযোগ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন।

এখন তাই বিশ্ব ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরো অনেক নতুন খবর আমরা জানতে পেরেছি। এখন আমরা বলতে পারি, শুধু অপ্‌টিকাল দূরবানের সাহায্যে মহাবিশ্বের যতোটুকু খবর আমরা জানতে পেরেছিলাম তা অসম্পূর্ণ ছিল।

পরে মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক খবরই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে মহাকাশ থেকে আগত রেডিও-বার্তা। আগে আমরা জেনেছি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি জানালা আছে যার ভিতর দিয়ে বিশেষ মাপের রেডিও-তরঙ্গ পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছে যেতে পারে। এই রেডিও-তরঙ্গই মহাবিশ্বের অনেক খবর আমাদের জানিয়েছে। ব্যাপারটা প্রথম কি-ভাবে জানা গেল সেই ইতিহাস এখানে বলা যেতে পারে।

আমেরিকার বেল টেলিফোন কোম্পানী ১৯৩১ সালে তার একজন কর্মচারীর ওপরে বিশেষ একটি সমস্যা নিয়ে গবেষণার ভার দিয়েছিল। এই কর্মচারীর নাম কার্ল ইয়ান্‌স্কি (Karl Jansky) আর গবেষণার বিষয়টি ছিল দূরপাল্লার টেলিফোন ও রেডিও যোগাযোগে অবিরাম একটা নয়েজ (noise) বা গোলমালের অবস্থা চলতে থাকার কারণ অনুসন্ধান। ইয়ান্‌স্কি করলেন কি, লোহার দণ্ড দিয়ে বিশেষ ধরনের এরিয়াল খাড়া করলেন এবং গোলমালের হদিস নিতে লাগলেন। দেখলেন, আবহাওয়া যখন শান্ত, বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি নেই, তখনো কিন্তু তাঁর গ্রাহকযন্ত্রে গোলমাল ধরা পড়ছে আর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে এই গোলমাল বাড়ছে-কমছে। তিনি আরো দেখলেন গোলমাল সবচেয়ে বেশি হওয়ার সময় প্রতিদিন চার মিনিট করে এগিয়ে আসছে। এ থেকে তিনি একটি অসাধারণ সিদ্ধান্ত করলেন। বললেন, এই গোলমালের উৎস হচ্ছে সৌরমণ্ডলের বাইরের মহাকাশ (আমরা আগে জেনেছি, ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে একটি নাক্ষত্র দিন ; অর্থাৎ, প্রতিদিন চার মিনিট করে এগিয়ে আকাশে তারা ওঠে)। এই প্রথম জানা গেল, পৃথিবীর গ্রাহকযন্ত্রে এই যে একটা গোলমাল সবসময়ে থেকে যায় তা আসছে মহাকাশ থেকে রেডিও-তরঙ্গের আকারে। অর্থাৎ, ব্যাপারটা যেন এই যে মহাকাশের কোনো কোনো বস্তু থেকে পৃথিবীতে রেডিও-বার্তা পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে তো এই বার্তা বিশ্লেষণ করে বার্তার উৎস সম্পর্কেও খবর পাওয়া যেতে পারে। এইভাবেই রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানের

শুরু। তারপরে রেডিও-তরঙ্গের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়ে জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা অনেক অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

ইয়ান্স্কির এই আবিষ্কারের কিছুকাল পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তখন আর বিষয়টির দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তখনো আমেরিকার এক শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালান। তাঁর নাম গ্রোট রেবার (Grote Reber)। নিজের বাড়ির বাগানে তিনি একটি রেডিও-দূরবীন খাড়া করেন। সেটি ছিল ৯ মিটার বা ৩০ ফুট ব্যাসের একটি গামলা, এমনভাবে বসানো যে আকাশের যে-কোনো দিকে ঘোরানো চলে। আর গামলার কিনার থেকে তিনটি পায়া টেনে এনে গামলার ফোকসে রাখা ছিল প্রয়োজনীয় গ্রাহক। এই রেডিও-দূরবীন ব্যবহার করে রেবার সর্বপ্রথম আকাশের রেডিও-মানচিত্র তৈরি করেন।

পৃথিবীর সেই প্রথম রেডিও-দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়েও রেবার একটি আশ্চর্য ব্যাপার ধরতে পেরেছিলেন। তা এই যে আমাদের এই গ্যালাক্সিতে যে-সব উজ্জ্বল তারা আছে—যেমন, লুব্ধক, ব্রহ্মহৃদয় ইত্যাদি—তার কোনোটি থেকেই রেডিও-বার্তা পাওয়া যায় না। অথচ মহাকাশ থেকে আগত রেডিও-বার্তা কোনো কোনো এলাকায় খুবই জোরালো। রেবার সিদ্ধান্ত করেন, মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে যে রেডিও-তরঙ্গ এসে পৌঁছয় তার উৎসের এলাকা হচ্ছে মহাকাশে ছড়ানো হাইড্রোজেন গ্যাস।

রেবারের রেডিও-দূরবীন ছিল ছোট, যেমন ছোট ছিল গ্যালিলিওর অপ্‌টিকাল দূরবীন। কিন্তু ভালো করে দেখতে হলে অপ্‌টিকাল দূরবীনকে যেমন অনেক বড়ো করা দরকার, তেমনি ভালো করে অনুসন্ধান চালাতে হলে অনেক বড়ো করা দরকার রেডিও-দূরবীনকেও। করা হয়েছেও। আমেরিকার মাউন্ট পালোমারে পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো অপ্‌টিকাল দূরবীনে আয়নার ব্যাস ৫ মিটার বা ২০০ ইঞ্চি। ইংলণ্ডের জডরেল ব্যাঙ্ক (Jodrell Bank)

রেডিও-দূরবীনে গামলার ব্যাস ৭৫ মিটার বা ২৫০ ফুট। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে জড্‌রেল ব্যাঙ্কের চেয়েও বড়ো রেডিও-দূরবীন তৈরি হয়েছে। সারা পৃথিবী এখন রেডিও-দূরবীনে ছেয়ে গিয়েছে বলা চলে। ভারতের উটকামণ্ডেও একটি রেডিও-দূরবীন আছে। তবে এটির চেহারা গামলার মতো নয়, ৫০০ মিটার লম্বা ও ৩০ মিটার চওড়া এক এরিয়ালের সারি বসিয়ে এটি তৈরী। রেডিও-বার্তা ধরার ক্ষমতার দিক থেকে ,ভারতের এই রেডিও-দূরবীন জড্‌রেল ব্যাঙ্কের চেয়ে জোরালো।

যাই হোক, গোড়ার দিকে এটা একটা অবাক হওয়্ার মতো খবর ছিল যে আমাদের গ্যালাক্‌সির কোনো উজ্জ্বল তারা থেকেই রেডিও-বার্তা পাওয়া যায় না। পরে আরো বড়ো রেডিও-দূরবীন তৈরি হতে ও অন্য বহুবিধ যন্ত্র হাতে আসতে জানা গেল আমাদের এই গ্যালাক্‌সিতে রেডিও-বার্তার উৎস হচ্ছে নীহারিকা।

পরিষ্কার রাতে আকাশের দিকে তাকালে তারাগুলোকে আমরা দেখি আলোর বিন্দুর মতো। তারাগুলো যেখানে অনেক বেশি আর অনেক দূরে সেদিকে তাকিয়ে আমাদের মনে হয় আলোর একটা ফালি যেন (ছায়াপথ)। আকাশের দিকে তাকিয়ে আরো দেখা যায় কোথাও কোথাও যেন আবছা আলোর একটু ছোপ ফুটে রয়েছে। খালি চোখে এমনি অন্তত দুটি ছোপ দেখা যায়—একটি অ্যান্‌ড্রোমিডা তারামণ্ডলে, অপরটি কালপুরুষ তারামণ্ডলে। আবছা আলোর মতো দেখতে এই বস্তুগুলোকে বলা হয় নেবুলা (Nebula, ল্যাটিন ভাষায় 'মেঘ') বা নীহারিকা। আমরা আগেই জেনেছি, অ্যান্‌ড্রোমিডা তারামণ্ডলের নীহারিকাটি হচ্ছে পৃথক একটি গ্যালাক্‌সি, ২০ লক্ষ আলো-বছর দূরে। কিন্তু কালপুরুষ তারামণ্ডলের নীহারিকাটি রয়েছে আমাদেরই গ্যালাক্‌সির মধ্যে, পৃথিবী থেকে ১৫০০ আলো-বছর দূরে।

কিন্তু যদি একটি অপ্‌টিকাল দূরবীনের মধ্যে দিয়ে তাকানো যায় তাহলে চোখে পড়ে যেমন আরো অনেক তারা তেমনি আরো অনেক

নীহারিকা। ১৭৮৪ সালে ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেসিয়ার (Messier) সর্বপ্রথম আকাশের নীহারিকাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেন। তাঁর তালিকায় অ্যান্‌ড্রোমিডা নীহারিকা হচ্ছে ৩১ সংখ্যক, অতএব এই নীহারিকাটিকে বলা হয় এম ৩১। কালপুরুষ নীহারিকা —এম ৪২।

পরে দেখা গেল গ্যালাক্‌সির মধ্যে রেডিও-বার্তার একমাত্র উৎস হচ্ছে এই নীহারিকা। বর্ণালি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় নীহারিকা হচ্ছে অতি উত্তপ্ত তারাকে ঘিরে থাকা আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাস। অতি-উত্তপ্ত তারার কাছে বিশাল এলাকা জুড়ে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকাটা আকস্মিক নয়। এই হাইড্রোজেন গ্যাস থেকেই তারা তৈরি হয়েছে। গ্যাসের মধ্যে আরো আছে প্রচুর পরিমাণ ধুলোও। গ্যাস ও ধুলো মহাকর্ষের টানে কি ভাবে পিণ্ড পাকায় ও তারা গড়ে তোলে সে-কথা আমরা আগে জেনেছি।

কালপুরুষ তারামণ্ডলে রয়েছে উত্তপ্ত তারা ও বিশাল এলাকা জুড়ে হাইড্রোজেন গ্যাস। কিন্তু ধুলো থাকার জন্য অনেকটাই দেখা যায় না। ধুলোর মেঘ কোথাও কোথাও খুবই ঘন আর স্পষ্ট আকারবিশিষ্ট। এই হচ্ছে কালো নীহারিকা—দেখে মনে হয় যেন ঝকঝকে আকাশের পটভূমিতে ঝড়ের কালো মেঘ। কালপুরুষ তারামণ্ডলের এমনি একটি কালো নীহারিকাকে বলা হয় অশ্বমুখ নীহারিকা (Horsehead Nebula)। তার চেহারাটি এমন যে সত্যিই মনে হয় কালো ঘোড়ার একটি মাথা যেন।

আমাদের এই গ্যালাক্‌সিতে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের নীহারিকাও দেখতে পাওয়া যায়। তাকে বলা হয় কর্কট নীহারিকা (Crab Nebula), কেননা এই নীহারিকাকে দেখতে কাঁকড়ার মতো। মেসিয়ার এই কর্কট নীহারিকার চেহারা দেখে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তালিকায় প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। তাই কর্কট নীহারিকার নাম এম ১।

এখন জানা গিয়েছে কর্কট নীহারিকা হচ্ছে, যাকে বলা হয়

সুপারনোভা (Supernova), তাই। সুপারনোভা হচ্ছে তারার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

কখনো কখনো দেখা যায় তারার উজ্জ্বলতা যেন আচমকা প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। এই হচ্ছে নোভা (Nova)। আমাদের গ্যালাক্সিতে নোভার সবচেয়ে সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে ১৯১৮ সালে। ১১ প্রভা-মাত্রার অতি অস্পষ্ট একটি তারা আচমকা ৭০,০০০ গুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য আকাশের অন্য সমস্ত তারাকে ম্লান করে দেয়। পরবর্তী কয়েক মাস ধরে দেখা যায় তারার বিস্ফোরণ থেকে উৎপন্ন গ্যাস নীহারিকার আকার ধারণ করে ছড়িয়ে পড়ছে।

কখনো কখনো তারার এই বিস্ফোরণ হতে পারে আরো অনেক অনেক প্রচণ্ড, সেখানে উজ্জ্বলতা বাড়তে পারে ১০ কোটি গুণ বেশি। তখন তার নাম সুপারনোভা।

চীনদেশের কাহিনী থেকে জানা যায় ১০৫৪ সালে একটি সুপারনোভা দেখা গিয়েছিল। চীনারা বলত 'আগন্তুক তারা'। সেটি ছিল বৃষরাশিতে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন ১০৫৪ সালের সেই সুপারনোভাই এখনকার কর্কট নীহারিকা। প্রায় হাজার বছর আগে তারার এক অতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে এই নীহারিকার উদ্ভব।

কর্কট নীহারিকা থেকে জোরালো রেডিও-বার্তা পাওয়া যায়। চোখে দেখা যায় এমন রেডিও-উৎস হিসেবে কর্কট নীহারিকাকেই প্রথম আলাদা করে চিনতে পারা গিয়েছে। আবার এই কর্কট নীহারিকাকে দেখেই জানতে পারা গিয়েছে মহাকাশের কোনো দৃশ্য-মান বস্তু থেকে কেন রেডিও তরঙ্গ উৎসারিত হয়ে থাকে। ব্যাপারটা এই রকম : নীহারিকার মধ্যে থাকে চৌম্বক ক্ষেত্র ও উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন। চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়ায় এই ইলেকট্রন ক্রমেই আরো বেশি বেশি বেগ অর্জন করে চলে বা ত্বরণযুক্ত হয়। তার ফলে বিকিরণ ঘটে। এই প্রক্রিয়ার নাম 'সিংক্রোট্রন বিকিরণ' (Synchro-

tron Radiation)। পরে আরো জানা গিয়েছে, রেডিও বিকিরণ ও দৃশ্যমান আলোর বিকিরণ, কর্কট নীহারিকা থেকে দুই-ই ঘটে থাকে এই প্রক্রিয়ার জন্য। নীহারিকার মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্র ও উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন কি-ভাবে আসে তার কারণও জ্যোতিঃ-বিজ্ঞানীরা অনেকখানি অনুমান করতে পারেন। মূলে যে ঘটনাটি রয়েছে তা হচ্ছে অতি-প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বা সুপারনোভা।

সুপারনোভা সচরাচর ঘটে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রতি তিনশো বছরে একটি ঘটে থাকে। কিন্তু মাত্র ৩২ বছরের ব্যবধানে দুটি সুপারনোভা ঘটে যাওয়ার দৃষ্টান্তও আছে। একটি ঘটেছিল ১৫৭২ সালে, দেখেছিলেন টাইকো ব্রাহে। অপরটি ১৬০৪ সালে, দেখেছিলেন কেপ্লার। এই দুটি সুপারনোভার যতোটুকু এখনো দেখা যায় তা খুবই আবছা।

১৯৪৭ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের গ্যালাক্সির সবচেয়ে জোরালো রেডিও-উৎস। সেটি রয়েছে ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডলে। কিন্তু আশ্চর্য, এমন জোরালো রেডিও-বার্তার উৎসটি যে কী বস্তু, তারা না নীহারিকা, তা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন রেডিও-বার্তার উৎসটি যদি চোখে দেখার মতো হয় তাহলে তা হবে খুবই আবছা।

তখন ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডলে রেডিও-উৎসের অবস্থান যতোটা সম্ভব সঠিকভাবে নিরূপণ করা হল—বিষুবাংশে ১০ সেকেণ্ড ও বিষুব-লম্বে ৪০ সেকেণ্ড মাত্রার মধ্যে। তারপরে মাউন্ট পালোমারের ২০০ ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে এলাকাটির আলোকচিত্র তোলা হল। তখন টের পাওয়া গেল রেডিও-উৎসের অবস্থানে রয়েছে অতি-আবছা একটি নীহারিকা। সম্ভবত সুপারনোভাটি ঘটেছিল ১৮শ শতকেরে গোড়ার দিকে, নিউটনের সময়ে। ধুলোর মেঘের আড়ালে ঘটার দরুন পৃথিবী থেকে দেখা যায়নি।

এবার তাহলে গোটা ব্যাপারটা তুলে ধরা চলে। সুপারনোভা হচ্ছে অতি-প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। তা থেকে নিঃসৃত হয় বিপুল

পরিমাণ শক্তি। তা থেকে উৎপন্ন হয় উচ্চবেগসম্পন্ন তড়িতাবিষ্ট কণিকা ও চৌম্বক ক্ষেত্র। উচ্চবেগসম্পন্ন ইলেকট্রন চৌম্বক ক্ষেত্রে ত্বরণযুক্ত হয় এবং সিংক্রোট্রন প্রক্রিয়ায় রেডিও বিকিরণ উৎপন্ন করে। সুপারনোভা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে—প্রথম কয়েক-শো বছর যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে, তারপরে খুবই আস্তে আস্তে। ফলে এমনকি বহু হাজার পরেও এই সুপারনোভার এলাকা থেকে রেডিও-বিকিরণ ধরা পড়তে পারে।

পালসার

রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারই আমাদের অবাক করে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে আবিষ্কৃত পালসেটিং রেডিও সোর্স (Pulsating Radio Source), বা সংক্ষেপে পালসার। আবিষ্কারটি করেন এ হিউয়িশ (A. Hewish)-এর নেতৃত্বে কেমব্রিজের একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পালসার সম্পর্কে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে পালসার থেকে রেডিও-বিকিরণ ঘটে দমকে দমকে, নির্ভুল সময়ের ব্যবধানে। পালসারকে যদি ঘড়ি হিসেবে ধরতে হয় তাহলে বলতে হবে অসাধারণ নির্ভুল ঘড়ি—পালসার থেকে প্রাপ্ত পর-পর দুই রেডিও-দমকের মধ্যেকার সময়ে সামান্যতম হেরফের ঘটে না। আজ পর্যন্ত ৫০টিরও অধিক পালসার আবিষ্কৃত হয়েছে—সময়ের ব্যবধানের মাত্রা ১/৩০ সেকেণ্ড থেকে ২ সেকেণ্ড পর্যন্ত।

প্রথম পালসারটি আবিষ্কৃত হয় ঘটনাচক্রে। দমকে দমকে রেডিও-বার্তা পাওয়ার পরে তার উৎস নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল। প্রথমে ভাবা হয়েছিল উৎস এই পৃথিবীতেই, মানুষের তৈরী। পরে নিশ্চিতভাবে জানা গেল উৎস মহাকাশের। এই প্রথম পালসারের নাম দেওয়া হল সি-পি ১৯১৯। সি-পি মানে কেম্‌ব্রিজ পালসার, ১৯১৯ মানে বিষুবাংশ ১৯ঘ ১৯মি। এই পালসার থেকে প্রাপ্ত পর-পর দুই রেডিও-দমকের মধ্যেকার সময়-ব্যবধান ১.৩৩৭৩০ সেকেণ্ডের সামান্য বেশি।

দূরত্ব হিসেব করে দেখা গেল সি-পি ১৯১৯ রয়েছে ৪০০ আলো বছর দূরে। অন্যান্য পালসারের দূরত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ২০০ থেকে ৭০০০ আলো-বছরের মধ্যে। রেডিও-দমকে সময়ের ব্যবধান ১০ থেকে ২০ মিলিসেকেণ্ড (এক-সেকেণ্ডের হাজার-ভাগের এক-ভাগে এক-মিলিসেকেণ্ড)।

পালসার বস্তুটি কী হতে পারে তার ব্যাখ্যা নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা গিয়েছে। এমন নির্ভুল সময়ের ব্যবধানে এমন দ্রুততার সঙ্গে রেডিও-দমক উৎপন্ন করে যে উৎস সেটি আসলে কী? মহাকাশে একমাত্র সেই বস্তুই দ্রুত কম্পিত বা আবর্তিত হতে পারে যার আকার খুবই ছোট ও ভর খুবই বেশি। সাদা বামনের কথা আমরা জানি। তারা নিভে যাবার পরে সংকুচিত হতে হতে সাদা বামনের চেহারা নেয়—তার আকার খুবই ছোট, ঘনত্ব খুবই বেশি, ভর সূর্যের সমান। কিন্তু সূর্যের সমান ভর হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো এমনই ঠাসা অবস্থায় রয়েছে যে সব মিলিয়ে আকারটি গ্রহের চেয়ে বড়ো নয়।

এবারে এই সাদা বামনে যদি আরো সংকোচন ঘটে? তাহলে ইলেকট্রন ও প্রোটন একীভূত হয়ে নিউট্রন তৈরি হয়। উৎপন্ন হয় নিউট্রন তারা, যার ব্যাস সম্ভবত মাত্র ১০ কিলোমিটার।

পালসার হচ্ছে নিউট্রন তারা, দমকে দমকে রেডিও বিকিরণ ঘটে তার দ্রুত আবর্তনের জন্য। লাইটহাউসের আলো যেমন একটি ফলকের আকারে বেরিয়ে আসে এবং আলোটি ঘুরতে থাকার দরুন নির্দিষ্ট স্থানের ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরে-পরে পার হয়ে যায়—পালসারের রেডিও-বিকিরণও এমনিধারা।

রেডিও গ্যালাক্সি ও কোয়াসার

এবারে আমরা তাকাব আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে মহাবিশ্বের দিকে। আমরা জেনেছি, আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে গ্যালাক্সি

আছে কোটি কোটি। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের গ্যালাক্সির মতো গ্যালাক্সি আরো কত? অন্য ধরনেরই বা কত? মহাবিশ্বে কি আরো কিছু জ্যোতিষিক ব্যাপার ঘটে থাকে? মহাবিশ্বের উদ্ভব কি ভাবে? তার পরিণতি কী?

১৮শ শতকে উইলিয়ম হার্শেল ও তাঁর ছেলে জন একটি দূরবীনের সাহায্যে আমাদের গ্যালাক্সির তারাগুলোর সন্ধান নিয়েছিলেন। তারার সন্ধান নিতে গিয়ে তাঁরা একই সঙ্গে সন্ধান পেয়ে যান হাজার হাজার নীহারিকার, মেসিয়ারের তালিকায় যেগুলোর উল্লেখ ছিল না। কিছু নীহারিকাকে চিনতে অসুবিধে হল না, সেগুলো আমাদের গ্যালাক্সির ভিতরকার ধুলো ও গ্যাসের মেঘ। কিন্তু বর্ণালি বিশ্লেষণে দেখা গেল অধিকাংশ নীহারিকার আলো-বিকিরণ তারার মতো। এগুলোকে বলা হল সাদা নীহারিকা (White Nebula)। অন্য ব্যাখ্যা না পেয়ে অনুমান করা হল যে এই সমস্ত সাদা নীহারিকা হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে অন্য সব গ্যালাক্সি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাউণ্ট উইলসনে ১০০-ইঞ্চি দূরবীনটির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল ১৯১৭ সালে। তারপরে কুড়ির দশকের গোড়ার দিকে এই দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশের প্রচুর আলোকচিত্র তোলা হয়েছিল। এই সমস্ত আলোকচিত্র থেকে হাব্‌ল দেখান যে অ্যান্‌ড্রোমিডা নীহারিকা ও অন্যান্য অনুরূপ নীহারিকায় রয়েছে অজস্র তারা এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে সাদা নীহারিকাগুলো হচ্ছে বাইরের অন্য সব গ্যালাক্সি। কয়েকটি গ্যালাক্সির দূরত্বও নিরূপণ করেন। অ্যান্‌ড্রোমিডা গ্যালাক্সি আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি, তার দূরত্ব ২০ লক্ষ আলো-বছর। অন্যান্য গ্যালাক্সি রয়েছে আরো অনেক দূরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাউণ্ট পালোমারের দূরবীন দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ১০০ কোটিরও বেশি গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই গ্যালাক্সিগুলো রয়েছে ১০০ কোটি আলো-বছর দূরত্বের মধ্যে।

দূরবীনের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে বহুসংখ্যক গ্যালাক্সিকে অপেক্ষা-

কৃত উজ্জ্বল দেখায়। সেগুলোর চেহারা সম্পর্কেও হাব্‌ল একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। ৮০ শতাংশ গ্যালাক্‌সি হচ্ছে কুণ্ডলী-বিশিষ্ট, ১৭ শতাংশ বৃত্তাকার, ২ শতাংশ বিশৃঙ্খল। আমাদের গ্যালাক্‌সি ও অ্যানড্রোমিডা গ্যালাক্‌সি উভয়েই কুণ্ডলী-বিশিষ্ট।

গ্যালাক্‌সিগুলোর আকার ও উজ্জ্বলতা বিভিন্ন রকমের। কুণ্ডলী-বিশিষ্ট গ্যালাক্‌সির ব্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২০ হাজার থেকে ১.৫ লক্ষ আলো-বছরের মধ্যে। ভর সূর্যের ভরের ১০০ কোটি থেকে ১০,০০০ কোটি গুণ। আমাদের গ্যালাক্‌সির ভর সূর্যের ভরের ১০,০০০ কোটি গুণ, উজ্জ্বলতা ১,০০০ কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতার সমান।

গ্যালাক্‌সিগুলো সমানভাবে ছড়ানো আছে, তা নয়। জোট বেঁধে আছে মনে হয়। কোথাও-বা ১০,০০০ গ্যালাক্‌সির জোট, কোথাও-বা ১৭টি গ্যালাক্‌সির জোট। আমাদের গ্যালাক্‌সি রয়েছে ছোট জোটে।

সাধারণ গ্যালাক্‌সির রেডিও-বিকিরণ

হাব্‌ল যে-ভাগে শ্রেণীবিভাগ করে গিয়েছেন তা মেনে নিয়ে আমাদের গ্যালাক্‌সি, অ্যানড্রোমিডা গ্যালাক্‌সি ইত্যাদি সাধারণ আকারের ও সাধারণ উজ্জ্বলতার গ্যালাক্‌সিকে সাধারণ গ্যালাক্‌সি হিসেবে ধরা চলে। কিন্তু রেডিও-বিকিরণের দিক থেকে দেখলে গ্যালাক্‌সি-গুলোকে বিচার করার আরো একটি উপায় পাওয়া যায়। আমাদের গ্যালাক্‌সির মতো কুণ্ডলীবিশিষ্ট গ্যালাক্‌সির আলো-বিকিরণ ও রেডিও-বিকিরণ প্রায় তুলনীয় মাত্রার। কিন্তু উপবৃত্তাকার গ্যালাক্‌সির রেডিও-বিকিরণের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম।

কিন্তু মহাকাশেই এমন গ্যালাক্‌সি আছে যা রেডিও-তরঙ্গের অসাধারণ তীব্র উৎস। এমনি একটি রেডিও-উৎস হিসেবে প্রথম যেটিকে নির্দিষ্টভাবে জানা গিয়েছে তা হচ্ছে অস্বাভাবিক এক যুগল গ্যালাক্‌সি, নাম 'সিগ্‌নাস এ' (Cygnus A)। ৫৫ কোটি আলো-

বছর দূরে থাকা সত্ত্বেও এই গ্যালাক্সি থেকে যে রেডিও-বিকিরণ পাওয়া যায় তা যে-কোনো গ্যালাক্সির চেয়ে বেশি। যথা, অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বেশি।

'সিগ্নাস এ' আবিষ্কৃত হবার পরে আরো অনেকগুলো গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাদের রেডিও-বিকিরণ সাধারণ গ্যালাক্সির চেয়ে অনেক বেশি। অত্যন্ত জোরালো এই রেডিও-উৎসগুলোকে বলা হয় রেডিও-গ্যালাক্সি।

তারপরে মহাকাশে আবিষ্কৃত হয়েছে রেডিও-গ্যালাক্সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আরো একটি রেডিও-উৎস। তার নাম কোয়াসার, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আশ্চর্যতম আবিষ্কার। কোয়াসার আসলে যে কী সে-সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনো কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন নি। বস্তুটি তারার মতো, শতকোটি সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল, চোখে দেখা যায়। আর বস্তুটি থেকে উৎসারিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি।

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্নোলজির দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে ধরা পড়ল যে একটা গুরুত্বহীন তারা অতি শক্তিশালী রেডিও-তরঙ্গের উৎস হয়ে উঠেছে। তখন তাঁরা সেই তারার দূরত্ব মাপতে চেষ্টা করলেন।

এখানে আমরা বিষয় থেকে একটু সরে গিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব মহাবিশ্বের অন্য সব গ্যালাক্সির দূরত্ব কি-ভাবে নির্ধারণ করা হয়। তারার দূরত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা দেখেছি তারার দীপ্তির কালচক্র থেকেও তারার দূরত্ব নির্ধারণ করা যায়। আমাদের গ্যালাক্সির কাছাকাছি অন্য কোনো গ্যালাক্সির দূরত্ব এই উপায়ে নির্ধারণ করা চলে। সেজন্য অবশ্যই সেই গ্যালাক্সির মধ্যেকার তারাগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাওয়া চাই। সেই গ্যালাক্সি যদি আমাদের গ্যালাক্সির কাছাকাছি হয় তাহলে তা দেখা সম্ভব। গ্যালাক্সি যদি আরো দূরের হয় যেখানে গ্যালাক্সির কোনো তারাকেই আলাদাভাবে দেখা সম্ভব নয়—

তাহলে ? সেখানেও দেখা গিয়েছে গ্যালাক্‌সির উজ্জ্বল তারাগুলোর গড় দীপ্তি সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়ে গ্যালাক্‌সির দূরত্ব নির্ধারণ করা চলে। গ্যালাক্‌সি আরো দূরের হলে তার দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা করা হয় উজ্জ্বলতা থেকে। গ্যালাক্‌সি যতো দূরের হবে তার উজ্জ্বলতা ততোই কম হবার কথা।

এই নিরিখ থেকে বিচার করতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাব্‌ল একটি অসাধারণ সূত্র আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন গ্যালাক্‌সি যতো দূরে থাকে গ্যালাক্‌সির বর্ণালির রেখাগুলো ততো দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দিকে সরে যায়। ব্যাপারটাকে বলা হয় 'লাল-অপসরণ' (Redshift)। আগে আমরা জেনেছি, বর্ণালির দৃশ্যমান অংশে দীর্ঘতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হচ্ছে লাল। গ্যালাক্‌সির বর্ণালিতে দেখা যায় বর্ণালির দাগগুলো লালের দিকে সরে গিয়েছে। কতখানি মাত্রায় সরে গিয়েছে তাকেই বলা হয় লাল-অপসরণ।

হাব্‌ল দেখলেন, গ্যালাক্‌সি যতো দূরে তার লাল-অপসরণ ততো বেশি। মোটামুটি হিসেবটা এই রকম : লাল-অপসরণের মাত্রাকে ১০,০০০ দিয়ে গুণ করলে গুণফল যা পাওয়া যায় তাই হচ্ছে দশলক্ষ আলো-বছরের হিসেবে গ্যালাক্‌সির দূরত্ব।

এখানে আরো একটি কথা আছে। লাল-অপসরণের মাত্রা যদি একের চেয়ে যথেষ্ট কম হয় তবেই এই সরল সূত্রটি প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু লাল-অপসরণের মাত্রা বেশি হলে আরো কিছু বিষয় বিবেচনার আছে।

একটি বিষয় হচ্ছে, শব্দবিজ্ঞানে যাকে বলা হয় ডপ্‌লার ক্রিয়া (Doppler Effect), তাই। মনে করা যাক, একটি ইঞ্জিন সিটি বাজিয়ে একজন শ্রোতাকে পার হয়ে যাচ্ছে। ইঞ্জিন যখন এগিয়ে আসে তখন সিটির তীক্ষ্ণতা বাড়ে, যখন দূরে চলে যায় তখন সিটির তীক্ষ্ণতা কমে। এমনটি হওয়ার কারণ, ইঞ্জিন এগিয়ে আসার সময় শব্দের তরঙ্গগুলোকে যেন ঠেসে ছোট করা হচ্ছে, আর ইঞ্জির দূরে চলে যাবার সময়ে শব্দের তরঙ্গগুলোকে যেন টেনে লম্বা করা হচ্ছে।

একই ব্যাপার ঘটতে পারে আলোক-তরঙ্গ বা রেডিও-তরঙ্গের বেলাতেও।

বর্ণালির লাল-অপসরণের মধ্যেও এই লক্ষণটি প্রকাশ পাচ্ছে যে আলোক-তরঙ্গকে যেন টেনে লম্বা করা হয়েছে বা আলোক-তরঙ্গের প্রসারণ ঘটেছে। এ থেকে ধরে নিতে হয় আলোর উৎস দূরে সরে যাচ্ছে।

তাহলে হাব্‌ল-এর সূত্রটি এই দাঁড়ায়: গ্যালাক্‌সির লাল-অপসরণ যতো বেশি তা ততো বেশি বেগে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তার দূরত্ব ততো বেশি।

হাব্‌ল দেখলেন প্রত্যেকটি গ্যালাক্‌সির আলোর বর্ণালিতে লাল-অপসরণ ঘটছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি গ্যালাক্‌সি ক্রমেই আরো দূরে সরে যাচ্ছে। তার মানে কী? মহাবিশ্ব ক্রমেই আরো বড়ো হচ্ছে বা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই আলোচনায় একটু পরেই আসছি, আমাদের আগের আলোচনা সেরে নেওয়া যাক।

লাল-অপসরণের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী রেডিও-তরঙ্গের উৎস সেই তারার দূরত্ব নির্ধারণ করতে চেষ্টা করলেন। দেখা গেল, এই তারার বর্ণালি অন্যরকম, সাধারণ বর্ণালির সঙ্গে খাপ খায় না। অর্থাৎ, এই তারাটি সাধারণ তারার মতো একেবারেই নয়। তারাটির দূরত্ব মাপতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অসমর্থ হলেন।

সমাধান খুঁজে পেতে কয়েক বছর সময় লেগে গেল। তাঁরা আবিষ্কার করলেন, তারাটির লাল-অপসরণ অনেক অনেক বেশি। এত বেশি লাল-অপসরণ এতদিন পর্যন্ত কখনো দেখা যায়নি। তার মানে, এই তারা রয়েছে অন্য সবার থেকে আরো দূরে।

এত দূরের একটি তারা চোখে দেখতে পাওয়া তখনই সম্ভব যখন সেই তারা থেকে নিঃসৃত শক্তি হয় অতি বিরাট—কোটি কোটি সূর্যের সমান। সপ্তাহে সপ্তাহে তারাটির উজ্জ্বলতা বাড়ে-কমে, তার মানে তারাটির আয়তন খুবই কম।

এই আবিষ্কারের ফলে তারাটিকে নিজস্ব একটি শ্রেণীতে ফেলতে

হল। তারা বলতে যা বোঝায় এটি তা নয়, অন্য কোনো কিছুর মতোই নয়। তারাটিকে বলা হল 'কোয়াসি-স্টেলার রেডিও সোর্স', সংক্ষেপে 'কোয়াসার' (Quasar)।

আজ পর্যন্ত প্রায় ২০০টি কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের লাল-অপসরণ থেকে বোঝা যায় মহাকাশের অন্য যে-কোনো বস্তু থেকে তারা দূরে। একটি গ্যালাক্সির লাল-অপসরণ হয়ে থাকে ০·২০, অর্থাৎ তার বর্ণালিতে দৃশ্যমান আলো ২০ শতাংশ সরে গিয়েছে। সবচেয়ে দূরের গ্যালাক্সির লাল-অপসরণ হতে পারে ০·৪০। কিন্তু অধিকাংশ কোয়াসারের লাল-অপসরণ হয়ে থাকে ২·০, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি ৩·৫। তার মানে, আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে এই কোয়াসারগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। তাই যদি হয় তাহলে কোয়াসারের দূরত্ব ১২০০ কোটি আলো-বছর।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোয়াসারগুলো রয়েছে মহাবিশ্বের একেবারে কিনার ঘেঁষে। কোয়াসার ছাড়িয়ে আর কিছু নেই। কোয়াসার হচ্ছে মহাকাশে সবচেয়ে দূরের ও সবচেয়ে প্রাচীন বস্তু। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন, গ্যালাক্সি গড়ে ওঠার একটি গোড়ার দিকের পর্ব এই কোয়াসার। আবার অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন, কোয়াসার এমন একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার যার ব্যাখ্যা বা হদিস প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য চাই নতুন বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নতুন নিয়ম। আরো একটি প্রশ্ন—কোয়াসারের বিপুল শক্তির উৎস কী? নানা বিজ্ঞানীর নানা মত, সবটাই অনুমান। প্রমাণসিদ্ধ কোনো জবাব বিজ্ঞানীরা এখনো দিতে পারেন নি।

মহাবিশ্বের উদ্ভব

জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাব্‌ল প্রথম বলেছিলেন মহাবিশ্ব ক্রমেই যেন ফুলে উঠছে বা সম্প্রসারিত হচ্ছে। কেননা বর্ণালির লাল-অপসরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে গ্যালাক্সিগুলো প্রচণ্ড বেগে পরস্পর থেকে আরও

দূরের দিকে ধাবমান। ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে তোলা বেলুনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বেলুনের সারা গায়ে ফুট-ফুট দাগ, এক-একটি দাগ যেন এক-একটি গ্যালাক্সি। যে-কোনো একটি দাগ থেকে কেউ যদি তাকায় তার মনে হবে বেলুনের গায়ের অন্য সমস্ত দাগ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে—যে দাগ যতো দূরে সেই দাগ ততো জোরে। গ্যালাক্সির লাল-অপসরণ বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাব্‌ল মহাবিশ্বকে দেখতে পেলেন এমনি এক ফুঁ-দিয়ে ফুলিয়ে-তোলা বেলুনের মতো। অর্থাৎ, সম্প্রসারণশীল (expanding) এক মহাবিশ্ব।

কেন এই সম্প্রসারণ? কী কারণে? ১৯২৭ সালে বেলজিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি লেমেটার (G. Lemaitre) একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। ব্যাখ্যাটি এই: দূর অতীতে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু একটি পুঞ্জে জমাট হয়ে ছিল—অর্থাৎ যেন অতিবৃহৎ একটি পরমাণু (Super-Atom)। আজ থেকে ১৩ শতকোটি বছর আগে এই অতি-পরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটতে শুরু করে। এই পুঞ্জগুলো থেকেই কালক্রমে তৈরি হয়েছে মহাবিশ্বের তাবৎ গ্যালাক্সি, তাবৎ তারা ও পৃথিবীর মতো তাবৎ গ্রহ। আদি সেই বিস্ফোরণের ফলে পুঞ্জগুলো প্রচণ্ড বেগে ধাবমান ছিল। এ-কারণে মহাবিশ্বের তাবৎ গ্যালাক্সি এখনো অবিরাম পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আদি এই বিস্ফোরণকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'বিগ ব্যাঙ্গ' (Big Bang), বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রচণ্ড বিস্ফোরণ'।

তারপরে ১৯৪৮ সালে পাওয়া গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তত্ত্বের পাল্‌টা আরেকটি তত্ত্ব, যাকে বলা হয় 'স্টেডি স্টেট' বা 'সদা সমাবস্থা' তত্ত্ব। দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের প্রবর্তক—হেরমান বণ্ডি ও টমাস গোল্‌ড। কোনো বিশেষ এক মুহূর্তে মহাবিশ্বের জন্ম একথা নতুন এই তত্ত্বে অস্বীকৃত হল। তত্ত্বের প্রবক্তারা বললেন, মহাবিশ্বের প্রসারণ সবসময়ে ও সমানভাবে হয়ে চলেছে এবং নতুন বস্তু সমভাবে

উৎপন্ন হয়ে চলেছে। নতুন বস্তু সমভাবে উৎপন্ন হয়ে চলেছে, একথা যদি অবিশ্বাস্য মনে হয় তাহলে অতি-পরমাণুর বিস্ফোরণও সমান অবিশ্বাস্য। তত্ত্বের প্রবর্তকরা এই বলে তর্ক তুললেন।

দুটি তত্ত্বেরই পক্ষে ও বিপক্ষে ওকালতি চলতে লাগল ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। তারপরে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি সরল মীমাংসার প্রস্তাব করলেন। বললেন, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ যদি ঘটেই থাকে তাহলে তার দরুন অবশিষ্ট কিছু বিকিরণ থেকে যাওয়া উচিত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেল্ ল্যাববেটরি থেকে সমর্থনসূচক খবর পাওয়া গেল যে প্রকৃতই এমনি বিকিরণের অস্তিত্ব রয়েছে।

তবুও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তর্কবিতর্ক চলতেই থাকে। একদলের মতে মহাবিশ্বের কোনো পরিবর্তন নেই, তার 'সদা সমাবস্থা'; অন্য-দলের মতে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ থেকে মহাবিশ্বের শুরু। এবং এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৩ শতকোটি বছর আগে।

তারপরে ১৯৫৭ সালে মহাকাশ-গবেষণার যুগ শুরু হবার পরে মহাবিশ্বকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত ও আরো অনেক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বকে প্রায় চোখের দেখার নাগালের মধ্যে পেয়ে গিয়েছেন। এখন ধরে নেওয়া চলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের তত্ত্বটিই গ্রাহ্য।

আদিতে ছিল একটি অতি-পরমাণু, বা, বলা যেতে পারে 'আদিম অগ্নিগোলক' (Primordial Fireball)। আজ থেকে ১৩ শত কোটি বছর আগে এই আদিম অগ্নিগোলকে ঘটে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। আদিম অগ্নিগোলক কোটি কোটি টুকরোয় ভাগ হয়ে চতুর্দিকে ধাবিত হয়। এই এক-একটি টুকরো থেকেই এক-একটি গ্যালাক্সি।

মহাবিশ্ব তাই অতিমাত্রায় সমতাপূর্ণ (homogeneous)। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের যে-কোনো স্থান থেকে তাকিয়ে দেখা যাক না কেন তার চেহারা একই রকম। শুধু তাই নয়, যে-কোনো স্থান থেকে যে-কোনো দিকেও একই রকম (isotropic)। এটা মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হবার মতো ব্যাপার।

বিজ্ঞানীরা আরো বলেন, বিস্ফোরণের পরে উদ্ভূত বস্তুতে হাইড্রোজেন ছিল ৭৫ শতাংশ, হিলিয়াম ২৫ শতাংশ। হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হওয়াটা অবশ্যই নিউক্লিয়র ক্রিয়ার ফলে। বিস্ফোরণ ঘটার প্রথম ১০০ সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই নিউক্লিয়র ক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল।

মহাবিশ্বের পরিণতি

মহাবিশ্ব ক্রমেই ফুলে উঠছে বা সম্প্রসারিত হচ্ছে একথা আগে বলেছি। বিজ্ঞানীরা এখন আলোচনা করছেন সমান কৌতূহল উদ্দীপক আরেকটি বিষয় নিয়ে—সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি কী ?

সম্ভাবনা দুটি। একটি এই যে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে ; গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে আরো দূরে সরতেই থাকবে, সরতেই থাকবে। এমনি হতে হতে অসীমে মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা গ্যালাক্সিগুলোর।

অপর সম্ভাবনা এই যে সম্প্রসারণ ক্রমে স্তিমিত হবে, স্তিমিত হতে হতে বন্ধ, তারপরে শুরু হবে সংকোচন। সংকোচন চলতে চলতে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাবে, পরস্পরের মধ্যে মিশে যাবে। শেষে, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আবার একটি অতি-পরমাণু।

তবে, যাই ঘটুক না কেন, পরিণতিতে পৌঁছতে সময় লাগবে হাজার হাজার কোটি বছর।

পরিণতি যতোই অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় মনে হোক, একটিকে ধরে নিতেই হয়। কোনটি ? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, তা নির্ভর করছে অতি সুনির্দিষ্ট একটি তথ্যের ওপরে।

তথ্যটি হচ্ছে মহাবিশ্বের মোট ভর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাবিশ্বের মোট ভর যদি একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে হয় তাহলে মহাকর্ষের টানও এমন যথেষ্ট হয় না যে সম্প্রসারণ বন্ধ হতে পারে।

কিন্তু মহাবিশ্বের মোট ভর যদি এই নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হয় তাহলে সম্প্রসারণ একসময়ে বন্ধ হবেই, সংকোচন শুরু হবেই, এবং পুনরায় আর একটি অতি-পরমাণুতে সবকিছুর শেষ।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে মহাবিশ্বের মোট ভর এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। চেষ্টা সমানে চলছে। মহাবিশ্বের মোট ভর নিরূপিত না হলে মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কেও বলা সম্ভব নয়।

তবে যুক্তিতর্ক সাজিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই করা যেতে পারে। এমনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন প্রিন্সটনের পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার। তিনি বলেন, মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পরিণত হবে এক অতি-ঘন বস্তুতে যার নাম 'ব্ল্যাক হোল্' (Block Hole) বা কালো বিবর। এই কালো বিবরের কথা প্রথম বলেছিলেন আইনস্টাইন, তাঁর অপেক্ষিকতার তত্ত্বের সূত্রে। কথাটি এই যে আলোর ওপরে মহাকর্ষের ক্রিয়া আছে, অতএব অতি-ঘন বস্তুতে মহাকর্ষের টান এতই বেশি হতে পারে যে আলো আটক পড়ে যায়। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে এমনি বস্তুই প্রকৃত অদৃশ্য বস্তু।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তেমন গুরুত্ব দেন নি। তারপরে আরো গবেষণা ও অনুসন্ধান চলার পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। হুইলারের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে বলা হয়, মহাবিশ্বে কালো বিবর থাকাটা কিছুমাত্র বিরল ঘটনা নয়। তারার জীবন শেষ হবার পরে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই কালো-বিবর।

এমনটি যে হতে পারে তারার জীবনচক্রের দিকে তাকালে তা মানতেই হয়। এই জীবনের শুরুতে রয়েছে মহাকাশের বিপুল ব্যাপ্তিতে ছড়ানো ঠাণ্ডা গ্যাস—যার বেশির ভাগটাই হাইড্রোজেন ও ধুলোর মেঘ। তারপরে মহাকর্ষের টানে এই মেঘ পিণ্ড বাঁধতে থাকে। এই অবস্থায় অভ্যন্তরের চাপ ও উত্তাপ একসময়ে এতই বেশি হয়ে যায় যে হাইড্রোজেন পরমাণুর একীভবন (ফিউসন) ঘটতে শুরু করে, তৈরি হয় হিলিয়াম পরমাণু ও নিঃসৃত হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি। এমনিভাবে তারার জন্ম। শত শত কোটি বছর ধরে এই

তারার শক্তি নিঃসৃত হতে থাকে। কিন্তু একসময়ে না একসময়ে তারার জ্বালানি ফুরিয়ে যাবেই। তখন শুরু হয় তার জীবন শেষ হবার পালা।

আমাদের সূর্যেরও এই একই পরিণতি, সম্ভবত তিনশত থেকে পাঁচশত কোটি বছরের মধ্যে। জীবন ফুরিয়ে এলে গোড়ার দিকে সূর্য আরো বড়ো হবে, গ্রাস করবে পৃথিবীকে, সম্ভবত মঙ্গলকেও। বিশেষ পরিস্থিতিতে সূর্যের মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিছু কিছু বস্তু মহাশূন্যে ছিটকে যাবে। তারপরে সংকোচন এবং সেটি চলতে চলতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন 'সাদা বামন'—তাই। 'সাদা বামন' হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও অতিশয় ঘন একটি পিণ্ড।

কিন্তু যে-তারার ভর সূর্যের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি তার পরিণতি কিন্তু অন্যরকম। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, লক্ষণীয় একটি বিস্ফোরণের ফলে এই তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এই হচ্ছে, আমরা জেনেছি, সুপারনোভা বা মহাতারকা। এই বিস্ফোরণের দৃশ্য আমাদের গ্যালাক্সির অধিকাংশ এলাকা থেকে দেখা যাবে, আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে থেকেও। তারপরে জমাট বাঁধতে বাঁধতে এক-সময়ে তৈরি হবে অতিবিপুল ভরবিশিষ্ট একটি বস্তু, যার নাম নিউট্রন তারা।

নিউট্রন তারার অস্তিত্ব ছিল শুধু কাগজের লেখায়। তারপরে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়ল মহাকাশ থেকে আগত অতি-তীব্র ও বিস্ময়কর রকমের নিয়মিত শক্তির ঝলক। এতই নিয়মিত যে প্রথমে ভাবা হয়েছিল অন্য কোনো সভ্য জীব রেডিও-তরঙ্গে সংকেত পাঠাচ্ছে। তারপরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে রেডিও ঝলকের উৎস হচ্ছে নিউট্রন তারা। এই নিউট্রন তারাকেই বলা হয় পালসার।

পালসারের আবিষ্কার থেকেই এসেছে কালো বিবরের তত্ত্ব। ব্যাপারটির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। কী হবে তা নির্ভর করে

আকারের ওপরে। তারার ভর যদি সূর্যের ভরের চেয়ে তিন বা চার গুণ বেশি হয় তাহলে সেই তারার জীবন শেষ হয়ে আসার সময়ে শক্তির নিঃসরণ ভিতরকার মহাকর্ষের টানের সঙ্গে সমতা রাখতে পারে না। শুরু হয় অনিবার্য সংকোচন। হতে হতে প্রথমে সাদা বামনের ঘনত্ব প্রাপ্তি, তারপরে নিউট্রন তারার। তারপরেও আরো বেশি ঘনত্ব—এতই ঘন যে তার মহাকর্ষের টান ছিঁড়ে এমনকি আলো পর্যন্ত নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না। ফল? ফল—কালো বিবর।

অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন, মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি এমনি এক বিরাট কালো-বিবরে। তার আগে গ্যালাক্‌সিগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবে ও ক্রমেই সংযুক্ত হতে থাকবে। অবশ্য প্রক্রিয়াটি শুরু হতে, যদি প্রকৃতই হয়, আরো শত শত কোটি বছর দেরি।

কালো-বিবরেই কি মহাবিশ্বের শেষ? না, শেষ নয়, উত্তরণ—একথা বলেছেন কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কালো-বিবর থেকে সাদা-বিবর। তখন আবার সম্প্রসারণ। কালক্রমে আবার সংকোচন। আবার কালো-বিবর।

কী হতে পারে কিছুই বলা যায় না। কালো-বিবরের অস্তিত্ব যদিও টের পাওয়া গিয়েছে কিন্তু তার অনেকখানিই এখনো রহস্য।

মহাবিশ্বে জীবন

কেউ জানে না মহাবিশ্বের অন্য কোথাও জীবন আছে কিনা। কোনো মানুষ কোনোদিন সরাসরি জানতে পারবে কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। মুশকিল এই যে পৃথিবীব সবচেয়ে কাছের তারাটিও পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে তার সঙ্গে বার্তা-বিনিময় করতে হলে বছর কয়েক লাগার কথা। রেডিও-তরঙ্গের গতি আলোর বেগের সমান (সেকেণ্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার)। এই বেগ খুবই বেশি কিন্তু এত বেশি নয় যে মহাশূন্যের বিপুল দূরত্বকে যথেষ্ট কম সময়ের মধ্যে অতিক্রম করতে পারে। যেমন, সূর্য থেকে পৃথিবীতে

বার্তা পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে-আট মিনিট, প্লুটো থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা, কিন্তু সবচেয়ে কাছের তারা থেকে চারবছরেরও বেশি। রেডিও-তরঙ্গের বেগ বা আলোর বেগ আরো বাড়িয়ে তোলার কোনো উপায় আমাদের জানা নেই। মনে হয়, মহাবিশ্বে আলোর বেগই বেগের উচ্চতম মাত্রা। এই মাত্রাকে ছাড়ানো যায় না।

যদিও আমাদের পক্ষে সরাসরি জানা সম্ভব নয় মহাবিশ্বের অন্য কোথাও জীবন আছে কিনা, কিন্তু জীবন নিশ্চয়ই আছে। যে-কারণে পৃথিবী সম্ভব হয়েছে, পৃথিবীতে জীবন, সেই একই কারণে। তাছাড়া, পৃথিবীর মতো না হয়ে অন্য ধরনের জীবনও তো হতে পারে। আর এই মহাবিশ্বে পৃথিবীর মতো গ্রহ এই একটিই, এমনটি হওয়ার কোনো কারণ নেই।

মহাবিশ্বে কত-যে তারা, তা কল্পনা করাও শক্ত। আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সিতেই তারা আছে দশহাজার কোটি। মহাবিশ্বে এমনি গ্যালাক্সির সংখ্যা কোটি কোটি। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতেই তারার সংখ্যা দশহাজার কোটির মতো, বা তারও বেশি।

আমাদের সূর্য নিতান্তই সাধারণ একটি তারা। এই সূর্যকে ঘিরে রয়েছে একটি গ্রহমণ্ডল। গ্রহগুলো কি-ভাবে তৈরি হয়েছে সে-সম্পর্কেও মোটামুটি একটা ধারণা আমরা পেয়েছি। এ থেকে একটা হিসেব করতে পারি আরও কতগুলো তারার গ্রহমণ্ডল থাকতে পারে। হিসেবে দেখা যায়, প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতে অন্ততপক্ষে দশলক্ষ গ্রহমণ্ডল আছে।

মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি রয়েছে কোটি কোটি। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতে গ্রহমণ্ডলের সংখ্যা যদি কম করেও দশলক্ষ হয়, তাহলে সব মিলিয়ে গ্রহের সংখ্যা কোটি-কোটি, কোটি-কোটি। সেখানে পৃথিবীর মতো গ্রহ কয়েক কোটি হবার কথা। তাই যদি হয় তাহলে এমনি কিছু গ্রহে অবশ্যই জীবন আছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ১৯৫০ সালে লিখেছিলেন, "প্রতি গ্যালাক্সিতে গ্রহমণ্ডল আছে দশলক্ষ। তাহলে মহাবিশ্বের যতোদূর

আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে গ্রহমণ্ডল থাকার কথা এক-কোটি কোটি।"

এমনি কোনো গ্রহের জীবের সঙ্গে পৃথিবী নামক গ্রহের মানুষ নামক জীবের সাক্ষাৎ পরিচয় হবে, এমন সম্ভাবনা নেই। একালের বিজ্ঞানীরা অই আমাদের গ্যালাক্সির অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান জীবের উদ্দেশে সংকেত পাঠাচ্ছেন। আজ না হোক, শত বা হাজার বা লক্ষ বছর পরে সেই সংকেতের জবাব পাওয়া যেতেও পারে।

নাও যদি পাওয়া যায়, মানুষের মহিমা তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কতটুকু আমাদের পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে কতটুকু আমরা মানুষরা—তবুও আমরা মানুষরাই মহাবিশ্বের সংবাদ নিতে পেরেছি, শুধু তাই নয়, মহাবিশ্বের সঙ্গে সরাসরি যোগ স্থাপন করতে চাইছি।

মহাবিশ্ব! আমরাই কি ধারণায় আনতে পারি? নিতান্তই একটি মাঝারি গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী (যার ব্যাস তের-হাজার কিলোমিটারেরও কম), পৃথিবীকে নিয়ে ছোট-বড়ো নয়টি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, নিতান্তই একটি মাঝারি তারা আমাদের এই সূর্য, সূর্যের মতো দশহাজার কোটি তারা নিয়ে চাকতির মতো আকারের, একলক্ষ আলো-বছর ব্যাসের, আমাদের এই ছায়াপথ বিশ্ব, মহাশূন্যে এমনি বিশ্ব বা গ্যালাক্সির সংখ্যা কোটি-কোটি, পাশাপাশি দুই বিশ্বের মাঝখানকার দূরত্ব লক্ষ-লক্ষ আলো-বছর—এই বিরাটত্বকে ঠিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে এমন ভাষা এখনো তৈরি হয়নি।

তবুও আমরা এই মানুষরাই মহাবিশ্বের সন্ধান নিচ্ছি, নিতে পেরেছি। মহাবিশ্বে প্রাণের ধারাটিও আমরা এই মানুষরাই আবিষ্কার করতে পারব।
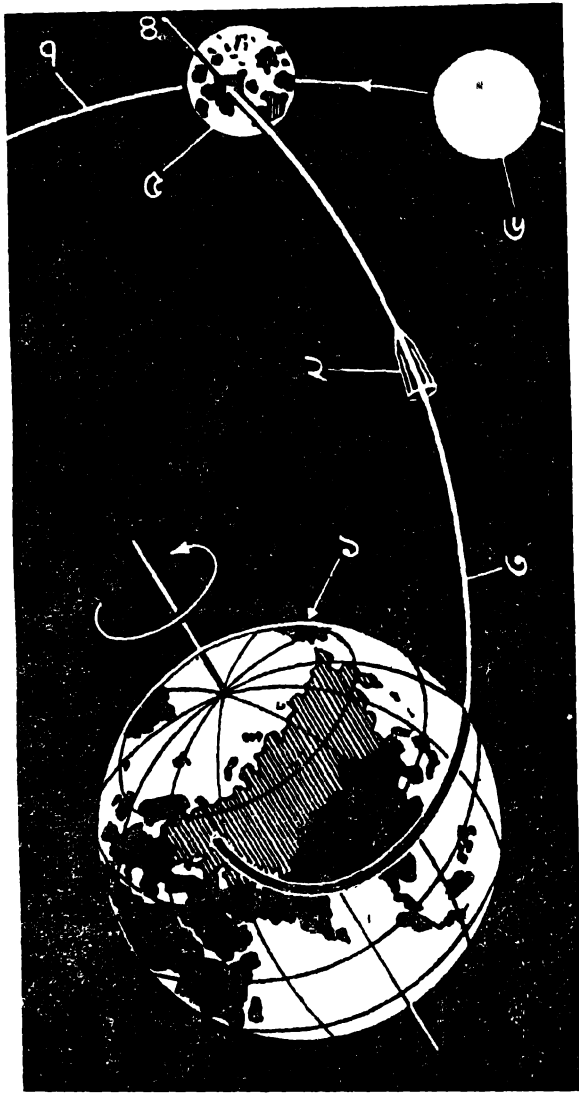
১২ সেপ্‌টেম্বর ১৯৫৯ তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উৎক্ষিপ্ত লুনিক-২ ছিল চাঁদের গায়ে আছড়ে পড়া প্রথম অনুসন্ধানী রকেট। চিত্রে তার গমনপথ চিহ্নিত। ১। পৃথিবী ২। লুনিক ৩। লুনিকের গমনপথ ৪। চাঁদের মাটিতে লুনিকর আছড়ে পড়ার এলাকা ৫। লুনিকের আছড়ে পড়ার সময়ে চাঁদের অবস্থান। ৬। লুনিকের যাত্রা-শুরুর সময়ে চাঁদের অবস্থান ৭। চাঁদের কক্ষ

তৃতীয় খণ্ড

পৃথিবী ছাড়িয়ে

বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেবতারা বাধা দেওয়াতে ত্রিশঙ্কুকে ঝুলে থাকতে হয়েছিল স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে। রামায়ণের এই কাহিনীতে আর কোনো জটিলতা নেই। সেখানে ত্রিশঙ্কুকে আকাশের দিকে ঠেলা দিয়েছিল বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যার জোর। সেই ঠেলার মাপ কত ছিল, সেকেণ্ডে কত কিলোমিটার বেগে ত্রিশঙ্কু ছুট দিয়েছিল, পৃথিবী ছাড়িয়ে কতটা উঁচুতে উঠে আসতে পেরেছিল আর তারপর সে ঘণ্টায় কত হাজার কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরেছিল—এসব খবর রামায়ণের কাহিনীতে নেই।

কিন্তু আধুনিক যুগে দেখা যাচ্ছে, মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে এই পৃথিবীর বাঁধনটাই মস্ত একটা বাধা। প্রথমত পৃথিবীর টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে এমন প্রচণ্ড একটা ছুট তৈরি হওয়া চাই। আমরা জানি, সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগে ছুট দিতে না পারলে কোনো বস্তু পৃথিবীর টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। আবার সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগের ছুট তৈরি হবার পথে মস্ত একটা বাধা হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের ঘষা লেগে লেগে গতিবেগ কমে যায়। আবার বায়ুমণ্ডল এভাবে গতিবেগকে কমিয়ে দিতে পারে বলেই মহাশূন্য থেকে ফিরতি-পথে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসার একটা উপায় থাকে—প্যারাসুটের সাহায্যে বৈমানিকরা যে-ভাবে আকাশ থেকে নামে।

বিজ্ঞানীদের মতে বায়ুমণ্ডলের শতকরা নব্বুই ভাগই জড়ো হয়ে আছে মাটির কাছাকাছি পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে। ত্রিশ

কিলোমিটারের মধ্যে আছে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ। বায়ুমণ্ডলের চাপের দিক থেকে যদি হিসেব করা যায় তাহলে পনেরো কিলোমিটার ওপরে বায়ুমণ্ডলের চাপ হবে মাটির কাছের চাপের দশ ভাগের এক ভাগ, ত্রিশ কিলোমিটার ওপরে একশো ভাগের একভাগ। যতো ওপরে ততো কম চাপ। একশো কিলোমিটার ওপরে দশ লাখ ভাগের এক ভাগ। এইভাবে ওপরে উঠতে উঠতে দু-শো কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাবার পর বায়ুমণ্ডলের চাপ যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা প্রায় না-থাকার মতো।

মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে অন্তত প্রথম দু-শো কিলোমিটার ঘন বায়ুমণ্ডল ফুঁড়ে বেরোতে হবে।

কিন্তু তাই বলে যেন মনে না করা হয় যে এই দু-শো কিলোমিটার পেরিয়ে আসতে পারলেই পৃথিবীর টানও থাকবে না বা অনেক কমে যাবে। দেখা গেছে, চার-শো কিলোমিটার উঁচুতেও পৃথিবীর টানের শতকরা প্রায় নব্বুই ভাগই থেকে যায়। পৃথিবী ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা যেতে না পারলে পৃথিবীর টান বেশ খানিকটা কমে না। যেমন, পৃথিবীর মাটিতে যে জিনিসের ওজন এক কিলোগ্রাম, পৃথিবী থেকে কুড়ি হাজার কিলোমিটার দূরে তার ওজন পঞ্চাশ গ্রাম। এক-টনের ওজন পাঁচ কিলোগ্রাম হয় একলক্ষ কিলোমিটার দূরে। আধ-কিলোগ্রাম হয় সোয়া-তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরে। তার মানে, পৃথিবী ছাড়িয়ে যতো দূরে যাওয়া যাবে ততোই কোনো জিনিসের পক্ষে আরো দূরে যাওয়াটা সহজ।

ভার ও ভারশূন্যতা

স্পুৎনিক ও অন্যান্য কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরেছে, পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসেনি। কোনো জিনিস মাটির দিকে নেমে আসে কেন? ভার বা ওজন আছে, তাই। এই জবাব কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। বলা দরকার, জিনিসটি মাটিতে নেমে আসে মাটির টানে, অর্থাৎ পৃথিবীর টানে। 'ভার' বলতে তাহলে আমরা কী বুঝব?

পৃথিবী প্রত্যেকটি জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। কোথাও কোনোরকম বাধা না থাকলে প্রত্যেকটি জিনিস পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হত। কিন্তু তা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কেন্দ্রে পৌঁছবার অনেক আগেই পৃথিবীর উপরিতলে বা পৃথিবীর মাটিতে বাধা পেতে হচ্ছে। আর পৃথিবীর টানে পড়ন্ত কোনো জিনিস যখনই বাধা পায় তখনই সেই জিনিসের মধ্যে তৈরি হয় 'ওজন' বা 'ভার'। বাধা না পাওয়া পর্যন্ত জিনিসটা ভারশূন্য। আমাদের শরীরের ভার আছে কারণ আমাদের পায়ের তলার মাটিতে বাধা পেয়ে আমাদের শরীর পৃথিবীর টানে পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হতে পারছে না। অর্থাৎ, বাধাপ্রাপ্ত টানকেই আমরা বলি ভার বা ওজন।

কিন্তু যদি কোনো বাধা না থাকে—তাহলে? যেমন, ধরা যাক, একটি লোক উঁচু থেকে জলে ঝাঁপ দিয়েছে; পাটাতন থেকে পা সরিয়ে নেবার মুহূর্তটি থেকে জলে এসে পড়ার মুহূর্তটি পর্যন্ত তার পড়ন্ত শরীর কোথাও কোনোরকম বাধা পাচ্ছে না—এই সময়টুকুতে তার শরীরে কি ভার আছে? না, নেই। একজন পাইলট এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। প্যারাস্যুট না খোলা পর্যন্ত তার শরীরের কোনো ভার নেই। অর্থাৎ, অবতরণ অবাধ হলে ভারশূন্যতার অবস্থা তৈরি হয়।

আবার উল্‌টো ব্যাপারটি ঘটানো গেলে মনে হবে ভার বেড়ে গিয়েছে। পৃথিবী ছাড়িয়ে রকেট যখন ছুট দেয় তখন রকেটের মোটর যতোক্ষণ চালু থাকে ততোক্ষণ রকেটের বেগ পলকে পলকে বেড়ে চলে। এই বেড়ে-বেড়ে-চলা বেগের নাম ত্বরণযুক্ত বেগ। রকেটের ত্বরণ যতো বেশি হয় রকেটের ভিতরকার জিনিসের ভার ততো বাড়ে। উৎক্ষেপণের সময়ে ব্যোমযানের বেগ ত্বরণযুক্ত হয়, ফলে ব্যোমযানের যাত্রীর ওজন বাড়ে, আর বাড়তি ওজনের জন্য ব্যোমযানের যাত্রীকে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু ত্বরণ যদি না থাকে, অর্থাৎ ছুট যদি সমান বেগে হয় তাহলে কোনো অস্বস্তি নেই। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী সেকেণ্ডে ২৯.৭৯ কিলোমিটার বেগে ছুটছে, পৃথিবীর সঙ্গে

সঙ্গে আমরাও, কিন্তু সেজন্য আমরা অস্বস্তি বোধ করি না। এমনকি পৃথিবী যে ছুটছে তা আমরা টের পাই আকাশের জ্যোতিষ্ককে জায়গা বদলাতে দেখে।

অবাধ অবতরণ

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অবাধ অবতরণের ফলে ভারশূন্য অবস্থা তৈরি হয়। 'অবতরণ' কথাটার অর্থ আমরা ধরি—ওপর থেকে নিচে পড়া। এটা বিশেষ অর্থে। সাধারণ অর্থে বলা চলে, অভিকর্ষের টানে অবাধে গা ভাসিয়ে চলা। এই সাধারণ অর্থে ধরলে অন্য একভাবেও এই ভারশূন্য অবস্থা তৈরি করা যেতে পারে। কি ভাবে ?

প্রথম স্পুৎনিককে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক। প্রথম স্পুৎনিককে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার খাড়াভাবে উঠিয়ে পাশের দিকে একটা ধাক্কা দেওয়া হয়েছে ; আর এই ধাক্কার ফলে স্পুৎনিক ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার বেগে ছুট দিয়েছে। এই অবস্থায় একই সঙ্গে দুটো ব্যাপার ঘটা উচিত। স্পুৎনিক ঘণ্টায় ২৮,৮০০ বেগে ছুটছে। আশা করা উচিত, এই বেগে ছুট দিতে দিতে স্পুৎনিক একসময়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে। অন্যদিকে পৃথিবীর অভিকর্ষ স্পুৎনিককে পৃথিবীর দিকে টানছে। আশা করা উচিত, এই টানে স্পুৎনিক মাটিতে নেমে আসবে। এইভাবে একই সঙ্গে দুটি বিপরীত ব্যাপার ঘটার ফলে স্পুৎনিক না পারে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতে, না পারে পৃথিবীর টানে মাটিতে নেমে আসতে। তার বদলে স্পুৎনিক পৃথিবীর চারদিকে বিশেষ এক কক্ষে পাক খেতে শুরু করে। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, এভাবে কক্ষপথে পাক খাওয়াটাও অবাধ অবতরণ—প্রতি মুহূর্তের ছুটের দরুন ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াকে টান দিয়ে কক্ষপথে নামিয়ে আনা। অর্থাৎ স্পুৎনিকটি যেন নেমেই চলেছে, নেমেই চলেছে ; তার মানে পৃথিবীর কাছে স্পুৎনিকের ভারশূন্য অবস্থা।

এমনি ভারশূন্য অবস্থা পৃথিবীর কাছে চন্দ্রের, সূর্যের কাছে সৌর-মণ্ডলের নটি গ্রহের।

জগৎ-ব্যাপারের গোড়ায় রয়েছে এই ছুট আর টান। পৃথিবীর ছুট আছে, সুতরাং পৃথিবীর উচিত বরাবর সিধে রাস্তায় ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া। আবার সূর্যের টান আছে, সুতরাং পৃথিবীর উচিত সরাসরি সূর্যের গায়ে আছড়ে পড়া। এই ছুট আর টানে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয় যার ফলে পৃথিবী না পারে ছিটকে বেরিয়ে যেতে, না পারে সূর্যের ওপরে আছড়ে পড়তে। অনবরত শুধু সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলে। যে বিশেষ বেগে ছুট দিতে পারলে কোনো বস্তু বিশেষ এক কক্ষপথে ঘুরতে থাকে—তার নাম চক্রবেগ। স্পুৎনিকের চক্রবেগ সেকেণ্ডে প্রায় আট কিলোমিটার।

অবিরাম ছুট

আমাদের আশেপাশে আমরা যা কিছু ছুট দেখি তা সবই কোনো কিছুর ঠেলায় বা টানে। ঠেলা বা টান না থাকলেই ছুট থেমে যায়। কেন থামে? মাটির সঙ্গে বা বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগে। কিন্তু বায়ুমণ্ডল সমেত এই পৃথিবী যখন মহাশূন্যে ছুট দেয় তখন কোনো কিছুর সঙ্গে তাকে ঘষা খেতে হয় না। কাজেই পৃথিবীর ছুট অবিরাম ছুট।

তেমনি প্রথম স্পুৎনিককে পৃথিবী থেকে ৯০০ কিলোমিটার ওপরে তুলে এনে ঘণ্টায় ২৮,৮ ০ কিলোমিটার বেগে বিশেষ এক কক্ষপথে ছুট দেওয়ানো হয়েছিল। তারপর থেকে রকেটের ঠেলা ছাড়াই স্পুৎনিক অনবরত ছুটেছে—একে বলা চলে অবিরাম ছুট। অন্যান্য কৃত্রিম উপগ্রহের বেলাতেও তাই। স্পুৎনিকের যদি কোনো কিছুর সঙ্গে ঘষা খাবার সম্ভাবনা না থাকত তাহলে তার ছুটও হত অবিরাম।

কিন্তু আমরা জানি স্পুৎনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ শেষপর্যন্ত পৃথিবীর মাটির দিকে নেমে আসে ও বাতাসের ঘষা লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমরা আগে বলেছি, বাতাসের এলাকা আচমকা শেষ হয়ে যায় না। অনেক দূর পর্যন্ত তার রেশ থাকে। এমনকি

দেড় হাজার কিলোমিটার ওপরেও কিছু কিছু বাতাসের কণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এইসব বাতাসের কণার সঙ্গে স্পুৎনিকের ঘষা লেগেছিল। উল্‌কাকণার সঙ্গেও ধাক্কা লেগে থাকতে পারে। ফলে স্পুৎনিকের বেগ কমেছিল। বেগ কমার সঙ্গে সঙ্গে স্পুৎনিক নেমে এসেছিল মাটির দিকে। আর যতোই নেমে এসেছিল ততোই আরো বেশি বেশি বাতাসের কণার সঙ্গে ঘষা খেয়েছিল। ফলে আরো বেগ কমেছিল, আরো নিচে নেমে এসেছিল, শেষকালে একদিন বাতাসের ঘন স্তরের মধ্যে ঢুকে উল্‌কাপিণ্ডের মতো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে কী কী আয়োজন চাই, এবার তা সূত্রবদ্ধ করা যেতে পারে।

(১) প্রথমেই দরকার প্রচণ্ড একটা ছুট তৈরি করা। এরোপ্লেন বা বেলুনের সাহায্য নেওয়া চলবে না কারণ এই দু-ধরনের ব্যোমযানই বায়ুমণ্ডলের বাইরে অচল। সুতরাং এমন একটি বিশেষ ধরনের ব্যোমযান তৈরি করতে হবে যার ছুট তৈরি করবার জন্য বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন নেই।

(২) দ্বিতীয়ত এই ছুটের মাপ এমন হওয়া চাই যেন পৃথিবীর টানকে তা ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

বায়ুমণ্ডল ছাড়াও ছুট দিতে পারে এবং পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা রাখে এমন একটি ব্যোমযান আমাদের হাতে আছে। তার নাম—রকেট।

রকেট

রকেটের ছুট কি-ভাবে তৈরি হয়? সবচেয়ে সহজ ও চলতি দৃষ্টান্তটি ধরা যাক। বন্দুক থেকে যখন গুলি ছোটে তখন বন্দুকের বাঁট কাঁধে ধাক্কা মারে। ইংরেজিতে একে বলা হয় বন্দুকের 'কিক্' বা লাথি। ব্যাপারটা যেন এই যে বন্দুকের গুলি সামনের দিকে ছুটে যাবার সময়ে পিছনদিকে লাথি মেরে যাচ্ছে। 'ডেস্টিনেশন মূন'

ফিল্ম-এর একটি দৃশ্য হয়তো অনেকের মনে আছে। রকেটের ছুট কি-ভাবে তৈরি হয় সেটা বোঝাবার জন্য ফিল্ম-এ দেখানো হয়েছে যে মিকি হাউস শূন্য থেকে মাটির দিকে তাক করে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ছে। যতোবার সে গুলি ছোঁড়ে ততোবার বন্দুক তাকে পিছনদিকে লাথি মারে। আর যতোই লাথি খায় ততোই সে শূন্যে ওঠে। কল্পনা করা যাক লক্ষ লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক মাটির দিকে তাক করে শূন্যে ঝোলানো আছে এবং সেই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক থেকে একসঙ্গে মাটির দিকে গুলি ছুটছে—তখন অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? সেই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক শূন্যের দিকে যে লাথি মারে তা অতি প্রচণ্ড। রকেটের ছুট এইভাবেই তৈরি। অবশ্য সত্যিকারের বন্দুক ও গুলি রকেটে থাকে না—সে-জায়গায় প্রচণ্ড একটা রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় আর বস্তুকণাগুলো বন্দুকের গুলির মতোই ছোটে। যেদিকে ছোটে তার উলটোদিকে থাকে প্রচণ্ড একটা লাথি—এই লাথির ঠেলাতেই রকেট শূন্যে ছুট দেয়।

এই লাথি কোত্থেকে আসে?

একটা চলতি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। রাস্তা দিয়ে যখন আমরা হাঁটি তখন আমাদের শরীর সামনের দিকে এগিয়ে যায় কেন? আমরা যখন হাঁটবার জন্য পা ফেলি, তখন আসলে পা দিয়ে মাটির ওপরে চাপ দিই। কোন্ দিকে চাপ দিই? পিছনের দিকে। পিছনদিকে চাপ দেবার জন্য আমাদের শরীর সামনের দিকে যায় কেন? ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিউটন ছোট একটি সূত্রের সাহায্যে। সূত্রটি এই: ক্রিয়া থাকলেই তার প্রতিক্রিয়া থাকে—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত। পা দিয়ে মাটির ওপরে পিছনদিকে চাপ দেওয়াটা ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার সমান মাপের ও বিপরীত দিকের একটি প্রতিক্রিয়াকেও অবশ্যই থাকতে হয়। ফলে, পা দিয়ে মাটির ওপরে পিছনদিকে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিও সমান জোরে সামনের দিকে ঠেলা মারে। এই ঠেলার জোরেই শরীর এগিয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, মাটির ঠেলায় শরীর এগিয়ে গেল কিন্তু পায়ের চাপে

মাটি সরল না কেন? এ-প্রশ্নের জবাব এই যে পৃথিবী মানুষের তুলনায় এতবেশি বড়ো যে মানুষের পায়ের চাপে পৃথিবীকে নড়ানো যায় না। কিন্তু পৃথিবী না হয়ে আরো ছোটখাটো জিনিস যদি হত তাহলে পায়ের চাপে সত্যি সত্যিই যে তা নড়ে উঠত তা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো চলে।

কল্পনা করা যাক, লাইনের ওপরে দাঁড় করানো একটা ট্রলির ওপরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের যা ওজন, ট্রলিরও তাই ওজন। আর লাইনের ওপর দিয়ে ট্রলিটি ঠিক যেন পিছলে চলে—চাকা ও লাইনের মধ্যে একটুকু ঘর্ষণ নেই। এবার যদি মানুষটি ট্রলি থেকে সামনের দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাহলে ট্রলিটিও ঝাঁপ দেওয়ার সমান বেগে পিছনদিকে ছোটে।

এই দৃষ্টান্ত থেকে রকেটের ছুট দেওয়ার ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া যায়। ধরা যাক, ট্রলির ওপরে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, আর অনেক-গুলো ইট সাজানো আছে ট্রলির ওপরে। এবারে সে যদি একটি ইট নিয়ে সামনের দিকে ছোঁড়ে—তাহলে দেখা যাবে ট্রলিটি পেছনের দিকে চলতে শুরু করেছে। হয়তো খুবই সামান্য চলা, টের পাওয়া যায় কি যায় না। কিন্তু পরক্ষণেই লোকটি যদি দ্বিতীয় আরেকটি ইট নিয়ে প্রথমবারের মতোই সমান জোরে সামনের দিকে ছুঁড়ে মারে—তাহলে? তাহলে ট্রলির পিছনদিকে চলাটা আরেকটু বাড়ে। এইভাবে লোকটি যদি অনবরত সামনের দিকে ইট ছুঁড়ে চলে তাহলে ট্রলিও পিছনদিকে ক্রমেই বেশি বেশি জোরে ছুটতে থাকে। আর দেখা যায়, প্রথম দিকে এক-একটা ইট ছুঁড়ে ট্রলির বেগকে যতোটা না বাড়াতে পারা গিয়েছিল শেষের দিকে এক-একটা ইট ছুঁড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়াতে পারা যাচ্ছে। কারণ, প্রথম দিকে ট্রলি ছিল ভারী আর যতোই ইট ছোঁড়া হচ্ছে ততোই সেটা হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে। প্রথমবার ইট ছোঁড়ার সময় ট্রলির যা ওজন ছিল, শেষের বার ইট ছোঁড়ার সময় ট্রলির ওজন যদি তার অর্ধেক হয়—তাহলে প্রথমবারের ইট ছুঁড়ে ট্রলির

যেটুকু বেগ হয়েছিল, শেষের বারের ইট ছুঁড়ে তার দ্বিগুণ বেগ হবে।

এই ছোট দৃষ্টান্ত থেকে রকেটের ছুট সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝে নেওয়া যায়। ট্রলির শেষ ইটটি ছোঁড়ার পর ট্রলি যে বেগে ছুটতে থাকবে তা নির্ভর করে কিসের ওপরে? দুটি জিনিসের ওপরে— (১) ইট ছোঁড়ার জোর, (২) ইটের সংখ্যা। ইট ছোঁড়া যতো জোরে, ট্রলির ছুটও ততো জোরে।

কিন্তু ইট ছোঁড়ার জোরকে তো আর ইচ্ছে করলেই খুশিমতো বাড়ানো যায় না। তার একটা সীমা আছে। সেই সীমায় পৌঁছে আমাদের কি ধরে নিতে হবে ট্রলির বেগ আর বাড়ানো সম্ভব নয়?

তাও সম্ভব। তা সম্ভব ইটের সংখ্যা বাড়িয়ে। কয়েকটা অঙ্কের সংখ্যা ধরে নিতে পারলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ধরা যাক, ঘণ্টায় ৩২ কিলোমিটার বেগে ইট ছোঁড়া হচ্ছে। এবার মানুষসমেত ট্রলিটিকে যদি ঘণ্টায় ৩২ কিলোমিটার বেগে ছোটাতে হয় তাহলে কত ইট দরকার? হিসেব করে দেখা গেছে, ট্রলি ও মানুষের যা ওজন তাকে ২.৭২ দিয়ে গুণ করে যা পাওয়া যায় ততো ওজনের ইট।

ট্রলিকে ঘণ্টায় ৬৪ কিলোমিটার বেগে ছোটাতে হলে ইট হওয়া দরকার মানুষ ও ট্রলির ওজনের ৭.৪ গুণ। ৯৬ কিলোমিটার করতে হলে ২০ গুণ।

লক্ষ করার বিষয়, ট্রলির ওপর থেকে যে ইটগুলো ছোঁড়া হয়েছে সেগুলো কোথায় গিয়ে পড়ছে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি। ইটগুলো ছোঁড়া হয়েছে--বাস্, ট্রলিকে ছোটাবার জন্য শুধু এইটুকুই আমাদের দরকার। তারপরে সেই ইটগুলোর যা খুশি হোক!

রকেট ছোটার ব্যাপারটাও এই ধরনের। রকেট হাওয়া ফুঁড়ে ছুটছে না শূন্য দিয়ে ছুটছে তাতে কিছু যায় আসে না—কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত রকেটের পিছন থেকে বন্দুকের গুলির মতো বা ইট-ছোঁড়ার মতো বস্তুকণা ছুটে বেরিয়ে আসে ততোক্ষণ রকেট সামনের

দিকে ঠেলা খায়। ঠেলা মানে এই নয় যে রকেট থেকে বেরিয়ে আসা বস্তুকণা বাইরের কোনো কিছুকে ঠেলা মারছে আর সেই ঠেলায় রকেট ছুটছে ; যেমন নৌকোর দাঁড় জলকে ঠেলা মারে আর সেই ঠেলায় নৌকো চলে। রকেটের ঠেলা খাওয়াটা এই ধরনের ঠেলা নয়।

তাহলে রকেটের এই ঠেলা কোত্থেকে আসে ?

নিচের ছবিটি রকেটের মোটরের। মনে করা যাক, কোনো একটা উপায়ে এই মোটরের মধ্যে প্রচণ্ড একটা রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এই বিস্ফোরণের ফলে ফেঁপে-ফুলে-ওঠা গ্যাস মোটরের চারদিকে একটা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এই মোটরের কোনো দিকে যদি কোনো রকম ফাঁক না থাকে তাহলে চারদিকের চাপ সমান হয় ও মোটামুটি স্থির থাকে। কিন্তু যদি
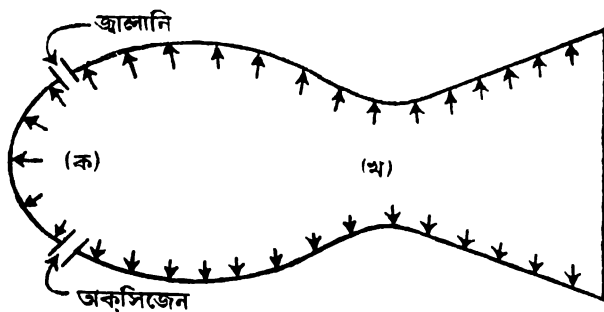
চিত্র ৩৯। রকেটের মোটর

মোটরের (খ) অংশের দিকে একটা ফাঁক থাকে, তাহলে ? (খ)-এর ফাঁক দিয়ে ফেঁপে-ফুলে-ওঠা গ্যাস প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরিয়ে যায়। ফলে সেদিকে কোনো চাপ থাকে না। কিন্তু উলটো দিকের (ক)-অংশে আগেকার মতোই চাপ থেকে যায়। এই চাপ মোটরকে ঠেলা দেয়। আর এই ঠেলার জোরেই রকেট ছুটে চলে। অর্থাৎ রকেটের ঠেলা তৈরি হচ্ছে রকেটের ভিতরেই। একদিকের ফাঁক দিয়ে গ্যাসকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে যাতে সেদিকে কোনো

চাপ না থাকে। সেই গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিক বা হাওয়ায় ধাক্কা দিক বা কোনো কিছুতেই ধাক্কা না দিক—তাতে কিছু যায় আসে না।

এতক্ষণ রকেট সম্পর্কে যা কিছু বলা হল সেগুলো এইভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায়:

(১) রকেটের ছুট বাইরের কোনো কিছুর ওপরে নির্ভর করে না। হাওয়ার ভিতর দিয়েই ছুটতে হোক বা মহাশূন্য দিয়েই ছুটতে হোক—রকেট ছুটবে নিজস্ব ঠেলার জোরে।

(২) রকেট যতো ছুটবে ততো তার জ্বালানি পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হবে। জ্বালানি যতো নিঃশেষ হবে, রকেট ততো হালকা হবে। রকেট যতো হালকা হবে ততো তার বেগ বাড়বে।

(৩) রকেটের মোটর থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসে, বা যাকে বলা যায় রকেটের নিঃসরণ—তা যতো বেগে বেরিয়ে আসে রকেটের বেগও শেষপর্যন্ত ততো বেশি হয়।

(৪) আবার জ্বালানির ওজন বাড়িয়েও এই বেগকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। জ্বালানির ওজন যদি রকেটের ওজনের ২'৭২ গুণ হয় তাহলে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ-বেগের সমান। জ্বালানি যদি রকেটের ওজনের ৭'৪ গুণ হয় তাহলে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ-বেগের দ্বিগুণ। জ্বালানি যদি রকেটের ওজনের ২০ গুণ হয় তাহলে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ-বেগের তিনগুণ।

হাউই বা উড়ন-তুবড়ি যে আকাশে ওড়ে তাকেও বলা যেতে পারে রকেটের ক্ষুদে সংস্করণ। তবে রকেটের সঙ্গে হাউই বা উড়ন-তুবড়ির একটা বড়ো রকমের পার্থক্য আছে। রকেটের মোটরে চাপ তৈরি করবার জন্য একটা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, হাউই বা তুবড়িতেও এমনি বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য যে-অক্সিজেন দরকার তা রকেটের বেলায় রকেটের ভিতরেই থাকে, কিন্তু হাউই বা তুবড়ির বেলায় বাইরের বায়ুমণ্ডল সেই

অক্‌সিজেনের যোগান দেয়। জেটপ্লেনের সঙ্গেও রকেটের তফাত এইখানেই।

আবার বলছি, হাউই বা উড়ন-তুবড়ি বা জেটপ্লেন বা রকেট যে ছুটে চলে তার কারণ এই নয় যে ভিতরের গ্যাস বাইরে বেরিয়ে এসে একটা কিছুকে ঠেলা মারছে—আর সেই ঠেলায় এরা ছুটছে। জলকে ঠেলা মেরে নৌকোর চলার মতো এদের চলা নয়। এদের বেলায় ঠেলাটি তৈরি হচ্ছে মোটরের ভিতরেই।

এবার নিচের ছবিটা দেখলে রকেটের জরুরী অংশগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হতে পারে। দুটি পৃথক কামরায় জ্বালানি আর অক্‌সিজেন থাকে। পাম্পের সাহায্যে জ্বালানি আর অক্‌সিজেনকে নিয়ে আসা হয় মোটরে। সেখানে ঘটে বিস্ফোরণ। তরল জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। জ্বালানি তরল না হয়ে কঠিনও হতে পারে। কঠিন জ্বালানি হচ্ছে জ্বালানি ও অক্‌সিজেনের একটা মিশ্রণ—পাউডারের মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো বা রবারের মতো লেই-লেই। তরল জ্বালানি ব্যবহার করার সুবিধে এই যে তার নিঃসরণ-বেগ বেশি এবং তার দহন অনায়াসেই কম-বেশি করা চলে।
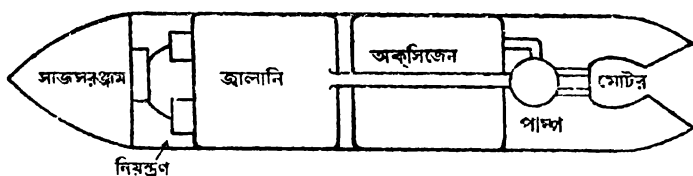
চিত্র ৪০। রকেট ও ব্যোমযান

রকেট সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা দরকার।

প্রথম বিষয়, রকেটের ঠেলা। এটি তৈরি হয় রকেটের ইঞ্জিনের ভিতরে। দুটি জিনিসের ওপরে ঠেলার পরিমাণ নির্ভর করে—জ্বালানি পোড়ার হার আর উদ্ভূত গ্যাসের নিঃসরণ-বেগ। ঠেলার মাপ নেওয়া হয় পাউণ্ডে।

ব্যোমযানকে তখনই আকাশে তোলা সম্ভব যখন ব্যোমযানের

রকেটের ঠেলা ব্যোমযানের মোট ওজনের চেয়ে বেশি। ব্যোমযানের ওজন যতো বেশি তার রকেটের ঠেলাও হওয়া চাই ততো বেশি।

দ্বিতীয় বিষয়, ব্যোমযানের মোট ওজনের সঙ্গে রকেটের ইঞ্জিনের ঠেলার অনুপাত। বিষয়টি জরুরী, কেননা রকেটের ঠেলা মোট ওজনের চেয়ে বেশি হলে তবেই ব্যোমযান আকাশে ওঠে। ব্যোমযানের মোট ওজন যদি হয় এক-কোটি পাউণ্ড আর রকেটের ঠেলাও যদি হয় এক-কোটি পাউণ্ডের তাহলে সেই ব্যোমযান মাটিতেই থেকে যায়। কিন্তু এমন যদি হয় যে ব্যোমযানটি রয়েছে পৃথিবীর কক্ষপথে, অর্থাৎ ভারহীন অবস্থায়, তাহলে কিন্তু সামান্য কয়েক পাউণ্ডের ঠেলা দিয়েই ব্যোমযানের বেগ বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে।

ঠেলার সঙ্গে ওজনের অনুপাতের একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। স্যাটার্ন-৫ রকেটের সাহায্যে যে অ্যাপোলো ব্যোমযানকে আকাশে তোলা হয়েছে তার মোট ওজন ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। আর রকেটের ঠেলার মাপ ছিল ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড। অনুপাতটা কী দাঁড়াচ্ছে? ৭৫ : ৬০ বা ৫ : ৪। ব্যোমযান আকাশে ওঠার পরে কিন্তু এই অনুপাত বদলে বদলে গিয়েছে। কেননা ব্যোমযান যতোই উঁচুতে ওঠে রকেটের ঠেলা ততোই বেড়ে-বেড়ে চলে। কারণ, বায়ুমণ্ডলের চাপ ক্রমেই কমে, জ্বালানি খরচ হয়ে যাওয়ার দরুন ও মাটি থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার দরুন ব্যোমযানের ওজনও কমতে থাকে।

তৃতীয় বিষয়, নির্দিষ্ট ঘাত (specific impulse)। এক পাউণ্ড জ্বালানি এক সেকেণ্ড ধরে পুড়লে যে ঠেলা তৈরি হয় তার নাম নির্দিষ্ট ঘাত, যা প্রকাশ করা হয় সেকেণ্ডে। এক লিটারে কত কিলোমিটার, এটা যেমন মোটর-গাড়ির চালকের কাছে একটা মাপ; তেমনি, কত সেকেণ্ডের নির্দিষ্ট ঘাত, এটা রকেট-ইঞ্জিনিয়ারের কাছে একটা মাপ। এই মাপ থেকে রকেট-ইঞ্জিনিয়ার বুঝতে পারেন কতখানি কার্যকরভাবে রকেটের জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে।

পেট্রল ও তরল অক্‌সিজেন পুড়িয়ে যে-সব রকেট-ইঞ্জিনে ঠেলা তৈরি হয় তার নির্দিষ্ট ঘাত ৩০০ সেকেণ্ড। স্যাটার্ন রকেট খানিকটা উঁচুতে ওঠার পরে এক পর্যায়ে তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্‌সিজেন পুড়িয়ে রকেটের ঠেলা তৈরি হয়, তার নির্দিষ্ট ঘাত ৪০০ সেকেণ্ড। নিউক্লিয়র রকেট তৈরি করার কথা হচ্ছে, এই রকেটের নির্দিষ্ট ঘাত ১,০০০ সেকেণ্ড। আয়ন বা ফোটোন রকেটের কথাও শোনা যাচ্ছে, যে রকেট প্রায় আলোর বেগে ছুটবে। তার নির্দিষ্ট ঘাত হবে ১৫,০০০ সেকেণ্ড।

নিউক্লিয়র বা ফোটোন রকেট পরের কথা। এখনো পর্যন্ত নির্ভর রাসায়নিক রকেট। তার নির্দিষ্ট ঘাত ৪০০ সেকেণ্ডের বেশি নয়। এই রকেটের সাহায্যেই সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা চাঁদ মঙ্গল ও শুক্রের দেশে ব্যোমযান পাঠিয়েছেন, মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি পায়োনিয়র ব্যোমযান পাঠিয়েছেন বৃহস্পতি ছাড়িয়ে, প্লুটো ছাড়িয়ে, বিশ্বলোকের দিকে।

ধাপ-রকেট

রকেটের বেগ নির্ভর করে তার জ্বালানির নিঃসরণ-বেগের ওপরে। আমরা আগেই জেনেছি, রকেটকে যদি নিঃসরণ-বেগের সমান বেগে ছুট দেওয়াতে হয় তাহলে জ্বালানির ওজন হওয়া দরকার ব্যোমযানের ওজনের ২.৭২ গুণ। দ্বিগুণ করতে হলে ৭.৪ গুণ। তিনগুণ করতে হলে ২০ গুণ।

রাসায়নিক জ্বালানির নিঃসরণ-বেগ সাধারণত হয়ে থাকে সেকেণ্ডে ২.১৮ কিলোমিটার। এই নিঃসরণ-বেগকে পাঁচগুণ করলেও পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগের (সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার) মাত্রায় পৌঁছানো যায় না। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, সেকেণ্ডে ২.১৮ কিলোমিটার নিঃসরণ-বেগের জ্বালানি ব্যবহার করে রকেটের চূড়ান্ত বেগকে যদি সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটারের নিষ্ক্রমণ-বেগে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে জ্বালানির ওজন হওয়া দরকার রকেটের ওজনের

৯৯৯ গুণ। মনে করা যাক, রকেটের ওজন ১ টন, তাহলে জ্বালানির ওজন হবে ৯৯৯ টন। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ, রকেটের সাজসরঞ্জাম, বিভিন্ন কক্ষ, আরোহী, জ্বালানির ট্যাংক— ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ওজন যদি ১ টনের মধ্যে নিয়ে আসা যায়, তাহলে সেখানে ৯৯৯ টন জ্বালানি নেবার মতো জায়গা রাখতে হবে। রকেটের ওজন যতো বাড়বে, জ্বালানির ওজন ততো বাড়বে। রকেটের ওজন যদি হয় ৬ টন, তাহলে জ্বালানির ওজন হবে ৫,৯৯৪ টন। মার্কিন এক্স্‌প্লোরার-১ উপগ্রহের ওজন ছিল মাত্র ৩১ পাউণ্ড। কিন্তু এই উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত রকেটের ওজন ছিল ৬৪,০০০ পাউণ্ড, আর উচ্চতা সাত-তলার সমান।

সুতরাং অন্য কোনো উপায়ের কথা ভাবা দরকার। এমন কোনো উপায় যাতে কম পরিমাণ জ্বালানি নিয়ে রকেটকে নিষ্ক্রমণ-বেগে ছোটানো যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ উপায়টির নাম দিয়েছেন স্টেপ-রকেট বা ধাপ-রকেট। ধাপ-রকেটে নিষ্ক্রমণ-বেগে পৌঁছনো হয় ধাপে ধাপে। দুই ধাপ যদি হয় তাহলে প্রথম ধাপে ৫.৬ কিলোমিটার, দ্বিতীয় ধাপে বাকি ৫.৬ কিলোমিটার।

ব্যাপারটি ঘটানো হবে এইভাবে: যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি সমেত মূল রকেটটিকে পুরে দেওয়া হবে দ্বিতীয় আরেকটি রকেটের মধ্যে যার নাম সহায়ক রকেট। প্রথমে বাইরের দিকের এই সহায়ক রকেটটি চালু করা হবে। ফলে মূল রকেট সমেত এই সহায়ক রকেট অনেকখানি উঁচুতে উঠে আসবে ও অনেকখানি বেগ সঞ্চয় করবে। তারপরে সহায়ক রকেটের সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষ হবার পরে সেই রকেট আপনা থেকেই খসে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে চালু হবে মূল রকেট। তার মানে, মূল রকেটটি চালু হবার সময়েই অনেকখানি বেগ তার মধ্যে এসে গিয়েছে অথচ সেজন্য মূল রকেটকে বাড়তি কোনো বোঝা টানতে হচ্ছে না (কারণ জ্বালানি শেষ হবার পরে সহায়ক রকেট সমস্ত বোঝা সমেত আপনা থেকেই খসে

পড়েছে)। কাজেই এক্ষেত্রে মূল রকেটটিকে নিষ্ক্রমণ-বেগে ছুট দেওয়ানো অপেক্ষাকৃত সহজ এবং অনেক কম জ্বালানিতেই তা করা চলে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ধাপ-রকেটের আসল সুবিধে হচ্ছে এই যে কোনো রকেটকে কোনো সময়ে বাড়তি বোঝা টানতে হচ্ছে না। অপ্রয়োজনীয় বোঝা সঙ্গে সঙ্গে খসিয়ে ফেলা হচ্ছে।

রকেটের ধাপের সংখ্যা দুই না হয়ে তিন বা চার বা পাঁচ হতেও কোনো বাধা নেই। ধাপের সংখ্যা যতো বাড়ে রকেটের বেগও ততো বাড়ে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ধাপ-রকেটের ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। মনে করা যাক পাঁচ কিলোগ্রাম ওজনের একটি বস্তুকে নিষ্ক্রমণ-বেগে ছুট দেওয়াতে হবে। যদি পাঁচ ধাপের রকেট ব্যবহার করা হয় তাহলে জ্বালানি সমেত রকেটের মোট ওজন হয় ৩৭৫ টন। আর দশ-ধাপের হলে ৬০ টন।

অ্যাপোলো ব্যোমযানকে চাঁদের দেশে পাঠাবার জন্য যে স্যাটার্ন-৫ রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি ছিল তিন-ধাপের। প্রথম দুই ধাপের জ্বালানি পুড়িয়ে ব্যোমযানকে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিটি ধাপেই জ্বালানি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বোঝা সমেত রকেট খসে পড়েছিল। উৎক্ষেপণের সময়ে ব্যোমযান সমেত রকেটের মোট ওজন ছিল বারো হাজার টনেরও বেশি। সেখানে ব্যোমযানের তিনটি অংশের (কমাণ্ড মডিউল, সার্ভিস মডিউল ও চন্দ্র অভিযান মডিউল) মোট ওজন ছিল মাত্র প্রায় ৪৪ টন। উৎক্ষেপণের সময়ে সব মিলিয়ে কাঠামোর উচ্চতা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১১০ মিটার।

মহাকাশ-অভিযানের উপযোগী ব্যোমযান তৈরির কাজটি অবশ্যই অতি কঠিন ও দুরূহ। অনেক কিছু বিবেচনায় রেখে এ-কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।

তেরো শতকে চীনারা একধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত যার নাম ছিল রকেট। এই রকেট সম্ভবত প্রকৃত রকেট নয়, আগুনের তীর। সতেরো শতকের আগে প্রকৃত রকেটের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। শূন্যে ভ্রমণের জন্য রকেট ব্যবহারের কথা বলেছিলেন সাইরানো দ্য বারজেরাক। তারপর থেকে নানা ধরনের রকেটের চিত্র ও বর্ণনা পাওয়া যায়। রকেট যাতে বেটাল না হয় তার জন্য ডানা লাগাবার কথা এই সময়েই ওঠে।

জুলে ভার্ন ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' বইয়ে মানুষকে চাঁদে পাঠিয়েছিলেন কামান দেগে এবং সঠিকভাবেই পৃথিবী থেকে রওনা করিয়েছিলেন সেকেণ্ডে ৭ মাইল (১১.২ কিলোমিটার) বেগে। ভারহীনতার কথাও বলেছিলেন, কিন্তু রকেটের উল্লেখ করেন নি।

রকেটের তাৎপর্য প্রথম প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন রুশদেশের একজন বধির স্কুল-শিক্ষক—নাম, কনস্তানতিন ৎসিওল-কোভস্কি (১৮৫৭-১৯৩৫)। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখে তিনি দেখিয়েছিলেন, মহাশূন্যে ভ্রমণের জন্য রকেটই একমাত্র উপযুক্ত বাহন। বায়ুশূন্যতার অবস্থাতেও রকেট ছুটে চলে। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, রকেটের পক্ষে গুঁড়ো জ্বালানির চেয়ে তরল জ্বালানি বেশি উপযোগী, তরল জ্বালানি ব্যবহার করলে রকেট বেশি বেগ লাভ করে। সব মিলিয়ে তিনিই প্রথম নভশ্চারণার তত্ত্বগত ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। রুশদেশে তিনি 'নভশ্চারণবিদ্যার জনক' হিসেবে খ্যাত।

তরল জ্বালানি চালিত প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ করেছিলেন একজন আমেরিকান—ডঃ আর এইচ গডাড। ঘণ্টায় ৯৬ কিলোমিটার বেগে এই রকেট প্রায় ৬০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছিল। এ-ঘটনা ১৯২৬ সালের। উৎসাহিত হয়ে নানা জনে নানাভাবে রকেট নিয়ে পরীক্ষাকার্য চালাতে থাকেন। অনেক উন্নতিও হয়। এমনি চলতে থাকে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ শুরু না হওয়া পর্যন্ত। যুদ্ধ শুরু হতেই সমরকর্তাদের কাছে মারণাস্ত্রের চাহিদা বেড়ে যায়। বোমা হয় রকেটবাহিত। জার্মানদের ভি-১ বোমার পাল্লা ছিল ৩২০ কিলোমিটার। আর ভি-২-কে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় তোলা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও সমরকর্তাদের কাছে মারণাস্ত্রের চাহিদা কমে না। তখনো থেকে যায় পরমাণু-বোমা ফেলার জন্য ও ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য শক্তিশালী রকেটের চাহিদা। ভি-২ রকেটের নির্মাণকর্তা ডঃ ভের্নার ফন ব্রাউন-এর নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রকেট নিয়ে প্রচুর পরীক্ষাকার্য চলতে থাকে। কিন্তু তখনো একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষে স্থাপন করার কথা কল্পনা যেত না। এমনি অবস্থায়, সারা জগৎকে স্তম্ভিত করে দিয়ে, ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে স্পুৎনিক-১ কক্ষে স্থাপিত হয়। শুরু হয় নভশ্চারণার যুগ।

নিষ্ক্রমণের সমস্যা

সৌরমণ্ডল নিয়ে আলোচনার সময়ে আমরা জেনেছি যে পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার। অর্থাৎ, কোনো বস্তুর ছুটের বেগ যদি হয় সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার তাহলে সেই বস্তুটি পৃথিবীর টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ছুট যদি সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটারের কম হয়—তাহলে? তাহলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তুটি পৃথিবীর টানে আবার মাটিতে ফিরে আসে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বস্তুটি মাটিতে ফিরে আসে না—পৃথিবীর চারদিকে বিশেষ এক কক্ষে পাক খেতে শুরু করে। যেমন পাক খেয়েছিল স্পুৎনিক। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা তাঁদের যে-সব ব্যোমযানকে (লুনা, অ্যাপোলো, ভেনেরা, মেরিনার, মার্স, ভাইকিং) চাঁদে বা শুক্রে বা মঙ্গলে পৌঁছে দিতে পেরেছেন সেগুলোকে পৃথিবী থেকে আকাশে তোলা হয়েছিল নিষ্ক্রমণ-বেগে, বা সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটার বেগে। দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি ব্যোমযানের ছুট খুবই লম্বা—লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি কিলোমিটার। কিন্তু যদি দেখা হয় সেই লম্বা ছুট দিতে গিয়ে আসলে কতটুকু শক্তিক্ষয় হয়েছে, তাহলে সহজ একটা হিসেবে পৌঁছনো চলে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, কোনো বস্তুকে ৬,৪০০ কিলোমিটার গভীর একটা খাদের তলা থেকে ছুঁড়ে ওপরের মাটিতে পৌঁছে দিতে হলেও একই পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে হয়। অবশ্য এই হিসেবের মধ্যে ধরে নেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬,৪০০ কিলোমিটার, আর পৃথিবীর টান খাদের তলা থেকে ওপর পর্যন্ত সব জায়গাতে একই মাপের—ভূপৃষ্ঠে পৃথিবীর টান যতো তাই।

এবার মনে করা যাক ৬,৪০০ কিলোমিটার গভীর একটা খাদ রয়েছে। খাদটির গা পুরোপুরি মসৃণ, খাদের সব জায়গাতেই নিচের

দিকে সমান মাপের টান, আর একটা মার্বেলকে খাদের তলা থেকে ছুঁড়ে ওপরের মাটিতে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

চিত্র ৪১। পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান গভীর বা ৬,৪০০ কিলোমিটার গভীর একটি খাদের তলা থেকে একটি মার্বেলকে ছুঁড়ে ওপরের মাটিতে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘণ্টায় ৮,০০০ বা ১৬,০০০ কিলোমিটার বেগে যদি মার্বেলটিকে ওপরের দিকে ছোঁড়া হয় তাহলে প্রত্যেক বারই সেটি কিছুদূর উঠে আবার নিচের দিকে নেমে আসে। চিত্রে ক, খ ও গ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন-বারে কতটা উঁচুতে ওঠে। যতোবেশি বেগে ছোঁড়া হয়েছে ততো বেশি উঁচুতে উঠেছে। ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছুঁড়তে পারলে মার্বেলটি আর ফিরে আসে না। ওপরের মাটিতে পৌঁছে যায়। এই বেগটিই নিষ্ক্রমণ-বেগ। চিত্রে ঘ চিহ্ন দিয়ে নিষ্ক্রমণ-বেগের ছুট দেখানো হয়েছে। ঙ, চ, ছ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে খাদের কোনো এক উচ্চতায় চক্রবেগে ঘুরিয়ে দিতে পারলে কেমনভাবে মার্বেলটি ঘোরে।
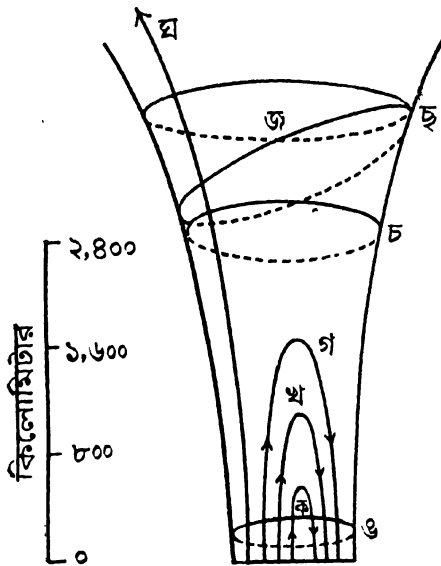
ঘণ্টায় ৮,০০০ বা ১৬,০০০ বা ২৪,০০০ কিলোমিটার বেগে যদি মার্বেলটিকে ওপরের দিকে ছোঁড়া হয় তাহলে দেখা যাবে, প্রত্যেক বারই সেটি কিছুদূর উঠে আবার নিচের দিকে নেমে আসে। চিত্রে (ক), (খ) ও (গ) চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন্‌বারে কতটা উঁচুতে ওঠে। যতোবেশি বেগে ছোঁড়া হয়েছে ততোবেশি উঁচুতে উঠেছে। শেষপর্যন্ত দেখা যাবে, ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছুঁড়তে

পারলে আর ফিরে আসে না, ওপরের মাটিতে পৌঁছে যায়। এই বেগটিই নিষ্ক্রমণ-বেগ। চিত্রে (ঘ) চিহ্ন দিয়ে নিষ্ক্রমণ-বেগের ছুট দেখানো হয়েছে।

মার্বেলটিকে নিয়ে অন্য একটা কাণ্ড করাও সম্ভব। খাদের যে কোনো একটা উচ্চতায় সেটিকে এমন বেগে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় যে সেই একই উচ্চতায় অনবরত ঘুরতে থাকে। চিত্রে (ঙ), (চ) ও (ছ) চিহ্ন দিয়ে এই ধরনের ঘোরা দেখানো হয়েছে। খাদের একেবারে তলার দিকে ঘুরতে হলে, যেমন (ঙ)তে, ঘোরার বেগ বা চক্রবেগ হওয়া চাই ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার (১৮,০০০ মাইল)। তার মানে, পৃথিবীর খুব কাছাকাছি কোনো বস্তুকে উপগ্রহের মতো ঘোরাতে হলে তার চক্রবেগ হওয়া চাই ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলো-মিটার। সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত যতোগুলো কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে ঘোরাতে পেরেছেন তাদের চক্রবেগ মোটামুটি এই মাপের।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষ সব সময়ে বৃত্তের মতো গোল নাও হতে পারে। মনে করা যাক, চিত্রে (ছ)-এর উচ্চতায় বলটিকে যে বেগে ঘোরানো হল তা যথেষ্ট নয়। তাহলে ব্যাপারটা কী হবে? বলটি নিচের দিকে নামতে শুরু করবে, একেবারে সরাসরি নিচের দিকে নয়, চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে তেমনি ট্যারাভাবে। মনে রাখা দরকার বলটি নিচে নামছে প্রচণ্ড একটা টানে। ফলে, নিচে নামতে গিয়ে বলটির বেগ বেড়ে যায়। বেগ বাড়লেই বলটি আবার টানের বিপক্ষে আসার জোর পায় এবং (ছ)-এর উচ্চতায় পৌঁছয়। উঁচুতে উঠতে গিয়ে বলের বেগ আবার কমে, বল আবার নিচে নামে। নিচে নামতে গিয়ে বলের বেগ আবার বাড়ে, বল আবার উঁচুতে ওঠে। এমনি চলতে থাকে। এক্ষেত্রেও বলটি ঘুরছে ঠিকই, তবে তার কক্ষ উপবৃত্তাকার। সূর্যের চারদিকে প্রত্যেকটি গ্রহ এমনি উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘুরছে।

এই দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায়: ভূপৃষ্ঠ থেকে কোনো বস্তু যদি

সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছুট দিতে পারে তাহলে সেই বস্তুটি পৃথিবীর টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়। বেগ আরও কম হলে বস্তুটি ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে কিংবা (বস্তুটিকে যদি সঠিক দিকে ছোটানো যায়) পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘুরতে শুরু করে। 'বস্তুটিকে যদি পৃথিবীর এমনি এক কৃত্রিম উপগ্রহ করে তুলতে হয় তাহলে তার চক্রবেগ হওয়া দরকার ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার। এই হিসেবটি মনে রাখা দরকার। পরে যখন আমরা স্পেস্-স্টেশনের কথা আলোচনা করব তখন এই হিসেবটি কাজে লাগবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার মাপের বেগ তৈরি করে অমন প্রচণ্ড একটা ছুট দেবার দরকার কি ? আগাগোড়া পথটাই আরো কম বেগে ধীরেসুস্থে ওঠা যাক না কেন ? জবাবে বলতে হয়, এখনো পর্যন্ত রকেটের যে-সব জ্বালানির সন্ধান জানা গিয়েছে তা নিয়ে এটা সম্ভব নয়। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। একটা মোটরগাড়ি উঁচু পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। দু-ভাবে সেটা হতে পারে। এক, আগাগোড়া পথে গাড়ির মোটর চালু রেখে সমান বেগে উঠে যাওয়া ; দুই, পাহাড়ের তলাতেই গাড়ির এমন একটা বেগ তৈরি করে নেওয়া যে বাকি পথটুকু মোটর বন্ধ করে রাখলেও নিজের বেগেই গাড়ি ওপরে উঠে আসে। রকেটের বেলায় আমরা দ্বিতীয় উপায়টিকে নিয়েছি। কারণ, প্রথম উপায়ে রকেটটি যদি ধীরেসুস্থে পৃথিবীর টান পেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে তাহলে আগাগোড়া সময়েই রকেটের মোটরকে চালু রাখতে হয়। তাহলে এমনও হতে পারে যে সমস্ত জ্বালানি ফুরিয়ে যাবার পরেও রকেট খুব বেশিদূর যেতে পারেনি। এমনও হতে পারে, শুধু পৃথিবীর টান ঠেকিয়ে একই উচ্চতায় থাকবার জন্য রকেটের সমস্ত জ্বালানি খরচ করতে হয়েছে। আরো অনেক জোরালো জ্বালানির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত প্রথম উপায়টির শরণ নেওয়ার কথা তাই ভাবা চলে না।

সুতরাং, আপাতত সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগে ছুট দেবার কথাই আমাদের ভাবতে হবে।

গ্রহ থেকে গ্রহে

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব চারলক্ষ কিলোমিটারেরও কম। আর পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ শুক্রের দূরত্ব চার কোটি কিলোমিটারেরও বেশি। চাঁদ পৃথিবীর এত কাছে যে চাঁদে যাওয়ার পথ ঠিক করার সময়ে সূর্য বা অন্য কোনো গ্রহের কথা না ভাবলেও চলে। অন্য কোনো গ্রহে যাওয়ার পথ ঠিক করার সময়ে কিন্তু ভাবতে হয়।

সৌরমণ্ডলের ন-টি গ্রহ বাঁধা আছে সূর্যের টানে। পৃথিবীর টানকে আগে আমরা ৬,৪০০ কিলোমিটার গভীর একটা খাদের সঙ্গে তুলনা করেছি, সেই হিসেবে সূর্যের টান হচ্ছে ১,৯২,০০,০০০ কিলোমিটার গভীর খাদের মতো। ভাবা যেতে পারে, আমাদের সেই মার্বেল বলের মতো নয়টি ছোট বড়ো গ্রহ এই খাদের বিভিন্ন উচ্চতায় উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘুরে চলেছে। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাত্রা করতে হলে আমাদের চলতে হবে সূর্যের বিপুল টানের পক্ষে অথবা বিপক্ষে। শুক্র ও বুধ—এই দুটি গ্রহ আছে ভিতরের দিকে, সুতরাং এই দুটি গ্রহে যাবার রাস্তা সূর্যের টানের পক্ষে। আর বাইরের দিকে আছে ছয়টি গ্রহ -মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। এই ছয়টি গ্রহে যাবার রাস্তা সূর্যের টানের বিপক্ষে।

এবার দেখা যাক, শুক্র ও মঙ্গলে যাবার সবচেয়ে সহজ রাস্তা কী হতে পারে।

স্রোত আছে এমন নদী পার হতে হলে কি-ভাবে পার হওয়া সবচেয়ে সহজ? অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, সবচেয়ে কম দূরত্বের ঠিক সিধে রাস্তায় নদী পার হবার চেষ্টা করলে শক্তিক্ষয় করতে হয় অনেক বেশি। নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নদী পার হলে দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে যায়, কিন্তু পরিশ্রম হয় সবচেয়ে কম।

গ্রহ	পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের দূরত্ব কিলোমিটার	সহজতম অতিক্রমণের দূরত্ব কিলোমিটার
শুক্র	৪,১৪,০০,০০০	৪০,০০,০০,০০০
মঙ্গল	৫,৬০,০০,০০০	৬৭,২০,০০,০০০

গ্রহ থেকে গ্রহে যাবার পথ ঠিক করবার সময়েও একই নীতি। এখানে নদীর স্রোত হচ্ছে কক্ষপথে পৃথিবীর ছুটের বেগ। আমাদের ব্যোমযান যখন পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে উঠে আসে, তখন পৃথিবীর এই বেগটুকুও সে সঙ্গে করে আনে। কথাটা বোঝা দরকার। চলন্ত ট্রেন থেকে যদি কোনো লোক লাফিয়ে পড়ে, তাহলে দুটি বিভিন্ন বেগ তার মধ্যে থেকে যায়; একটি তার নিজস্ব লাফের বেগ অপরটি চলন্ত ট্রেনের বেগ। তেমনি আমাদের ব্যোমযান যখন সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেয় তখন সেই ব্যোমযানের মধ্যে পৃথিবীর বেগও থেকে গিয়েছে। পৃথিবীর বেগ দু-ধরনের —কক্ষে ঘোরার বেগ ও অক্ষে পাক খাওয়ার বেগ। কক্ষে ঘোরার বেগ ঘণ্টায় ১,০৭২০০ কিলোমিটার। এই বেগ পৃথিবীর উত্তর-মেরু থেকে দক্ষিণ-মেরু পর্যন্ত সব জায়গাতেই সমান। কিন্তু পৃথিবীর অক্ষে পাক খাওয়ার বেগ সবচেয়ে বেশি বিষুবরেখায়; ঘণ্টায় ১,৬০০ কিলোমিটারেরও কিছু বেশি। সুতরাং বিষুবরেখা থেকে যদি আমাদের ব্যোমযান পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেয়, তাহলে এই দুটি বেগও ব্যোমযানের মধ্যে এসে যায়। বিনা খরচে পাওয়া ঘণ্টায় ১,০৮,৮০০ কিলোমিটারের বেগ কম কথা নয়।

এবার কল্পনা করা যাক, ব্যোমযান পৃথিবীর টান ছাড়িয়ে মহাশূন্যে উঠে এসেছে। পৃথিবী থেকে ছুট দেবার সময়ে ব্যোমযানটির যে নিজস্ব বেগ ছিল তার সবটাই খরচ হয়ে গেছে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে আসতে গিয়ে। কিন্তু পৃথিবীর নিজস্ব বেগও ব্যোমযানটির মধ্যে এসে গিয়েছে। এই বেগ থেকে যায় এবং ব্যোমযান এই বেগে

ছুট দেয়। কক্ষপথে পৃথিবী যেদিক ছুট দিচ্ছে সেদিকে। কিন্তু সিধে বরাবর রাস্তায় ছুট নয়। মনে রাখা দরকার যে আমাদের ব্যোমযান মহাশূন্যের এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে
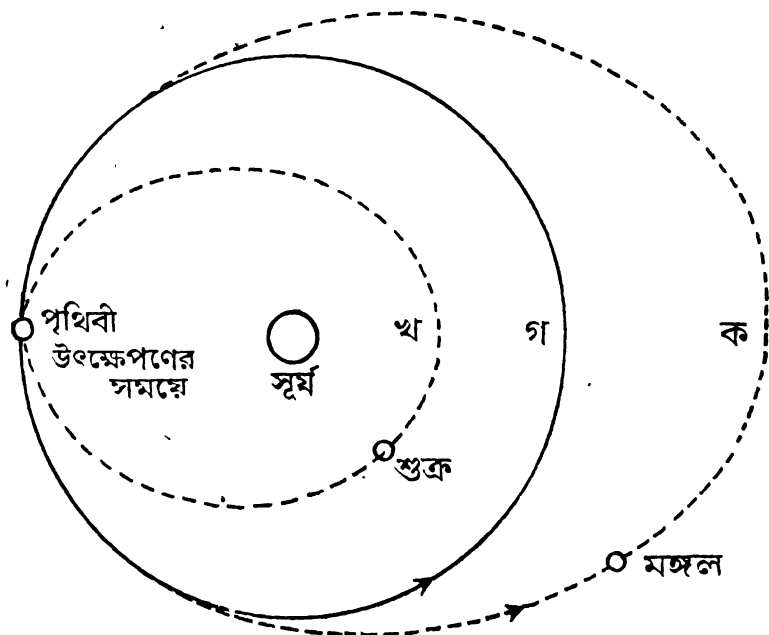
চিত্র ৪২। কোনো ব্যোমযান যখন নিষ্ক্রমণ বেগে বা সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগে ছুট দিয়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে উঠে আসে তখন পৃথিবীর বেগও সঙ্গে করে আনে। যদি এমন হয় যে মহাশূন্যে উঠে আসার পরে ব্যোমযানের বেগ কক্ষপথে পৃথিবীর চলার বেগের চেয়ে বেশি তাহলে ব্যোমযানটি পৃথিবী থেকে বাইরের দিকের কক্ষে চলতে শুরু করবে। চিত্র ক চিহ্ন দিয়ে এই কক্ষটি দেখানো হয়েছে। আর যদি এমন হয় যে মহাশূন্যে উঠে আসার পরে ব্যোমযানের বেগ কক্ষপথে পৃথিবীর চলার বেগের চেয়ে কম তাহলে ব্যোমযানটির চলা ভিতরের দিকের কক্ষে। এই উপায়েই শুক্রে বা বুধে যেতে হয়। চিত্রে খ চিহ্ন দিয়ে ভিতরের দিকের কক্ষ দেখানো হয়েছে। গ চিহ্নিত কক্ষটি পৃথিবীর।

সূর্যের টানটাই অনেক বড়ো টান। ব্যোমযানও সূর্যের টানে বাঁধা। এই অবস্থায় ব্যোমযানটির বেগ যদি কক্ষপথে পৃথিবীর বেগের সমান

হয় তাহলে পৃথিবীর কক্ষপথেই সেটি ঘুরতে শুরু করবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে ব্যোমযানটির ছুটের বেগ পৃথিবীর ছুটের বেগের চেয়ে বেশি তাহলে ব্যোমযানটি নিশ্চয়ই পৃথিবীর কক্ষপথে ঘোরে না। যেহেতু পৃথিবীর ছুটের বেগের চেয়ে ব্যোমযানের ছুটের বেগ বেশি, অতএব সে সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে। যেহেতু দূরে সরছে সূর্যের টানের বিরুদ্ধে তাই যতোই দূরে সরে ততোই তার বেগ কমে। এইভাবে বেগ কমতে কমতে একসময়ে তার আর দূরে সরবার ক্ষমতা থাকে না, সূর্যের টানে আবার পিছিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এই পিছিয়ে আসার আগেই যদি ব্যোমযানটি মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে পৌঁছে যায় তাহলেই কার্যসিদ্ধি। ঠিক সেই বিশেষ সময়ে মঙ্গল-গ্রহও যদি কক্ষে সেই বিশেষ জায়গায় থাকে তাহলেই মঙ্গলগ্রহ আমাদের ব্যোমযানকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারে।
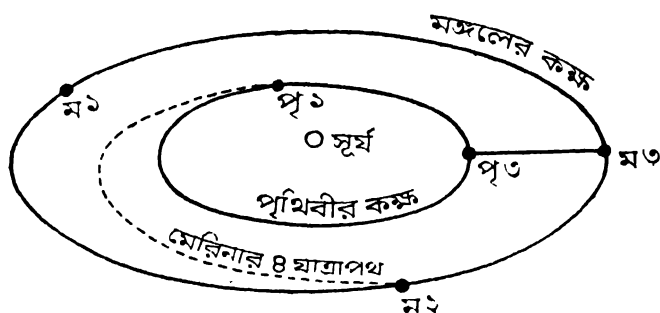
চিত্র ৪৩। মেরিনার ৪ পৃথিবী থেকে মঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ২৮ নভেম্বর তারিখে। পৃথিবী তখন ছিল পৃ-১ অবস্থানে আর মঙ্গল ম ১ অবস্থানে। ২৩০ দিন পরে, ১৫ জুলাই তারিখে, মেরিনার ৪ মঙ্গলের কাছে পৌঁছেছিল। তার যাত্রাপথ ভাঙা লাইনে দেখানো হয়েছে। লক্ষ করবার বিষয়, পৃথিবী থেকে মঙ্গলে সবচেয়ে কম দূরত্বের যাত্রা ছিল পৃ ১ থেকে ম ১ কিংবা পৃ ৩ থেকে ম ৩। কিন্তু মেরিনার-৪ গিয়েছে সহজতম পথে, যদিও তাতে দূরত্ব পার হতে হয়েছে অনেক বেশি।

পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেবার সময় আমাদের ব্যোমযানের নিজস্ব বেগ যদি এমন হয় যে পৃথিবীর ছুটের বেগের চেয়ে ব্যোমযানের

ছুটের বেগ কম, তাহলে সেই ব্যোমযান সূর্যের টানে সূর্যের দিকে সরে। এইভাবে সরতে সরতে শেষপর্যন্ত শুক্রের কক্ষে পৌঁছে যায়। হিসেব ঠিক থাকলে এক্ষেত্রেও ব্যোমযানের সঙ্গে শুক্রগ্রহের সাক্ষাৎ ঘটে।

৪২নং চিত্রে দেখানো হয়েছে, আমাদের ব্যোমযান পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহে বা পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহে কি-ভাবে পৌঁছয়। বুঝতে
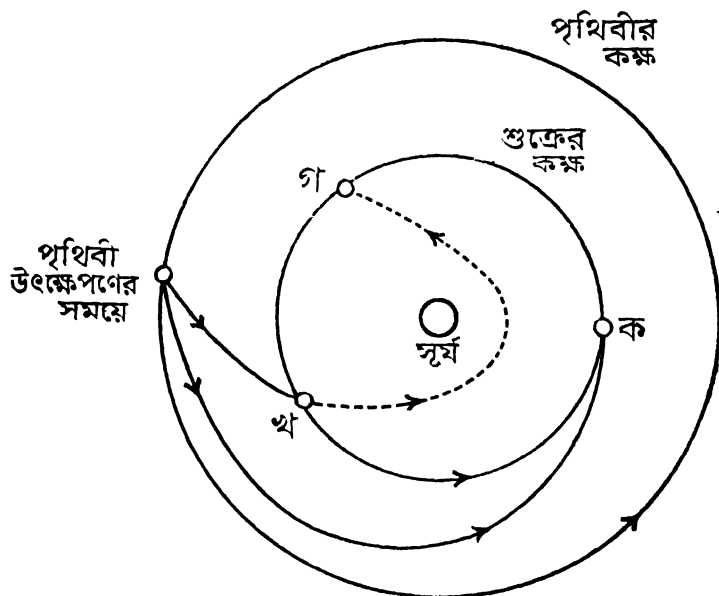
চিত্র ৪৪। চিত্রে ব্যোমযানটির ভিতরের দিকের কক্ষে চলা দেখানো হয়েছে। ব্যোমযানের দুটি চলা—একটি চলায় ব্যোমযান পৌছচ্ছে শুক্রের কক্ষের ক অবস্থানে। এতে সময় লাগে চারমাস, এবং এইটিই সবচেয়ে কম শক্তিক্ষয়ের চলা। শুক্রের কক্ষের খ বিন্দুতে পৌছতে সময় লাগে আরো কম, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যোমযানের যাত্রা-শুরুর বেগ আরো বেশি হওয়া চাই। এমনও হতে পারে, ব্যোমযান শুক্রে পৌছচ্ছে সূর্যকে ঘুরে গ অবস্থানে (ভাঙা লাইনে দেখানো হয়েছে)। এক্ষেত্রে সময়ও লাগে বেশি, ব্যোমযানের যাত্রা-শুরুর বেগও হওয়া চাই বেশি। কক্ষের ক অবস্থানে পৌছবার পথটিই সহজতম অতিক্রমণের পথ।

অসুবিধে হয় না যে এভাবে যাত্রা করাটা মস্ত একটা ঝুঁকি নিয়ে যাওয়া। এমন পাকাপাকি হিসেব থাকা দরকার যেন শুক্র বা

মঙ্গল একটা বিশেষ দিনের বিশেষ সময়ে কক্ষপথের এক বিশেষ জায়গায় থাকে। যেমন ধরা যাক, ভেনাস-৮। এই ব্যোমযানটি পৃথিবী থেকে রওনা হয়েছিল ২৭ মার্চ তারিখে। আর শুক্রের মাটিতে ধীরে অবতরণ করেছিল ২২ জুলাই তারিখে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে রওনা হবার ১২৩ দিন পরে শুক্র পৌঁছেছে। পৃথিবী থেকে রওনা করাবার সময়েই হিসেব রাখতে হয়েছিল ১২৩ দিন পরে ভেনাস-৮ যখন শুক্রের কক্ষে পৌঁছবে তখন শুক্র যেন ঠিক সেখানেই থাকে। যদি না থাকত? তাহলে ভেনাস-৮ উপবৃত্তাকার কক্ষে সূর্যকে ঘুরে আবার এসে পৌঁছত পৃথিবীর কক্ষে তার যাত্রা শুরু করার বিন্দুতে। পৃথিবী তখন সেখানে নেই। আবার চলে যেত শুক্রের কক্ষের দিকে। আবার ফিরে আসত। অর্থাৎ, নতুন একটি গ্রহের মতো উপবৃত্তাকার কক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘুরেই চলত, ঘুরেই চলত। মার্কিন বিজ্ঞানীদের মেরিনার-২ এমনি এক নতুন গ্রহের মতো আজও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। মেরিনার-২ পৃথিবী থেকে রওনা হয়েছিল ২৬ আগস্ট তারিখে আর ১৪ ডিসেম্বর তারিখে ৩৪,৮০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে শুক্রগ্রহকে পার হয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কেও একই কথা। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মেরিনার-৯ পৃথিবী থেকে রওনা হয়েছিল ১৭ মে তারিখে, ১৮২ দিন পরে মঙ্গলের কক্ষে পৌঁছে মঙ্গলের কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে উঠেছিল ২৪ নভেম্বর তারিখে। মেরিনার-৯ ব্যোমযানের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের সাক্ষাৎ যদি না হত তাহলে এই ব্যোমযানও সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘুরে চলত।

এ তো গেল পৌঁছনোর ব্যাপার। কিন্তু তারপরেও আছে নিরাপদে নামার প্রশ্ন। পৃথিবীতে যে উল্কাপাত হয় তাও তো এক ধরনের নেমে-আসা, কিন্তু আগুনে পুড়ে ছাই হতে হতে ব্যোমযান নেমে আসুক তা আমরা নিশ্চয়ই চাই না। সুতরাং নেমে আসার জন্যও ব্যবস্থা থাকা দরকার। অবশ্য চাঁদের মতো বাতাসহীন দেশে বাতাস নেই বলেই ব্যোমযানে আগুন লাগার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু

আছড়ে পড়ে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা পুরোপুরি। যেমন হয়েছে লুনিক, রেঞ্জার ইত্যাদি। চাঁদই হোক বা শুক্র-মঙ্গলই হোক, নিরাপদে নামার একটা ব্যবস্থা চাই।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে, গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পরেও যদি ব্যোমযানের কিছুটা জ্বালানির সঞ্চয় না থাকে তাহলে নিরাপদ অবতরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। তারপর যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় তার জন্যও জ্বালানির যোগান চাই।

স্পেস স্টেশন

আমরা জেনেছি, কোনো বস্তু যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে চক্র-বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করে তাহলে তা অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর একটি উপগ্রহের মতো ঘুরেই চলে। পৃথিবী থেকে ৪৮০ কিলোমিটার দূরে থেকে যদি কোনো বস্তুকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে হয় তাহলে সেই বস্তুটির চক্রবেগ হওয়া দরকার ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার। হিসেব করে দেখা গেছে, ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে এই বস্তুটি নব্বুই মিনিটের কিছু বেশি সময়ে পৃথিবীর চারদিকে এক-একবার ঘোরে। পৃথিবী থেকে বস্তুটি যদি আরও দূরে থাকে, তাহলে চক্রবেগ হয় আরো কম। যেমন বলা যায়, বস্তুটি যদি পৃথিবী থেকে ৪৮০ কিলোমিটারে দূরে না থেকে ১,৭৩৬ কিলো-মিটার দূরে থাকে তাহলে বস্তুটির চক্রবেগ হওয়া চাই ঘণ্টায় ২৫,৩৪৩ কিলোমিটার এবং এই বিশেষ উচ্চতায় ও বিশেষ চক্রবেগে বস্তুটি প্রতি দু-ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। পৃথিবী থেকে বস্তুটি যতো দূরে যায় চক্রবেগ ততো কমে, ঘোরার সময় ততো বাড়ে। পৃথিবী থেকে ৩৫,২০০ কিলোমিটার দূরে থেকে কোনো বস্তু যদি চক্রবেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তাহলে এক-একবার ঘুরতে তার সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। পৃথিবীও ২৪ ঘণ্টায় নিজের অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরছে। তার মানে, পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে বস্তুটি মহাশূন্যে স্থির—তার উদয়ও নেই, অস্তও নেই। এমনি ভূ-স্থির (geo-stationary) কৃত্রিম উপগ্রহ সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি তৈরি করেছেন।

উদয় ও অস্ত কি-ভাবে ঘটে? আমরা জানি পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন পশ্চিম থেকে পুবে। তাই পৃথিবী থেকে তাকিয়ে আমাদের মনে হয় সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারার উদয় পুবে, অস্ত পশ্চিমে। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের মতো কোনো বস্তু যখন পশ্চিম থেকে পুবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করে তখন পৃথিবী থেকে তাকিয়ে আমরা বস্তুটিকে কোন

দিকে উদয় হতে এবং কোন দিকে অস্ত যেতে দেখি? তা নির্ভর করে বস্তুটির চক্রবেগের ওপরে। চক্রবেগ যদি এমন হয় যে বস্তুটি চব্বিশ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরছে তাহলে আমাদের কাছে বস্তুটির উদয় পশ্চিমে, অস্ত পুবে। যদি ঘোরার সময় ২৪ ঘণ্টার বেশি হয় তাহলে উদয় পুবে, অস্ত পশ্চিমে। আর ঘোরার সময় যদি পুরোপুরি ২৪ ঘণ্টা হয় তাহলে বস্তুটির উদয়ও নেই অস্তও নেই; বস্তুটিকে মহাশূন্যে স্থির মনে হয়।

এক-একটি গ্রহ যে বিশেষ এক-একটি কক্ষে থাকে তার কারণ এক-একটি গ্রহের একটি বিশেষ চক্রবেগ। ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবী তার কক্ষপথের যে বিন্দুতে আছে সেই বিন্দু থেকে সে ছিটকে যাচ্ছে না তার কারণ সূর্যের টান আছে, আবার সূর্যের টানে সে সরাসরি সূর্যের দিকেই চলতে শুরু করছে না তার কারণ তার ছুট আছে। কক্ষ-পথের প্রতিটি বিন্দুতেই এই টানের জোর আর ছুটের জোর সমান। মনে করা যাক, ঠিক এই মুহূর্তে কক্ষপথে পৃথিবীর ছুটের বেগ আচমকা বেড়ে গেল। তাহলে কী হবে? তাহলে টানের জোরের চেয়ে ছুটের জোর বেশি হয়ে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবী তার পুরনো কক্ষপথ ছেড়ে সূর্যের টানের বিরুদ্ধে বাইরের দিকে বা আরো দূরের দিকে সরতে শুরু করবে। আর টানের বিরুদ্ধে সরছে, অতএব বেগ কমে। বেগ কমতে কমতে এমন এক বিন্দুতে এসে পৌঁছয় যেখানে সূর্যের টানের জোর পৃথিবীর ছুটের জোরের সমান। এখানেই দূরে সরা বন্ধ। পরিক্রমা কিন্তু চলতেই থাকে। তার মানে, পৃথিবীর কক্ষপথ ঠিক আগেকার মতো রইল না, একটুখানি বদলে গেল। তেমনি ঠিক এই মুহূর্তে যদি পৃথিবীর ছুটের বেগ আচমকা কমে যায়? যেহেতু এক্ষেত্রে সূর্যের টানের জোর পৃথিবীর ছুটের জোরের চেয়ে বেশি, সুতরাং পৃথিবী এবার সূর্যের টানের বিপক্ষে বাইরের দিকে না সরে সূর্যের টানের পক্ষে ভিতরের দিকে অর্থাৎ সূর্যের দিকে সরতে শুরু করে। যেহেতু সূর্যের টানের পক্ষে, অতএব ছুটের বেগও বেড়ে চলে। বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় আসে যখন পৃথিবীর ছুটের জোর সূর্যের

টানের জোরের সমান হয়ে যায়। এখানেই ভিতরের দিকে সরা বন্ধ। এবারেও মোট ফল, পৃথিবীর কক্ষপথের চেহারা একটু পালটে গেল। তবে দু-বারের পাল্টানো একই ধরনের নয়। প্রথমবারে পৃথিবীর কক্ষপথ আরেকটু বাইরের দিকে ছড়িয়েছে, দ্বিতীয়বারে আরেকটু কুঁকড়ে এসেছে ভিতরের দিকে। এই দু-ধরনের পাল্টানোর মধ্যে মিল এইটুকু যে, যে-বিশেষ বিন্দু থেকে পৃথিবীর বেগ বেড়েছে বা কমেছে, সেই বিশেষ বিন্দুটি নতুন কক্ষদুটিতেও থেকে গেছে। এই বিশেষ বিন্দুটিকে কক্ষপথে বজায় রেখেই দু-বারের যা কিছু ওলটপালট।
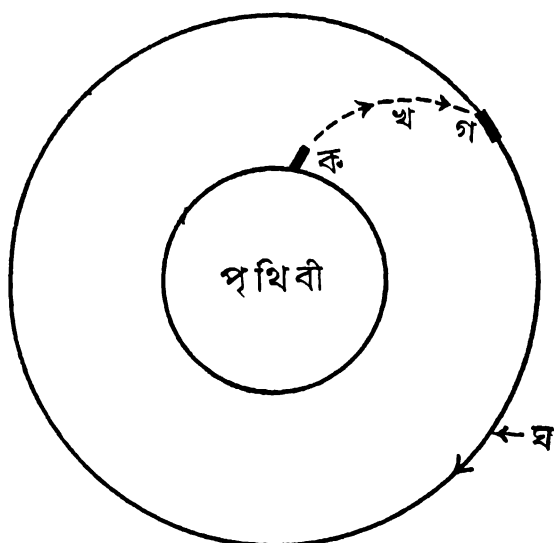
চিত্র ৪৫। উপগ্রহ কক্ষে স্থাপিত হচ্ছে। উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রে (ক) রকেটের ঠেলায় উপগ্রহ বেগবান হয় (মোটা দাগে)। রকেটের জ্বালানি শেষ হবার পরে রকেট খসে পড়ে এবং নিজস্ব বেগে উপগ্রহটি উপবৃত্তাকার পথে (খ) সর্বোচ্চ উচ্চতায় (গ) উপনীত নয়। ঠিক এই সময়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেট চালু হয়ে (মোটা দাগে) উপগ্রহকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বেগ প্রদান করে এবং উপগ্রহ কক্ষে (ঘ) স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেট চালু না হলে উপগ্রহ আবার মাটিতে নেমে আসত।

সূর্যকে ঘিরে যেমন গ্রহ, গ্রহকে ঘিরে তেমনি উপগ্রহ। উপগ্রহেরও আছে চক্রবেগ আর তাই উপগ্রহ গ্রহের চারদিকে ঘুরেই চলে। স্পেস-

স্টেশন হচ্ছে মানুষের তৈরী উপগ্রহ বা কৃত্রিম উপগ্রহ। ব্যোমযানকে প্রথমে রকেটের সাহায্যে আকাশে তুলতে হয়, তারপরে রকেটের সাহায্যে নির্দিষ্ট চক্রবেগে ছুট দেওয়াতে হয়, তখন সেটি পৃথিবীর কক্ষে ঘুরতে শুরু করে বা পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে ওঠে। আজ পর্যন্ত মানুষের তৈরী যা-কিছু এমনি কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরেছে সবই কৃত্রিম উপগ্রহ। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা হাজারখানেক কসমসকে পৃথিবীর কক্ষে ঘুরিয়েছেন, বা, বলা যেতে পারে, হাজারখানেক কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে স্পেস-স্টেশন তৈরি করেছেন তার নাম সালিয়ুৎ—সেটিও কৃত্রিম উপগ্রহ। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের স্পেস-স্টেশন স্কাইল্যাবও তাই।

উপগ্রহের কক্ষ

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষ কী হবে?

আমরা জানি, পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন পশ্চিম থেকে পুবে। ধরে নেওয়া যাক, কৃত্রিম উপগ্রহ ঠিক বিষুবরেখার ওপরে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পশ্চিম থেকে পুবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এক্ষেত্রে এই উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠ দেখা যাবে পুরোপুরি নয়, বিষুবরেখা বরাবর একটি ফালিতে মাত্র। কিন্তু উপগ্রহের কক্ষ যদি পৃথিবীর দুই মেরুর ওপর দিয়ে যায় তাহলে কিন্তু উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল চোখে পড়ে।

প্রথম স্পুৎনিকের কক্ষ ছিল পৃথিবীর বিষুবতলের ৬৫° কোনা-কুনি। পুরোপুরি ৯০° হলে কক্ষটি পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ওপর ওপর দিয়ে যেত। তা যায়নি। মেরুবিন্দু থেকে ২৫° তফাতে, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মেরু-বৃত্তের প্রায় ওপর দিয়ে কক্ষ রচনা করা হয়েছিল।

পৃথিবীকে পুরো একটি পাক দিতে প্রথম স্পুৎনিকের সময় লাগত ৯৫ মিনিট। আবার পৃথিবীরও অক্ষ-আবর্তন রয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় পুরো একটি আবর্তন, অর্থাৎ ৩৬০°। তার মানে এই ৯৫ মিনিটে

পৃথিবীর প্রায় ২৪° আবর্ত্তিত হয়েছে। তাহলে দুয়ে মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে পৃথিবীর একই এলাকার ওপর দিয়ে স্পুৎনিক পর-পর দু-বার ঘোরেনি। স্পুৎনিকের আলাদা আলাদা আবর্ত্তনে পৃথিবীর আলাদা আলাদা এলাকা।

উপগ্রহের জন্য কোন বিশেষ কক্ষ রচনা করা হবে তা নির্ভর করে উপগ্রহের কাজ কী হবে তার ওপরে। ভূপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে উপগ্রহ উত্তর-দক্ষিণ কক্ষে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। যদি উদ্দেশ্য হয় রেডিও রীলে-স্টেশন নির্মাণ করা তাহলে উপগ্রহ ঘোরে পশ্চিম-পুব কক্ষে। সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা অজস্র কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন। এক-একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এক-একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। উদ্দেশ্য অনুযায়ী কক্ষও ভিন্ন ভিন্ন।

এবারে স্পেস-স্টেশনের কিছু বিবরণ দিলে বোঝা যাবে স্পেস-স্টেশন কী, তা থেকে কত-কি হতে পারে, কী হতে চলেছে।

স্কাইল্যাব

স্কাইল্যাব উৎক্ষিপ্ত হয় ১৪ মে তারিখে। কক্ষের উচ্চতা ৪৩২ কিলোমিটার। এই বিশেষ উচ্চতায় ও বিশেষ কক্ষে স্কাইল্যাব অতঃপর কৃত্রিম উপগ্রহের মতোই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলে।

স্কাইল্যাব আকারে তিন-কামরার একটি বাড়ির মতো, ওজনে ৮৮ টন, লম্বায় ২৪.৬৬ মিটার, চওড়ায় ৬.৬ মিটার। ভিতরে বসবাসের ও কাজ করার স্থান ৩১০.৫ ঘনমিটার। আজ পর্যন্ত যতো ব্যোমযান আকাশে তোলা হয়েছে, স্কাইল্যাবের মতো বড়ো কোনোটাই নয়।

২৫ মে তারিখে তিনজন নভশ্চর অ্যাপোলো ব্যোমযানে চেপে স্কাইল্যাবে হাজির হন ও ২৮ দিন কাটিয়ে যান। নানা পরীক্ষাকার্য চালান এই ২৮ দিন ধরে। তারই মধ্যে দুজন নভশ্চর স্পেস-স্টেশন থেকে বেরিয়ে ৯০ মিনিট মহাশূন্যে সঞ্চরণ করেন।

স্কাইল্যাবে তিনজন নভশ্চরের দ্বিতীয় দলটি আসেন ২৮ জুলাই তারিখে, থাকেন ২৫শে সেপ্‌টেম্বর পর্যন্ত (৫৯ দিন ১১ ঘণ্টা ৯ মিনিট)। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন গোটাকতক ক্ষুদ্র প্রাণী—দুটি স্ত্রী-মাকড়সা, ইঁদুর, মিনো মাছ, মিনো মাছের ডিম, ডাঁশমশা, পতঙ্গ (মাকড়সাকে খাওয়াবার জন্য)। স্কাইল্যাবে থাকার সময়ে এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণী নিয়ে নভশ্চররা নানা পরীক্ষাকার্য চালান। যেমন, ভারহীনতার অবস্থায় মাকড়সাকে জাল বুনতে দেখেন, পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া মাছের ও স্কাইল্যাবের মধ্যে ডিম থেকে ফুটে ওঠা মাছের সাঁতার কাটা লক্ষ করেন। সূর্যের ৭৭,০০০ টেলিস্কোপিক আলোকচিত্র তোলেন। পৃথিবীকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। স্কাইল্যাবের বিশেষ চুল্লিতে স্ফটিক ও সংকর ধাতুর দ্রবণ ঘটান।

তৃতীয় দলে তিনজন নভশ্চর স্কাইল্যাবে উপস্থিত হন ১৬ নভেম্বর তারিখে। থাকেন ৮৪ দিন (এত দীর্ঘ সময় আর কেউ বা কোনো দল মহাশূন্যে কাটান নি।) ও বহু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকার্য চালান। সূর্যের ২০,০০০ আলোকচিত্র তোলেন, পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করেন, পৃথিবীর জলসম্পদ খনি-সম্পদ অরণ্য ও কৃষি-ফসল সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করেন। তাছাড়া, কুড়ি দিন ধরে কোহুতেক ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণ করেন ও চারবার (একবার সাতঘণ্টা ধরে) মহাশূন্যে সঞ্চরণ করেন।

স্কাইল্যাবের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহাশূন্যের ভারহীনতার অবস্থায় বিরাট বিরাট কারখানা স্থাপিত হতে পারে এবং বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। পৃথিবী সম্পর্কেও খুঁটিয়ে জানা যায় স্পেস-স্টেশন থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে। মহাশূন্যে উপনিবেশ-স্থাপনই বা নয় কেন? স্কাইল্যাবে নিপুণ এক মহড়া হয়ে গেল দীর্ঘকাল ধরে মহাশূন্যে থাকতে হলে সবচেয়ে ভালোভাবে কি করে খাওয়া ঘুমনো ও স্নান করা যায় এবং শরীরের বর্জিত পদার্থের ব্যবস্থা করা যায়। মহড়া হয়ে গেল জেট-মেশিনের ঠেলা ব্যবহার করে মহাশূন্যে সঞ্চরণের। স্কাইল্যাবের

সাফল্য দেখে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে ভবিষ্যতে, সম্ভবত বিশ শতকের প্রথমার্ধেই, কয়েক লক্ষ মানুষের বাসোপযোগী বিরাট স্পেস-স্টেশন পৃথিবীর কক্ষপথে নির্মিত হতে পারবে। 'স্প্যান' পত্রিকায় ইতিমধ্যেই কল-কারখানা ও খেত-খামার সমেত ভবিষ্যতের এমনি এক স্পেস-স্টেশনের রঙীন ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

সালিয়ুৎ

স্কাইল্যাব কিন্তু প্রথম স্পেস স্টেশন নয়। স্কাইল্যাবের দু-বছর আগে, ১৯ এপ্রিল তারিখে উৎক্ষিপ্ত সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সালিয়ুৎ-১ ছিল প্রথম স্পেস-স্টেশন। সেখানে তিনজন সোভিয়েত নভশ্চর একটানা ২৪ দিন কাটিয়ে যান ও
নানা পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সালিয়ুৎ-১ স্পেস স্টেশনে তখনো পর্যন্ত দীর্ঘতম সময় কাটানোর পরে তিনজন নভশ্চর যখন সয়ুজ-১১ ব্যোমযানে চেপে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসেন তখন দেখা যায় তিনজন নভশ্চরই মৃত। ব্যোমযানে কিছু ত্রুটি ঘটেছিল, তারই জন্য এই মৃত্যু—নইলে ব্যোমযানের অবতরণ ছিল নিখুঁত।

তিনজন সোভিয়েত নভশ্চরকে নিয়ে সয়ুজ-১১ ব্যোমযান সংযুক্ত হয়েছিল সালিয়ুৎ-১ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে। এই ছিল মহাশূন্যের প্রথম স-মনুষ্য কক্ষ-পরিক্রমারত বৈজ্ঞানিক স্টেশন। দুয়ে মিলিয়ে তার ওজন দাঁড়িয়েছিল ২৫ টনেরও বেশি, আয়তন ১০০ ঘনমিটার, দৈর্ঘ্য ১৯·৫ মিটার ও ব্যাস ৩·৯ মিটার। তুলনায় দু-বছর পরের স্কাইল্যাব অবশ্যই অনেক বড়ো।

প্রথম সালিয়ুতের পরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আরো চারটি স্পেস-স্টেশন আকাশে তুলেছেন ও পৃথিবীর কক্ষে পরিক্রমা করিয়েছেন। ৩ এপ্রিল তারিখে সালিয়ুৎ-২, ২৫ জুন তারিখে সালিয়ুৎ-৩, ২৬ ডিসেম্বর তারিখে সালিয়ুৎ-৪ এবং ২২ জুন তারিখে সালিয়ুৎ-৫। দ্বিতীয় সালিয়ুতে কোনো সময়েই

কোনো নভশ্চর উপস্থিত হননি। তৃতীয় সালিয়ুতে ১৪ দিন (৫ থেকে ১৯ জুলাই) কাটিয়ে যান সয়ুজ-১৪ ব্যোমযানের ছুই নভশ্চর। তারপরে আগস্ট মাসে সয়ুজ-১৫ ব্যোমযান তৃতীয় সালিয়ুতের দিকে অগ্রসর হবার মহড়া দিয়েছিল কিন্তু সংযুক্ত হয়নি। সালিয়ুৎ-৩ স্পেস-স্টেশনে বিশেষভাবে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল মহাশূন্যে পরিক্রমারত অবস্থায় মানুষের শরীরের ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে। তাছাড়া পৃথিবীর উপরিতলের ও আবহাওয়ার চেহারার আলোকচিত্র তোলা হয়েছিল। পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল পৃথিবীর ভূ-বিন্যাস, অরণ্য-সম্পদ ও পরিবর্তমান উপকুল-রেখা। ২৩ সেপ্‌টেম্বর তারিখে তৃতীয় সালিয়ুতের কক্ষ-পরিক্রমার ৯০ দিন পূর্ণ হবার পরে তার অবতরণ-যানটিকে সমস্ত পরীক্ষাকার্য ও অনুসন্ধানের উপকরণ সমেত পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল। অন্যদিকে সয়ুজ-১৫ ব্যোমযানটি এ-ঘটনার ২৬ দিন আগে অন্ধকারে অবতরণ করেছিল। চতুর্থ সালিয়ুতে যথাক্রমে একমাস (জানুআরি—ফেব্রুআরি) ও ছুইমাস (মে—জুলাই) কাটিয়ে যান সয়ুজ-১৭ ও সয়ুজ-১৮ ব্যোমযানের নভশ্চররা। পঞ্চম সালিয়ুতের সঙ্গে সোভিয়েত নভশ্চর সহ সয়ুজ-২১ সংযুক্ত হয়েছিল ৭ জুলাই তারিখে। তখন ছুয়ে মিলিয়ে ওজন দাঁড়িয়েছিল ২৫ টন, দৈর্ঘ্য ২২·৫ মিটার, কাজ করার স্থানের আয়তন ২০ বর্গমিটার। ২৪ আগস্ট তারিখে সয়ুজ-২১ স্পেস-স্টেশন থেকে বিযুক্ত হয়। পঞ্চম সালিয়ুতেও বিরাট এক কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছিল জৈব পর্যবেক্ষণ ও জ্যোতিষিক পরীক্ষাকার্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কক্ষপথে স্টেশন স্থাপন করার জন্য যে-সব পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন, এই হচ্ছে তার মোটামুটি বিবরণ। স্পেস-স্টেশন স্থাপন করার ওপরে ছু-দেশের বিজ্ঞানীরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, মহাবিশ্ব মহাকাশ ও আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কে আরো বেশি জানতে হলে এমনি স্পেস-স্টেশন মানুষের সবচেয়ে বড়ো সহায় হতে পারে।

পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে ভূপৃষ্ঠের কতটুকু আমরা দেখতে পাই? বিমান থেকেই বা কতটুকু? স্পেস্-স্টেশন থেকে গোটা পৃথিবীটাকেই চোখের ওপরে রাখা যায়। গোটা একটি ছবিতে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় কোথায় জমি, কোথায় নদী, কোথায় অরণ্য, কোথায় সমুদ্র; নদীর গতিপথ কোথাও বদলাচ্ছে কিনা, জলের স্তর ওঠানামা করছে কিনা, অরণ্যে আগুন লেগেছে কিনা, ধস নামছে কিনা; ফসলের ফলন কেমন, মাটির নিচে খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি; আরো কত-কি।

স্পেস-স্টেশন থেকে সমুদ্রকে যতো সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে, ভূপৃষ্ঠ থেকে তা সম্ভব নয়। সমুদ্রের বিপুল সম্পদ আহরণ করার উপায়ের সন্ধান যাঁরা করেছেন তাঁদের গবেষণা চালাবার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে স্পেস-স্টেশন।

স্পেস-স্টেশন থেকে গবেষণা করার সুযোগ পেলে ভূ-বিজ্ঞানীদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। যে-সব খবর সংগ্রহ করতে কয়েক বছর সময় লাগার কথা তা স্পেস-স্টেশন থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই হাতে আসতে পারে।

জীববিজ্ঞানীদের বেলাতেও সুবিধা প্রচুর। স্পেস-স্টেশনের ভারশূন্য অবস্থায় জীবের শরীর যতো অনায়াসে কাটাচেরা করা যায় ভূপৃষ্ঠে তা আদৌ সম্ভব নয়। স্পেস-স্টেশনে জীববিজ্ঞানী অনেক সহজে অনেক বেশি জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। ভবিষ্যতে অনেক দুরূহ রোগের চিকিৎসা ও নিরাময়ের জন্য সবচেয়ে কার্যকর হাসপাতাল তৈরি হবে এই স্পেস-স্টেশনেই।

স্পেস-স্টেশন থেকে মহাকাশ ও মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণ সবচেয়ে ভালোভাবে হতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে এই পর্যবেক্ষণ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। অনেক কিছুই রহস্য বলে মনে হয়। বায়ুমণ্ডলের বাইরে স্পেস-স্টেশনের অবাধ পর্যবেক্ষণ থেকে মহাবিশ্বের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে।

স্পেস-স্টেশনের সাহায্যে আরো অনেক কিছুই করা যায় এবং

যাবে। একটি স্পেস-স্টেশন আকাশে তোলা মানেই মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর গোটা এলাকাকে এক-একবার পর্যবেক্ষণ করতে পারা। কোথায় ঝোড়ো মেঘ জড়ো হচ্ছে, কোথায় সাইক্লোন তৈরি হচ্ছে, এসব খবর স্পেস-স্টেশনের মারফত সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে পৃথিবীর মানুষের কাছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস আজকাল যে এত নির্ভুল হতে পেরেছে তা এই স্পেস-স্টেশনের জন্যই।

অন্যদিকে স্পেস-স্টেশন বা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের এতখানি সুবিধা বলেই সমরবিদরা তার সুযোগ পুরোমাত্রায় নিচ্ছেন। একদেশের উপগ্রহ মারফত অন্যদেশের বিমানক্ষেত্র, উৎক্ষেপণ-স্থান ও কল-কারখানার বিশদ সংবাদ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে নিউক্লিয়র ক্ষেপণাস্ত্র ফেলার জন্য উপগ্রহের সাহায্য নেবার কথাও ভাবা হয়েছে। নিউক্লিয়র ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী এই উপগ্রহের নাম ফ্র্যাকশনাল অরবিটাল বোম্‌বার্ডমেণ্ট স্যাটেলাইট বা এফ-ও-বি-এস (ফব্‌স)। প্যাট্রিক মূর প্রকাশিত তাঁর 'দ্য নেক্‌স্‌ট ফিফ্‌টি ইয়ার্স ইন স্পেস' গ্রন্থে ফব্‌স উপগ্রহ সম্পর্কে যথেষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, জাতিতে জাতিতে প্রকৃত সম্প্রীতি গড়ে উঠলে তবেই মহাকাশ-গবেষণার বিপুল সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধানের উপগ্রহ। এজন্য আমেরিকান বিজ্ঞানীরা প্রথম যে উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন তার নাম আর্থ রিসোর্সেস টেক্‌নোলজি স্যাটেলাইট (ই-আর-টি-এস)-১। জুলাই মাসে উৎক্ষিপ্ত এবং ৮০০ কিলোমিটার উচ্চতায় স্থাপিত। তার কক্ষটি ছিল এমন যে দুই মেরুর ওপর দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরত। এই উপগ্রহের সাহায্যে আগে থেকেই খবর পাওয়া যেত কোথাও ফসলে পোকা লেগেছে কিনা, কোথাও দাবানল তৈরি হচ্ছে কিনা, কোথাও বন্যার আশঙ্কা আছে কিনা।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কস্‌মস প্রথম উৎক্ষিপ্ত হয় মার্চ মাসে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এক হাজারের মতো কস্‌মস

আকাশে তোলা হয়েছে। এই সমস্ত উপগ্রহের অনেকগুলোই পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য ও নানা ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ চালাবার জন্য।

প্যাট্রিক মুর তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, আগামী সালের মধ্যে এমনি সম্পদ অনুসন্ধানী উপগ্রহ আরো বহুসংখ্যক আকাশে তোলা হবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে অবিরাম ও সর্বাঙ্গীণ এক অনুসন্ধান-কার্য চলবে। আমাদের সভ্যতাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে আমাদের চাই আরো খনিজ পদার্থ, আরো জল, আরো তৈল। বিশেষ করে শেষেরটি। পৃথিবীর অন্য কোথাও আরো তৈল আছে কিনা তার সন্ধান অবশ্যই উপগ্রহের মারফত পাওয়া যেতে পারে।

উপগ্রহের সাহায্যে

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে অনেক উঁচু থেকে পর্যবেক্ষণ করা চলে যেমন পৃথিবীর উপরিতলকে তেমনি পৃথিবীর মেঘের আবরণটিকে। এ-কারণে কোথাও নিম্নচাপ বা সাইক্লোন তৈরি হচ্ছে কিনা এ-খবর কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া সম্ভব। উপগ্রহ যখন পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তখন সারা পৃথিবীব্যাপী মেঘের গড়ন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানা হয়ে যায়। ফলে অনেক আগে থেকেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, ২৯ জুলাই তারিখে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও দুর্যোগ হয়ে গেল তার খবর কিন্তু মার্কিন আবহ উপগ্রহ নোয়া-৫ প্রেরিত আলোকচিত্র থেকে অনেক আগেই জানা ছিল এবং সেজন্য সতর্ক করেও দেওয়া হয়েছিল। এই নোয়া-৫ থেকে আরো জানা গিয়েছে, দুর্যোগের এখানেই শেষ নয়, পরের সপ্তাহে আরো একটি নিম্নচাপ বা সাইক্লোন বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে।

আবহাওয়ার অনুসন্ধান নেবার জন্য প্রথম যে মার্কিন উপগ্রহ আকাশে তোলা হয় তার নাম টাইরস-১ (১ এপ্রিল ১৯৬০ তারিখে)। টাইরস কথাটি এসেছে টেলিভিশন অ্যাণ্ড ইন্‌ফ্রারেড অব্‌জারভেশন

স্যাটেলাইট থেকে। উপগ্রহে ছিল টেলিভিশন ক্যামেরা ও অবলোহিত অবলোকন-ব্যবস্থা। টেলিভিশন ক্যামেরায় তোলা হত মেঘের ছবি আর অবলোহিত অবলোকন-ব্যবস্থায় ধরা পড়ত সৌর বিকিরণ ও পৃথিবীর উত্তাপ বিকিরণ। দেখা গেল এই সমস্ত ছবি ও তথ্য থেকে পৃথিবীর আবহাওয়াকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস আরো সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আরো দেখা গেল, টাইরস উপগ্রহের সাহায্যে নদী ও সমুদ্রের বরফ সম্পর্কে এবং বরফের আস্তর সম্পর্কে খবর পাওয়া যাচ্ছে। আগে থেকেই জানা যাচ্ছে বরফ গলতে শুরু করলে কতখানি ঢল নামতে পারে।

টাইরস উপগ্রহের চেহারা ঢোলকের মতো, উচ্চতায় ৪৭½ সেন্টিমিটার, ব্যাসে ১০৫ সেন্টিমিটার, ওজনে ১১৬ থেকে ১২৯ কিলোগ্রাম। কক্ষের উচ্চতা ৫৮৭ থেকে ৯৬৬ কিলোমিটারের মধ্যে।

প্রথম টাইরসের পরে অল্প সময়ের মধ্যে আরো সাতটি টাইরস উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়। কিছু বিবরণ দিলে বোঝা যাবে এক্ষেত্রে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব কতখানি।

টাইরস-২। উৎক্ষেপণ, ২৩ নভেম্বর ১৯৬০। এই উপগ্রহের অবলোহিত অবলোকন-ব্যবস্থার সাহায্যে পৃথিবীর রাতের দিকে মেঘের গড়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা গিয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, টেলিভিশন ক্যামেরা পৃথিবীর রাতের দিকে অচল।

টাইরস-৩। উৎক্ষেপণ, ১২ জুলাই ঝড় ও ঝঞ্ঝার ঋতুতে। এই উপগ্রহের সাহায্যে বিধ্বংসী ঝড় ও ঝঞ্ঝার উদ্ভব, রূপ-পরিগ্রহ ও চলন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। একটি দিনে, ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে, টাইরস-৩ বিশেষ করে প্রমাণ দিয়েছিল এমনি ধরনের আবহ উপগ্রহের শক্তি ও সম্ভাবনা কতখানি। ঐ দিন পৃথিবীর ৬,৪০,০০,০০০ বর্গ-কিলোমিটার এলাকা পর্যবেক্ষণ করার কালে টাইরস-৩ অনেকগুলো ঘূর্ণিবাত্যা ও টাইফুন সম্পর্কে খবর জানিয়েছিল ও সতর্ক করে দিয়েছিল। যেমন, ঘূর্ণিবাত্যা এস্থার,

'বেৎসী, কার্লা ও দেব্‌বী এবং টাইফুন পামেলা ও নান্‌সী। নামে যদিও নারী কিন্তু অতি হিংস্র এইসব ঘূর্ণিবাত্যা ও টাইফুন কত মানুষের যে প্রাণ নিয়েছে আর কত ক্ষতি যে করেছে তার কোনো হিসেব নেই। এই উপগ্রহ থেকে ছবি পাবার পরে আগে থেকেই দিন-ক্ষণ জানিয়ে সতর্ক করা গিয়েছিল। অন্য আর এক দিন এই উপগ্রহ থেকেই জানা গিয়েছিল টাইফুন স্যালি নতুন করে উদ্ভূত হচ্ছে। এই আগাম খবরে অনেক ধনপ্রাণ বেঁচেছিল।

টাইরস-৪। উৎক্ষেপণ, ৮ ফেব্রুআরি । এই উপগ্রহ থেকে পাওয়া গিয়েছিল আবহাওয়ার অবস্থার অজস্র পরিষ্কার ছবি এবং সেণ্ট লরেন্স উপসাগরে সামুদ্রিক বরফের চমৎকার আলোকচিত্র। এই উপগ্রহের ওপরে নির্ভর করে ঝড়ের সংকেত ধরার বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মালাগাসি, মরিতানিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায়।

টাইরস-৫। উৎক্ষেপণ, ১৯ জুন । এই উপগ্রহের সাহায্যে ঝড় ও ঝঞ্ঝার অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। গ্রীষ্মকালে বহু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল এই উপগ্রহের সাহায্যে।

টাইরস-৬। উৎক্ষেপণ, ১৮ সেপ্‌টেম্বর । এই উপগ্রহের সাহায্যে পঞ্চম টাইরসের অনুরূপ পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছিল।

টাইরস-৭। উৎক্ষেপণ, ১৯ জুন । এই উপগ্রহের সাহায্যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের ঋতুতে মেঘের ছবি নেওয়া হয়েছিল।

টাইরস-৮। উৎক্ষেপণ, ২১ ডিসেম্বর । এই উপগ্রহে শুরু করা হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় চিত্রপ্রেরণ (অটোমেটিক পিক্‌চার ট্র্যান্‌স্‌মিশন বা এ-পি-টি) ব্যবস্থা। ভূপৃষ্ঠের স্বল্পখরচের স্থানান্তরযোগ্য স্টেশনেও এই চিত্র ধরা যেতে পারে।

এই আটটি টাইরসের অভিজ্ঞতা নিয়ে অতঃপর শুরু করা হয়েছে আবহ উপগ্রহ নিম্‌বাস (Nimbus)। টাইরসের কক্ষ রচনা করা হত বিষুব বরাবর, পুব থেকে পশ্চিমে। ফলে টাইরস পর্যবেক্ষণ

করতে পারত ভূপৃষ্ঠের গোটা এলাকা নয়, প্রায় ২০ শতাংশ। কিন্তু নিম্‌বাসের কক্ষ প্রায় দুই মেরুর ওপর দিয়ে। ফলে ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি এলাকা দিনে অন্তত একবার নিম্‌বাসের পর্যবেক্ষণের আওতায় এসে যেত। নিম্‌বাস উপগ্রহেও ছিল ক্যামেরা ও অবলোহিত অবলোকন-ব্যবস্থা। নিম্‌বাস-১ উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ২৮ আগস্ট তারিখে।

উপগ্রহের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা

আমেরিকান বিজ্ঞানীদের তৈরী প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এক্‌সপ্লোরার-১ আকাশে তোলা হয়েছিল ৩১ জানুআরি ১৯৫৮ তারিখে। এ-ঘটনার ঠিক একশো বছর আগে প্রথম টেলিগ্রাফ কেব্‌ল পাতা সম্ভব হয়েছিল আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারে—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যে। আর আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারে প্রথম রেডিও-বার্তা মার্কনি পাঠিয়েছিলেন ১৯০১ সালে। বিশ্বের জনসংখ্যা তখন খুবই কম ছিল। তারপরে যতোই সময় গিয়েছে, মহাসাগরের দুই পারের দেশের মধ্যে কেব্‌ল ও বেতার যোগাযোগের ওপরে চাপ ততোই বেড়েছে। তবে কেব্‌ল ও বেতার যোগাযোগ যতোই বাড়িয়ে তোলা হোক না কেন, এই দুই মাধ্যমে কেবলমাত্র শব্দ নিয়ে কাজ হতে পারে, ছবি দেখানো যায় না। তার জন্য চাই টেলিভিশনের প্রচার এবং সেটা সম্ভব হতে পারে একমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে।

আমরা জানি, টেলিভিশনের প্রোগ্রাম প্রচার করার জন্য একটি টাওয়ার বা উঁচু স্তম্ভ তৈরি করতে হয়। প্রচার চলে এই স্তম্ভের চুড়ো থেকে। চুড়োটি ভূপৃষ্ঠের যতোখানি দূর পর্যন্ত দেখা যায় ততোখানি দূর পর্যন্তই টেলিভিশনের প্রচার সম্ভব। এইটেই হয়েছে টেলিভিশনের প্রচারে সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে। ভূপৃষ্ঠের রয়েছে বক্রতা, ফলে একটা দূরত্বের পরে উঁচু স্তম্ভের চুড়োও আর চোখে পড়ে না। নিউ ইয়র্কের মতো শহরেও আকাশছোঁয়া অট্টালিকার

ছাদে মস্ত উঁচু অ্যান্টেনা বসিয়ে টেলিভিশনের পাল্লাকে ৭০ কিলো-মিটারের বেশি ছড়ানো যায়নি। কলকাতার হাওড়া ব্রিজের মাথায় শহীদ মিনারের মতো উঁচু অ্যান্টেনা বসিয়ে যদি টেলিভিশনের ছবি প্রচার করার ব্যবস্থা হয় তাহলে হয়তো দুর্গাপুর পর্যন্ত টেলিভিশনের গ্রাহকযন্ত্রে সেই ছবি ধরা পড়তে পারে। এই কারণে টেলিভিশনের প্রচারের জন্য খানিকটা দূর পরে পরে রিলে-স্টেশন বসাতে হয় বা পুনঃসম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয়। এতে খরচ ও জটিলতা দুই-ই বাড়ে। কিন্তু একটি উপগ্রহ থেকে যদি টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়? তাহলে সেই উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠের যতোখানি এলাকা দেখা যায় ততোখানি এলাকায় সেই প্রোগ্রাম প্রচারিত হতে পারে, পুনঃসম্প্রচারের ব্যবস্থা ছাড়াই।

পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যদি দেখি, পৃথিবীর চারদিকে পুরো একবার ঘুরে আসতে একটি উপগ্রহকে পার হতে হয় ৩৬০ ডিগ্রী। এই ৩৬০ ডিগ্রীকে সমান তিনটি ভাগে ভাগ করলে এক-এক ভাগে পড়ে ১২০ ডিগ্রী। যদি এমন তিনটি ভূ-স্থির উপগ্রহ তৈরি করা যায় যাদের অবস্থান ১২০ ডিগ্রী তফাতে তফাতে—তাহলে? তাহলে এই তিনটি ভূ-স্থির উপগ্রহ থেকেই গোটা ভূপৃষ্ঠ দেখা সম্ভব। অর্থাৎ, তিনটি ভূ-স্থির উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর তাবৎ এলাকা জুড়ে টেলিভিশনের প্রচার চলতে পারে।

উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর দূর দূর এলাকার মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা যে সম্ভব তার প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল একো-১ (১২ আগস্ট ১৯৬০) উপগ্রহের মাধ্যমে। এটি ছিল অ্যালুমিনিয়াম-বাষ্পের প্রলেপ দেওয়া অতি-পাতলা পলিয়েস্টার চাদরের একটি গোলক, ব্যাস ৩০ মিটার, ওজন ৫৯.৪ কিলোগ্রাম। রেডিও-সংকেত এই উপগ্রহের গা থেকে ঠিকরে ফিরে আসত এবং এমনিভাবেই ভূপৃষ্ঠের এক স্থান থেকে অপর স্থানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হত।

একো-২ (২৫ জানুআরি) উপগ্রহটি ছিল তেরো-তলা অট্টালিকার মতো লম্বা, ব্যাস ৪০.৫ মিটার, ওজন ২৭০ কিলোগ্রাম।

এই যোগাযোগ উপগ্রহটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই দুটিই নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ। টেলিফোন ও টেলিভিশন যোগাযোগ স্থাপনের উপগ্রহ হতে পারে দু-ধরনের—নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ নিতান্তই একটি প্রতিফলক মাত্র। মাটি থেকে প্রেরিত টেলিভিশন-ঢেউ এই উপগ্রহে প্রতিফলিত হয়ে আবার মাটিতেই ফিরে আসে। সক্রিয় উপগ্রহ রীতিমতো একটি রিপীটার স্টেশন। অর্থাৎ, মাটি থেকে প্রেরিত ঢেউ এখানে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে, অ্যাম্প্লিফায়ার-যন্ত্রে জোরালো হয় ও ট্রান্সমিটার-যন্ত্রে পুনরায় নির্দিষ্ট দিকে প্রেরিত হয়।

সক্রিয় যোগাযোগ উপগ্রহের প্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্কোর (১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৮)। এই উপগ্রহে ব্যাটারি ছিল রাসায়নিক। ব্যাটারির ৩০ দিনের আয়ু শেষ হয়ে যাবার পরে উপগ্রহটির কাজও শেষ হয়। কিন্তু তারই মধ্যে এই উপগ্রহের সাহায্যে ১৯৫৮ সালের বড়দিনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বার্তা সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছিল। মহাকাশ থেকে উপগ্রহের সাহায্যে মানুষের বার্তা প্রেরণের ঘটনা এই প্রথম।

সক্রিয় উপগ্রহের অন্যান্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে রিলে-১ (১৩ ডিসেম্বর
রিলে-১ (২১ জানুআরি), সিন্‌কোম-১ (১৪
ফেব্রুআরি), সিন্‌কোম-২ (২৬ জুলাই), সিন্‌কোম-৩
(১৯ আগস্ট), আর্লি বার্ড (৬ এপ্রিল), ইত্যাদি।
সিন্‌কোম সম্পর্কে বিশেষভাবে বলার কথা, তিনটি উপগ্রহই ছিল ভূ-স্থির। সিন্‌কোম-৩ উপগ্রহের সাহায্যে টোকিও
অলিম্পিকের খেলা টেলিভিশনে আমেরিকায় ও ইউরোপে প্রচার করা হয়েছিল। এক মহাদেশে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক খেলা সাতসমুদ্র পেরিয়ে অন্য মহাদেশে সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে দেখার সুযোগ আগে কখনো ঘটেনি।

ম্যুনিখ অলিম্পিক ও মনট্রীল অলিম্পিকও
উপগ্রহের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে।

শুধু অলিম্পিক নয়, বিশ্বের তাবৎ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (এমনকি মহম্মদ আলির মুষ্টিযুদ্ধের লড়াইও) বিশ্বের মানুষ এখন সঙ্গে সঙ্গেই টেলিভিশনে দেখে থাকে। সবই উপগ্রহের দৌলতে।

তবে যোগাযোগে-উপগ্রহের প্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত হচ্ছে টেলস্টার। রিলে উপগ্রহের মতো এটিও সক্রিয়-রিপীটার উপগ্রহ। টেলস্টার-১ ছিল ৮৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি গোলক, ওজনে ৭৬·৫ কিলোগ্রাম। তার কক্ষের অনুভূ (পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের দূরত্ব, Perigee) ছিল ৯৪৪ কিলোমিটার, অপভূ (পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরের দূরত্ব, Apogee) ৫,৬০৫ কিলোমিটার। উৎক্ষিপ্ত হবার পরে প্রথম দিনেই এই উপগ্রহের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইংলণ্ডে প্রথম টেলিভিশন প্রচার সম্ভব হয়েছিল, দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। টেলস্টার-২ ছিল আরো ভারী, তার কক্ষের অনুভূ ৯৬৬·৪ কিলোমিটার, অপভূ ১০,৭৪১·৩ কিলোমিটার।

টেলস্টার-১ উৎক্ষেপণের কয়েক মাস পরেই অচল হয়ে পড়ে। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরে এই উপগ্রহ থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। উপগ্রহটির মৃত্যু ঘটিয়েছিল ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায় বিস্ফোরিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি পরমাণু-বোমার আটক-পড়া কণিকা।*

* বিজ্ঞানীরা তাই বলেন, উপগ্রহের সাহায্যে বিশ্বজোড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নটা বৈজ্ঞানিক তো বটেই, অনেকখানি রাজনৈতিকও। বিশ্বজোড়া সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আবহাওয়া যদি থাকে তবেই এই ব্যবস্থা ঠিকভাবে চলতে পারে। নইলে, বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধে দেবার নামে এই উপগ্রহকেই করে তোলা যেতে পারে প্রভাব-বিস্তার, ভীতি-প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যম। যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপগ্রহ তৈরি করার ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজি এসে গিয়েছে, এজন্য প্যাট্রিক মূর তাঁর গ্রন্থে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যোগাযোগ-ব্যবস্থা কব্জায় থাকলে আয় করা যায় শুধু মোটা টাকা নয়, বশ্যতাও। সেই প্রাচীন কাল থেকেই সবলের হাতে দুর্বলের ওপরে আধিপত্য করার একটি উপায় হচ্ছে যোগাযোগ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ

উপগ্রহের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী টেলি-যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য আমেরিকার উদ্যোগে ও নিয়ন্ত্রণে গড়ে তোলা হয় ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কনসর্টিয়াম বা সংক্ষেপে ইন্‌টেলস্যাট। এটি পুরোপুরি পরিচালনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কর্পোরেশন (কমস্যাট)। জুলাই মাসের বিবরণে দেখা যায় বিশ্বের ৮৩টি দেশ এই কন্‌সর্টিয়ামের সদস্য। তবে খরচ বহন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫২'৪৭৭ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্য ৭'২৬৬ শতাংশ।

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৫ নভেম্বর তারিখে গঠিত হয়েছে ইন্টারস্পুৎনিক সংগঠন, সংক্ষেপে ইন্টারস্পুৎনিক। ন'টি সমাজতান্ত্রিক দেশ এই সংগঠনের সদস্য---বুলগেরিয়া, কিউবা, চেকোস্লোভাকিয়া, জি ডি আর, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশ্বের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ ছিল আর্লি বার্ড (পরে নাম হয়েছে ইন্‌টেলস্যাট-১)। নভেম্বরে এই উপগ্রহটিকে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে ভূ-স্থির কক্ষে তোলা হয়েছিল।

পূর্ব এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে সারাক্ষণের টেলি-যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দুটি উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়েছিল—প্রথমটি অক্‌টোবরে, দ্বিতীয়টি ১১ জানুআরি তারিখে। প্রশান্ত মহাসাগরের এপারে-ওপারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টেলি-যোগাযোগ শুরু হয় ২৭ জানুআরি তারিখে।

উপগ্রহের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ স্থাপিত হতে পেরেছিল বসন্তকালে। সেই সময়ে আকাশে তোলা হয়েছিল ইন্‌টেলস্যাট-৩ পর্যায়ের দুটি উপগ্রহ—ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে।

ভারত মহাসাগরে স্থিত এই ইন্‌টেলস্যাট উপগ্রহের সাহায্যে ভারতও বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পুনা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে আরভি-তে নির্মিত হয়েছে একটি গ্রাহকযন্ত্রের কেন্দ্র বা আর্থ স্টেশন (৭'৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে)।

ইন্‌টেলস্যাট-৪ পর্যায়ের প্রথম উপগ্রহ আকাশে ওঠে ২৫ জানুআরি তারিখে। কারিগরী দিক থেকে এই উপগ্রহটি অনেক উন্নত। মহাসাগরের এপারে-ওপারে টেলিফোন-বার্তা চলাচল করতে পারত আর্লি বার্ডের সাহায্যে একসঙ্গে ২৪০টি, তৃতীয় ইন্‌টেলস্যাটের সাহায্যে একসঙ্গে ১,২০০টি, আর এই উপগ্রহের সাহায্যে একসঙ্গে ৯,০০০টি। তারপরে এই পর্যায়ে আরো তিনটি উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়েছে—যথাক্রমে ১৯ ডিসেম্বর তারিখে, ২২ জানুআরি তারিখে ও ১৩ জুন তারিখে। শেষেরটি তোলা হয়েছে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহের নাম মল্‌নিয়া-১ (বিদ্যুৎ)। আকাশে উঠেছিল ২৩ এপ্রিল তারিখে। তার কক্ষটি ছিল অতিমাত্রায় উপবৃত্তাকার—অপভূ ৩৫,০০০ কিলোমিটার (উত্তর গোলার্ধে), অনুভূ ৫০০ কিলোমিটার (দক্ষিণ গোলার্ধে)। কক্ষে পুরো একবার ঘুরতে সময় নিত ১১ঘ ৪৮মি। উপগ্রহটির সাহায্যে দূর-দূর স্থানের মধ্যে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার ও টেলিভিশন যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল।

তারপর থেকে প্রতি বছরই অনেকগুলো করে মলনিয়া উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়েছে।

এইসব উপগ্রহের কতকগুলো ছিল মল্‌নিয়া-১ মডেলের, কতকগুলো মল্‌নিয়া-২ মডেলের। এই দুয়ের চেয়ে আরো অনেক উন্নত মল্‌নিয়া-৩ মডেলের প্রথম উপগ্রহ আকাশে ওঠে ২২ নভেম্বর তারিখে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্থির কক্ষের প্রথম যোগাযোগ-উপগ্রহ স্থাপিত হয়েছিল ২৯ জুলাই তারিখে। এটি ছিল অষ্টম মল্‌নিয়া উপগ্রহ। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম স্থির উপগ্রহের নাম কস্‌মস-৬৩৭। উৎক্ষিপ্ত ৭০টি কস্‌মসের মধ্যে এটি একটি।

ভারতের প্রথম উপগ্রহ

১৯ এপ্রিল তারিখে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরী একটি কৃত্রিম উপগ্রহ (আর্যভট) পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হয়েছে। উপগ্রহটির ওজন ৩৬০ কিলোগ্রাম (প্রথম উৎক্ষেপণেই এতবেশি ওজন অন্য কোনো দেশের ছিল না), কক্ষ-পরিক্রমা ৯৬'৪১ মিনিটে। কক্ষটি প্রায় বৃত্তাকার (অপভূ ৬২৩ কিলোমিটার, অনুভূ ৫৬৪ কিলোমিটার) এবং বিষুবতল থেকে ৫০'৪ ডিগ্রী হেলানো।

তবে ভারতের এই উপগ্রহটি আকাশে তোলা হয়েছে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকা থেকে। এবং বলা দরকার, উপগ্রহটি যদিও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরী কিন্তু তার কয়েকটি জরুরী অঙ্গে তাঁদের হাত আদৌ পড়েনি। সেগুলো সরবরাহ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন (সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির সঙ্গে ১০মে তারিখে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী)। যেমন, সৌর সিলিকন সেল ও নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি সমূহের প্যানেল (এই সমস্ত সেল ও ব্যাটারির সাহায্যে উপগ্রহের ভিতরকার রেডিও গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র পৃথিবী থেকে সংকেত পাওয়া মাত্র ক্রিয়াশীল হয়), কম্‌প্রেস্‌ড নাইট্রোজেনের ছ'টি বোতল (যার ব্যবহার উপগ্রহের ঘূর্ণন তৈরি করার জন্য জেট হিসেবে), টেপ-রেকর্ডার (সংগৃহীত তথ্য মজুদ করার জন্য)।

উপগ্রহের বাদবাকি আর সব কিছু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হাতে তৈরী। উপগ্রহ ও গ্রাহক স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা ভারতে প্রস্তুত।

উপগ্রহের সাহায্যে তিন রকমের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য চালানো

হয়েছে: (১) আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে নিঃসৃত এক্স-রশ্মির পরিমাপ গ্রহণ, (২) উচ্চতর আবহমণ্ডল পর্যবেক্ষণ, (৩) সূর্য থেকে উদ্ভূত নিউট্রন ও গামা-রশ্মি ও অন্যান্য বিকিরণ অনুশীলন।

আগামী সালে ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহ একই ভাবে উৎক্ষিপ্ত হবার কথা আছে।

নিজস্ব উপগ্রহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আকাশে উৎক্ষেপণ করেছে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ছ'টি দেশ—যথা, সোভিয়েত ইউনিয়ন (স্পুৎনিক-১, ৪ অক্টোবর ১৯৫৭), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (এক্সপ্লোরার-১, ১ ফেব্রুআরি ১৯৫৮), ফ্রান্স (আস্তেরিক্স-১ ২৬ নভেম্বর), জাপান (ওসমি, ১১ ফেব্রুআরি), চীন (২৪ এপ্রিল) ও ব্রিটেন (প্রস্পেরো, ২৮ অক্টোবর)। অতঃপর ভারতও বিরল সম্মানের অধিকারী এই দলের অন্তর্ভুক্ত হল।

মহাকাশ-গবেষণায় ভারত

ভারতে মহাকাশ-গবেষণা নিয়ে উদ্যোগের সূত্রপাত । দায়িত্ব দেওয়া হয় পারমাণবিক শক্তি বিভাগের ওপরে। পরের বছর এই বিভাগ থেকে গঠন করা হয় মহাকাশ গবেষণার ভারতীয় কমিটি, ডঃ বিক্রম সরাভাই-এর সভানেতৃত্বে। এই বিজ্ঞানীই ছিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার কর্মসূচীর প্রবর্তক। তাঁর সহায় হয়েছিল তাঁরই গুটিকতক ছাত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনকয়েক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রবিদ। ষাটের দশকের শেষদিকে তিনি একটি প্রকল্প খাড়া করেছিলেন। তদনুসারে ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি উপগ্রহ নিজস্ব উৎক্ষেপণ-ব্যবস্থার সাহায্যে কক্ষপথে স্থাপন করার কথা ছিল। তারপরে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সহযোগিতার প্রস্তাব পেয়ে সানন্দে গ্রহণ করেন। তবে তার শেষ দেখে যেতে পারেন নি, ডিসেম্বরে তিনি মারা যান।

ত্রিবান্দ্রমের কাছে থুম্বায় স্থাপিত হয় (চৌম্বক) বিষুবীয় রকেট উৎক্ষেপণ স্টেশন। ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ-কাজে সহায়তা করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে থুম্বা:কে আন্তর্জাতিক সুযোগসুবিধার আওতায় আনা হয়।

পারমাণবিক শক্তি বিভাগের অধীনে স্থাপিত হয় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংগঠন (ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন, সংক্ষেপে ইস্‌রো)। অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটায় ১২,০০০ হেক্‌টর জমির ওপরে আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থাপনাসহ বৃহৎ একটি উৎক্ষেপণ মঞ্চের নির্মাণকার্য শুরু হয়।

অক্‌টোবরে বাঙ্গালোরে স্থাপিত হয় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ প্রকল্প (ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক স্যাটেলাইট প্রোজেক্ট, সংক্ষেপে আই-এস-এস-পি)। দু-বছরের মধ্যে একটি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই প্রকল্পের ওপরে। আড়াই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। খরচ পড়েছে প্রায় ৪·৩ কোটি টাকা।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরী উপগ্রহটিকে চূড়ান্ত পরীক্ষাকার্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়া হয় ১৭ই মার্চ তারিখে। ১৯শে এপ্রিল তারিখে উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হয়।

ভারতে উপগ্রহের সাহায্যে
শিক্ষামূলক প্রচার

আমেরিকার ন্যাসা-র* সঙ্গে সহযোগিতায় ১৮৭৪ সালে একটি উচ্চ-লক্ষ্যসম্পন্ন উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কর্মসূচী ভারতের ছিল। সেটির

---

* এক্‌সপ্লোরার ও ভ্যানগার্ড পর্যায়ের কয়েকটি প্রাথমিক উদ্যোগের পরে মার্কিন বিজ্ঞানীরা অনুভব করতে থাকেন যে মহাকাশ-গবেষণাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে একটি সর্বব্যাপক জাতীয় প্রচেষ্টার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। ১৯৫৮ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি বিধান মার্কিন কংগ্রেসে মঞ্জুর লাভ করে। ১৯৫৮ সালের ১লা অক্‌টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিমান ও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (National Aeronautics and Space Administration), সংক্ষেপে ন্যাসা (NASA)। আমেরিকার

নাম দেওয়া হয়েছিল শিক্ষামূলক উপগ্রহ টেলিভিশন পরীক্ষাকার্য। (স্যাটেলাইট ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শনাল টেলিভিশন এক্‌সপেরিমেন্ট, সংক্ষেপে সাইট)। এই উপগ্রহের সাহায্যে (আমেরিকান এ-টি-এস উপগ্রহ) ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ৫,০০০ গ্রামে শিক্ষামূলক টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচারিত হবার কথা ছিল।

৩০ মে তারিখে আমেরিকার কেনেডি স্পেস কেন্দ্র থেকে এই উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এজন্য খরচ পড়েছে সাড়ে কুড়ি কোটি ডলার—দেড়শো কোটি টাকারও অধিক। এক-একটি অ্যাপোলো অভিযানে চাঁদে মানুষ পাঠাতে যে-পরিমাণ খরচ করতে হয়েছে তার প্রায় অর্ধেক খরচ হয়েছে এই একটি উপগ্রহকে পৃথিবীর আকাশে তোলার জন্য। একটিমাত্র উপগ্রহকে আকাশে তুলতে এমন বিপুল পরিমাণ খরচের দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

উপগ্রহটি ভূ-স্থির। জুন মাস পর্যন্ত ছিল গ্যালাপাগোস দ্বীপের আকাশে। এই অবস্থানে উপগ্রহের আওতায় এসেছিল গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তখন উপগ্রহ থেকে প্রচারিত টেলিভিশন প্রোগ্রাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোনো এলাকা থেকে ধরা যেত।

তারপরে জুলাই মাসে বেতার নির্দেশে উপগ্রহটিকে সরিয়ে আনা হয়েছিল আফ্রিকার কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের আকাশে (তার মানে ৩৬,০০০ কিলোমিটার উঁচুতে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হবার পরেও উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত ছিল উপগ্রহকে নির্দিষ্ট দিকে ঠেলা দেবার একটি ব্যবস্থা বা কোনো এক ধরনের রকেট)। এটি এমন এক অবস্থান যেখান থেকে গোটা ভারতবর্ষ নজরে এসে যায়। এক বছর এই অবস্থানে রেখে উপগ্রহটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল ভারতের (বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও রাজস্থানের) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষামূলক প্রচারের উদ্দেশ্যে।

মহাকাশ-গবেষণার পরিকল্পনা, পরিচালনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব এই সংস্থার ওপরে। প্রায় অর্ধলক্ষ কর্মী এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং প্রায় হাজার কোটি ডলার এই সংস্থার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ।

মহাকাশের জীবন

আমেরিকার স্পেস-স্টেশন স্কাইল্যাবে তিনজন আমেরিকান নভশ্চর ৮৪ দিন কাটিয়ে এসেছেন। সোভিয়েত স্পেস-স্টেশন সালিয়ুৎ-৪-এ দুজন সোভিয়েত নভশ্চর ৬৩ দিন কাটিয়ে এসেছেন। এত দীর্ঘকাল মহাকাশে কাটিয়ে আসার পরেও কারও শরীর কোনোভাবে বিকল হয়নি। এত দীর্ঘকাল ভারহীন অবস্থায় কাটিয়ে আসার পরেও পৃথিবীতে এসে শরীরের পুরো ওজন নিয়ে সকলেই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছেন। এ-থেকে বোঝা যায় স্পেস-স্টেশনে ও ব্যোমযানে মানুষের বেঁচে থাকার উপযোগী আবহাওয়া তৈরি করাটা এখন আর কোনো সমস্যা নয়। সালিয়ুৎ-৪ স্পেস-স্টেশনে নভশ্চররা এমন কি উদ্ভিদের চাষ পর্যন্ত করেছেন এবং স্পেস-স্টেশনে জন্মানো ছোলা খেয়ে জন্মদিনের উৎসব করেছেন।

তবে এখানে লক্ষ করার বিষয়, স্পেস-স্টেশনে যারা ৮৪ দিন কাটিয়ে এসেছেন তাঁরাও নিত্যকার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অক্‌সিজেন নিয়ে গিয়েছিলেন এই পৃথিবী থেকেই। কিন্তু পৃথিবীও তো, বলতে গেলে, একটি ব্যোমযান--মহাশূন্যে ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে তো বাইরে থেকে খাদ্য আসে না, বর্জিত পদার্থ বাতিল করতে হয় না। জীব বেঁচে আছে, বেঁচে থাকছে—তবুও বেঁচে থাকার উপকরণ ফুরিয়ে যায় না।

জৈব চক্র

এমনটি যে হয় তার কারণ আমরা, জীবন্ত প্রাণীরা, বাতাস মাটি জল থেকে একই পরমাণু বারে বারে ব্যবহার করি। পৃথিবী শক্তি পায় সূর্য থেকে কিন্তু পৃথিবীর উপকরণের ভাণ্ডার একই থেকে যায়—শেষহীন এক রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। আমরা যে খাদ্য

খাই তার মধ্যে আছে প্রচুর কার্বন। আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে কার্বন বেরিয়ে আসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আকারে। সূর্যের আলোর এলাকায় যে-সব উদ্ভিদ রয়েছে তারা এই কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয় এবং সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) প্রক্রিয়ায় তা থেকে বাড়বৃদ্ধির উপকরণ বা কার্বন গ্রহণ করে এবং বড়ো হয়। উদ্ভিদের এই উপকরণ আমরা খাই কিংবা জন্তুজানোয়াররা খায়। এমনিভাবে চক্রটি সম্পূর্ণ হয়।

মাটির নিচে সামান্য গভীরতা পর্যন্ত, সমুদ্রের নিচে বেশ কিছুটা গভীরতা পর্যন্ত এবং বায়ুমণ্ডলের তলার অংশ—সব মিলিয়ে জীবমণ্ডল (Biosphere)। আমাদের এই গ্রহে পাতলা একটি খোলার মতো—অথচ তারই মধ্যে রয়েছে সমস্ত জীবন। একমাত্র জীবমণ্ডলের উপাদানগুলোই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাহলে কি ব্যোমযানের মধ্যে এই জৈব উপাদানগুলো নিয়ে প্রয়োজনীয় একটি চক্র ঘটানো যায় না? যেমন ঘটে থাকে জীবমণ্ডলে? যদি যায় এবং ব্যোমযান যদি সূর্যের আলোর মধ্যে থাকে—তখন আর বেঁচে থাকার উপকরণের জন্য বাইরের ওপরে নির্ভর করতে হয় না। ব্যোমযানের জীবন হয়ে ওঠে স্ব-নির্ভর।

খাদ্য

ব্যাপারটা সহজ নয়। ব্যোমযানে যদি একজন নভশ্চরকেও বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তার জন্য দৈনিক বেশ কিছু উপকরণ চাই। যেমন, শুষ্ক খাদ্য চাই দৈনিক ০·৬ কিলোগ্রাম। ফসল থেকে এই খাদ্য পেতে হলে অন্ততপক্ষে ৩০ বর্গমিটার সুফলা জমি চাই। শুনতেই অসম্ভব লাগছে, কাজেই অদূর ভবিষ্যতে স্পেস-স্টেশনে বা ব্যোমযানে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করার কথাই ওঠে না। স্থায়ী বসবাসের স্পেস-স্টেশন গড়ে তোলার সময়ে এই প্রশ্নটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

বেঁচে থাকতে হলে অতি অবশ্যই চাই জল। পদার্থ হিসেবে জল বেশ ভারী, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে বেশ খরচ। আকাশে তুলতে হলে তো খরচ আরো অনেক বেশি।

আমরা কি-ভাবে জল ব্যবহার করি তার হিসেবটা এই রকম: পান করার জন্য ৩·০ কেজি, ধোয়ামোছার জন্য ৫·৫ কেজি—মোট ৮·৫ কেজি। আর জল আমরা বর্জন করি—প্রস্রাবের সঙ্গে ১·৫ কেজি, ঘামের সঙ্গে ১·০ কেজি, নিশ্বাসের সঙ্গে ০·৫ কেজি, ধোয়া-মোছা করার জন্য ৫·৫ কেজি—মোট ৮·৫ কেজি।

অ্যাপোলো ব্যোমযানে প্রত্যেক নভশ্চরের জন্য পানীয় জলের বরাদ্দ ছিল ৩·৫ কিলোগ্রামেরও বেশি।

ব্যোমযানের মধ্যে ব্যবস্থাটা এমন হতে পারে যে বর্জিত জল পরিশোধিত হয়ে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে একই জল বার বার ব্যবহার করা যায়। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় রুদ্ধ (closed)। ব্যবহৃত জল বাতিল করা হলে ব্যবস্থাটি হয় উন্মুক্ত (open)। অ্যাপোলো ব্যোমযানে ছিল আধা-রুদ্ধ ব্যবস্থা—জল, বাতাস, বর্জিত পদার্থ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। প্রস্রাব ত্যাগ করা হয়েছে সরাসরি শূন্যে—সঙ্গে সঙ্গে তা জমাট বাঁধে ও উবে যায়। ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে আসা জল ও নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা জল ঠাণ্ডা ধাতুর পাতের ওপরে ঘনীভূত করা হয়েছে। ব্যোম-যানের মধ্যে আর্দ্রতা বজায় রাখা হয়েছে ৩০ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে।

বাতাস

ব্যোমযানের মধ্যে যদি উদ্ভিদ ব্যবহার করে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগান দিতে হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদ চাই। একজন মানুষ প্রতিদিন নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন

গ্রহণ করে ০'৯ কেজি, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে ১'২ কেজি।

কি সয়ুজ, কি অ্যাপোলো—উভয় ব্যোমযানেই প্রয়োজনীয় সমস্ত অক্সিজেন পৃথিবী থেকে বহন করে নিয়ে যেতে হয়েছে। তারপরেও কিন্তু ব্যোমযানের মধ্যে বায়ুমণ্ডল ঠিক রাখার ব্যাপারটি অতিমাত্রায় জটিল থেকে যায়। অক্সিজেন যোগান দিয়ে চলা চাই, কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসৃত করা চাই—কিন্তু শুধু এইটুকু হলেই সব হয় না। মাত্রাটিও সঠিক রাখা চাই। স্বাভাবিক বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অতি স্বল্প (০'০৩ শতাংশ)। এই মাত্রা সামান্য একটু বাড়লেও শ্বাসকষ্ট হয়। সোভিয়েত ও আমেরিকান উভয় ব্যোমযানেই রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসৃত করার ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ বুদ্ধি থেকে মনে হতে পারে, ভূপৃষ্ঠে আমরা যে বাতাসে নিশ্বাস নিই, ব্যোমযানের মধ্যেকার বাতাস তেমনি হলেই ভালো। অর্থাৎ, স্বাভাবিক চাপে বা এক বায়ুমণ্ডলের চাপে স্বাভাবিক বাতাস। অথচ ব্যোমযানের বাইরে বাতাস নেই, চাপও নেই। এক্ষেত্রে ব্যোমযানের ভিতরকার চাপের দরুন বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে এবং তা দূর করার জন্য ব্যোমযানের কাঠামোকে খুবই শক্তপোক্ত করতে হয়। তার মানে, ব্যোমযানের কাঠামো আরো বেশি ভারী হওয়া। তার মানে, ব্যোমযানকে আকাশে তোলার জন্য আরো প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি খরচ হওয়া। সোভিয়েত ব্যোমযান সয়ুজকে যে-রকেটের সাহায্যে আকাশে তোলা হয় তা খুবই শক্তিশালী। ফলে সয়ুজকে শক্তপোক্ত করা চলে। আর তাই সয়ুজের ভিতরকার বাতাস স্বাভাবিক চাপের স্বাভাবিক বাতাস (অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ—সমুদ্রতলে প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১৪'৭ পাউণ্ড চাপের মাত্রায়)। কিন্তু অ্যাপোলো ব্যোমযানের কাঠামো এতটা শক্তপোক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই অ্যাপোলো ব্যোমযানের ভিতরকার চাপ স্বাভাবিক চাপের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। এত

অল্প চাপে স্বাভাবিক বাতাস নিশ্বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, বিশুদ্ধ অক্সিজেন হয় না। এই কারণে অ্যাপোলো ব্যোমযানের ভিতরকার বাতাস বিশুদ্ধ অক্সিজেনের (প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ৫ পাউণ্ড মাত্রার চাপে)।

ব্যোমযানের ভিতরকার বাতাস যদি বিশুদ্ধ অক্সিজেন হয় তাহলে বিপদও আছে। সামান্য আগুনেই প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ২৭শে জানুআরি তারিখে অ্যাপোলো-১ ব্যোমযানে রুটিন প্রশিক্ষণ চলার সময়ে এমনি এক অগ্নিকাণ্ডে তিনজন নভশ্চর প্রাণ হারিয়েছিল। ব্যোমযানটির রওনা হবার কথা ছিল ২১শে ফেব্রুআরি তারিখে, তখনো জ্বালানি ভরা হয়নি, মাটিতে থাকা অবস্থাতেই বৈদ্যুতিক গোলযোগের দরুন ব্যোমযানের ভিতরে আগুন লাগে এবং মাত্র ১৪ সেকেণ্ডের মধ্যে তিনজনই আগুনে পুড়ে মারা যায়।

দুই ব্যোমযানের ভিতরে দুই প্রকারের বায়ুমণ্ডল হওয়ার দরুন সয়ুজ-অ্যাপোলো ডকিং বা সম্মিলন ঘটানোর সময়েও দারুণ অসুবিধা দেখা দিয়েছিল এবং বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

অন্যদিকে ব্যোমযানের ভিতরকার বাতাস স্বাভাবিক হলেও বিপদ আছে—যদি কোনো কারণে ব্যোমযানে ফুটো হয় ও ভিতরকার চাপ কমে যায়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ব্যোমযানের ভিতরকার বায়ুমণ্ডল তৈরি করার ব্যাপারটি অতি জটিল।

তাপমাত্রা

ব্যোমযানের ভিতরে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে এবং নভশ্চরদের শরীর থেকে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ যাতে অসহ্য না হয় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। ব্যোমযানের বাইরে মহাশূন্যে কোনো তাপ নেই, ফলে ব্যোমযানের তাপ সেই তাপহীনতার মধ্যে উবে

যেতে পারে। ব্যোমযানের ভিতরকার উত্তাপ কমাবার জন্য তরল পদার্থ সঞ্চালিত করা হয়, পরে ব্যোমযানের বাইরের দিক থেকে সেই তরল পদার্থের উত্তাপ মহাশূন্যে উবে যায়। ব্যোমযানের একদিক সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, একই সময়ে ব্যোমযানের অন্যদিকে থাকে মহাশূন্যের অতি-শীতলতা। এই বৈষম্য দূর করার জন্য চন্দ্রে যাতায়াতের পথে অ্যাপোলো ব্যোমযানকে খুব আস্তে আস্তে পাক খাওয়ানো হয়েছিল। সব মিলিয়ে ব্যোমযানের ভিতরকার তাপমাত্রা ২২·৫ ডিগ্রী থেকে ২৭·৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বজায় রাখা হয়।

বর্জিত পদার্থের ব্যবস্থা

ব্যোমযানে থাকাকালীন নভশ্চররা মলত্যাগ করে প্লাষ্টিকের থলের মধ্যে। থলের মুখ এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়। থলের মধ্যে থাকে জীবাণুনাশক ও দুর্গন্ধনাশক পদার্থ, ফলে মল হয়ে যায় সম্পূর্ণ জীবাণু-মুক্ত ও দুর্গন্ধমুক্ত। ব্যোমযানের ভিতরেই সেটি থাকে, প্রস্রাবের মতো শূন্যে ফেলা হয় না। কঠিন পদার্থ শূন্যে ফেলার বিপদ এই যে তা হয়তো ব্যোমযানের পাশে পাশেই চলতে থাকবে—তাতে দেখার ও চালনার অসুবিধে হতে পারে। একবারের অভিযানে এমনও ঘটেছে যে শূন্যে ফেলা প্রস্রাব জমাট বেঁধেছে এবং তা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়েছে—তখন ভুল করে সেটিকে মনে করা হয়েছে তারা।

মহাশূন্যের পোশাক

ব্যোমযান থেকে বেরিয়ে এসে মহাশূন্যে সঞ্চরণের দুটি ছবি এই বইয়ে আছে—একটিতে দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত নভশ্চর লিওনভকে
অপরটিতে আমেরিকান নভশ্চর হোয়াইটকে ।
দুই নভশ্চরই বিশেষ একধরনের পোশাক পরে বাইরে এসেছেন—এই হচ্ছে মহাশূন্যের পোশাক বা স্পেস-স্যুট।

ব্যোমযানের কামরার মধ্যে যেমন মানুষের বাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হয়, এই স্পেস-স্যুটের মধ্যেও তাই। স্পেস-স্যুটের মধ্যেও থাকে নিয়ন্ত্রিত বায়ুমণ্ডল—সঠিক মাত্রায় অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও আর্দ্রতা। তাপমাত্রা ঠিক রাখা হয় নলের মধ্যে দিয়ে তরল পদার্থ সঞ্চালিত করে। হেলমেট সহ স্পেস-স্যুট পরা অবস্থায় সাধারণত খাদ্য গ্রহণ করা হয় না—তাও করা চলে। প্রস্রাব বা মলত্যাগ করতে হলে তা ধরে রাখার জন্য স্পেস স্যুটের মধ্যেই থলের ব্যবস্থা আছে।

স্পেস-স্যুট বড়োই জবড়জঙ্গ ব্যাপার, বেশিক্ষণ পরে থাকা যায় না। অ্যাপোলো অভিযানের নভশ্চররা অধিকাংশ সময়ে স্পেস-স্যুটের বাইরে ছিলেন। তবে চাঁদে নামার সময়ে অবশ্যই স্পেস-স্যুট পরতে হয়েছে। কখনো কোনো কারণে যদি ব্যোমযানের ভিতরকার চাপ কমে যেত তাহলেও সঙ্গে সঙ্গে পরতে হত।

বেগ ও ত্বরণ

ব্যোমযান যখন আকাশে ওঠে বা মাটিতে নামে তখন তার বেগে বিরাট রকমের পরিবর্তন হয়ে থাকে। আকাশে ওঠার সময়ে বেগ বাড়তে বাড়তে চলে বা ত্বরণযুক্ত হয়। মাটিতে নামার সময়ে বেগ কমতে থাকে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বেগের ত্বরণ ও হ্রাসপ্রাপ্তি, দুই-ই নভশ্চরের পক্ষে অস্বস্তিকর। মানুষের শরীর কতখানি ত্বরণ বা হ্রাসপ্রাপ্তি সহ্য করতে পারবে তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা ছাড়ানো চলে না।

এখনো পর্যন্ত ব্যোমযান চালনা করতে হয় রকেটের সাহায্যে। রকেট চলে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি পুড়িয়ে। এখনো পর্যন্ত যে-ধরনের জ্বালানি আমাদের হাতে আছে তাতে অনেক সময় নিয়ে একটু একটু করে রকেটের বেগসঞ্চার করা চলে না। অল্প সময়ের মধ্যে রকেটের বেগ তুলে নিতে হয়। এই কারণে উৎক্ষিপ্ত হবার সময়ে রকেট ও ব্যোমযানের ত্বরণ অতি দ্রুত। বেগের এই যে দ্রুত ত্বরণ—এটাই সহ্য করা শক্ত।

ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

ভূপৃষ্ঠে আমাদের শরীরের ওপরে সব সময়েই একটি শক্তির ক্রিয়া রয়েছে—তা হচ্ছে অভিকর্ষের শক্তি। অর্থাৎ, পৃথিবী যে আমাদের টানছে সেই টানজনিত শক্তি। এটা যে একটা শক্তি তা টের পাই কোনো বস্তুকে মাটিতে পড়তে দেখলে। তাকের ওপরে একটি বই রয়েছে, বইটি স্থির। কিন্তু তলা থেকে তাক সরিয়ে নিলেই বইটি মাটির দিকে নামতে থাকে। মাটিতে যখন পৌঁছয় তখন তার যথেষ্ট বেগ। এই যে স্থির অবস্থা থেকে বেগবান অবস্থা—এটি সম্ভব হয়েছে ত্বরণ ঘটার ফলে। ত্বরণ কি ? সময়ের মধ্যে বেগের পরিবর্তন। আর পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন কোনো শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। মাটির ওপরে বা এমনকি বরফের ওপরে গড়িয়ে দেওয়া একটা বল যে অনন্তকাল ধরে সিধে একটানা গতিশীল থাকতে পারে না তার কারণ, আমরা জানি, ঘর্ষণজনিত শক্তি। যে কোনো গতিশীল বস্তুর ওপরে বাতাস জল ও মাটির ঘর্ষণজনিত শক্তি কাজ করে থাকে আর তাই গতি থেমে যায়। কিন্তু পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহ যেখানে পৃথিবীর কক্ষে ঘুরছে সেখানে কোনো ঘর্ষণ নেই—আর তাই কৃত্রিম উপগ্রহ অনন্তকাল ধরে একই বেগে ঘুরে চলে। অন্তত চলার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের এলাকাতেও কিছু কিছু কণিকা থেকে গিয়েছে এবং তার দরুন থেকে গিয়েছে ঘর্ষণ। তাহলে, কথাটা এই পাওয়া যাচ্ছে যে বেগের পরিবর্তন যদি ঘটে বুঝতে হবে যে শক্তির ক্রিয়া ঘটেছে। অভিকর্ষ অবশ্যই একটা শক্তি। এই শক্তির একটা মাপ অবশ্যই আছে। সাধারণত ধরে নেওয়া হয়, এক-কিলোগ্রাম ভরের ওপরে যে-শক্তি নিচের দিকে ক্রিয়াশীল তাই হচ্ছে এক-অভিকর্ষ। ভারহীন অবস্থাকে বলা হয় শূন্য-অভিকর্ষ।

দেখা গিয়েছে, মানুষের শরীরের ওপরে কয়েক অভিকর্ষের একটা শক্তি প্রয়োগ করলে অস্বস্তি ও যন্ত্রণা হতে থাকে, শরীরের ক্ষতিও হতে পারে। চোটটা গিয়ে সবচেয়ে আগে পড়ে রক্তের

ওপরে। মাথা থেকে পায়ের দিকে শক্তি প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে, শক্তি বেশি হলে মস্তিষ্কে রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা হৃৎপিণ্ডের থাকে না। ফলে চেতনা হারাতে হয়।

উৎক্ষেপণের সময়ে ব্যোমযানের বেগ যখন ত্বরণযুক্ত হয় তখনো নভশ্চরের শরীরের ওপরে প্রচণ্ড একটা শক্তির ক্রিয়া ঘটে।

পরীক্ষাকার্যে দেখা গিয়েছে, যেদিকে গতি তার সমকোণে শায়িত অবস্থায় থাকলে ২২-অভিকর্ষের শক্তিও মানুষের শরীর অল্পক্ষণের জন্য সহ্য করতে পারে। গতিমুখের সমকোণে থাকলে শক্তি এসে পড়ে পিঠের দিকে, মাথা থেকে পায়ের দিকে নয়। তাতে সহ্যক্ষমতা বাড়ে। উৎক্ষেপণের সময়ে নভশ্চরকে তাই গতিমুখের আড়াআড়ি কৌচে শায়িত অবস্থায় রেখে ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

ভারহীনতা

অত্যধিক শক্তি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, এই কারণে বেগ বাড়ানো বা কমানোর ব্যাপারটাকে ধীরে করার চেষ্টা হয়। কিন্তু নভশ্চর যখন ভারহীনতার অবস্থায় থাকে, তখন কী হয়? আমেরিকান নভশ্চররা স্কাইল্যাবে ৮৪ দিন কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাদের শরীরের কোনো ক্ষতি হয়েছে এমন মনে হয়নি। পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে কখনো অসুবিধে বোধ করেছেন তাও নয়। নভশ্চররা বলেন, ভারহীনতার অবস্থা এক মনোরম অনুভূতি।

ভারহীনতার অবস্থায় সমস্যা যা দেখা দেয় তা সবই ছোটখাটো। যেমন, জিনিসপত্র নড়াচড়া করা, খাদ্য গ্রহণ, ইত্যাদি। এজন্য অবশ্যই বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও বিশেষ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। এগুলোর জন্য খানিকটা অসুবিধে হয় মাত্র, ক্ষতি হয় না।

ভারহীনতার অবস্থায় নভশ্চরদের শরীরের ওপরে কোনো ক্রিয়া ঘটে কি? এখনো পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ ধরা পড়েনি। মানুষের শরীর নানা দিক থেকেই অসাধারণ। নানা বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মানুষের শরীরের অস্থি, মজ্জা, কোষ, রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি চমৎকার

মানিয়ে নিতে পারে। আর হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে বলা চলে, ভারহীনতার অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কাজ বরং অনেকটা হাল্‌কা হয়ে যায়।

খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্য

ভারহীন অবস্থায় খাওয়া ও পান করা মোটেই সহজ নয়। অসুবিধে দূর করায় জন্য খাদ্য ও পানীয় প্লাস্টিকের থলের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়। থলের মধ্যেই জল দিয়ে জল-নিষ্কাশিত খাদ্য ভিজিয়ে নেওয়া হয়, তারপরে থলে টিপে টিপে মুখে পোরা হয়। একই উপায়ে পানীয় গ্রহণ করা হয়। মহাকাশ-অভিযানের গোড়ার দিকে টুথপেস্টের মতো টিউবে খাদ্য ভরে দেওয়া হত। কিন্তু অমনভাবে খাওয়াটা নভশ্চররা ঠিক পছন্দ করত না। পরে শুষ্ক খাবার দেওয়া হতে লাগল, সেই সঙ্গে সাধারণভাবে কামড়ে কামড়ে খাবার জন্য সাধারণ শুকনো খাবারও। ভারহীনতার অবস্থায় খাদ্যগ্রহণের অন্য একটা বিপদ এই যে খাবারের গুঁড়ো ও জলের ফোঁটা যত্রতত্র ভেসে বেড়াতে থাকে এবং যন্ত্রপাতি ও কলকব্‌জার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেগুলোকে বিকল করে দিতে পারে।

এবার একজন নভশ্চরের মুখেই শোনা যাক খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটি তিনি কি-ভাবে সারেন। তাঁর নাম পিওতর ক্লিমুক, মহাকাশে দু-বার জীবন কাটিয়ে এসেছেন—একবার ডিসেম্বরে ৮ দিনের জন্য সয়ুজ-১৩ ব্যোমযানে, আর একবার মে-জুলাই মাসে ৬৩ দিনের জন্য স্পেস-স্টেশন সালিয়ুৎ-৪-এ।

পরে এই নভশ্চর ভারত সফর করে গিয়েছেন ও কলকাতাতেও এসেছিলেন।

'নভশ্চরের খাওয়া দিনে সাধারণত চারবার। মহাকাশে থাকার সময়ে আমরা অনেক বার খাই কিন্তু কখনোই খুব বেশি পরিমাণে নয়। শক্তিমান স্বাস্থ্যবান একজন পুরুষের পক্ষে দুটি প্রাতরাশ যথেষ্ট নয়, তাতে আরো যেন খিদে বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলেন, ক্যালরির পরিমাপের দিক থেকে এই খাদ্যই যথেষ্ট। নভশ্চরের

এমনটি মনে হওয়ার কারণ সম্ভবত খাদ্যের স্বল্পতা। তবে ডিনারের খাওয়াটি আরো ভরপুর। তিন রকম পদ থাকে ডিনারে।

প্রথম পদটি হচ্ছে স্যুপ—সোরেলের বা বীটের বা বাঁধাকপির। দ্বিতীয় পদটি মাংস—গোরুর পাঁজর, শুয়োরের মাংসের সসেজ, মুরগি, গোরুর জিভ, আরো কয়েক প্রকারের মাংস ও সসেজ। তৃতীয় পদটি পানীয়—চা, কফি ও ফলের রস। এই তিনটি পদ হয়ে থাকে নভশ্চরের পছন্দমতো। তাছাড়া থাকে নানা প্রকারের রুটি ও কেক এবং কিছু চকোলেট ও মিষ্টান্ন।

রুটি রাখা হয় বিশেষ এক ধরনের মোড়কের মধ্যে। এক-একটি মোড়কে আটটি করে রুটি। মোড়ক না খুললে একবছর পর্যন্ত রুটি টাটকা থাকে। চকোলেট ও মিষ্টান্ন রাখা হয় পাতলা চামড়ার মতো এক ধরনের জিনিসের আঁটো মোড়কের মধ্যে। এই মোড়ক খোলার দরকার হয় না, মুখে পুরলেই মোড়কটি সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়।

স্যুপ ও পানীয় (চা বাদে) পাওয়া যায় সীল-করা অ্যালুমিনিয়মের টিউবে। খাবার সময়ে প্রথমে মুণ্ডিটি প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলতে হয়, তারপরে ছুরির ডগা দিয়ে মুখ-ঢাকা চাদরের ওপরে ফুটো করতে হয়। তারপরের কাজ খুবই সহজ। খুব আস্তে আস্তে টিউব টিপতে হয় ও ভিতরকার পদার্থ চুষে চুষে খেতে হয়। টিউবটি কখনো আচমকা জোরে টিপতে নেই, তাহলেই ফেটে যেতে পারে।

আরো একটা কথা বলা দরকার। খাদ্য হতে পারে টিনে-ভরা স্বাভাবিক খাদ্য, কিংবা জল-নিষ্কাশিত শুষ্ক খাদ্য। শুষ্ক খাদ্য থাকে ভাল্‌ভ সমন্বিত বিশেষ ধরনের ব্যাগে, যার মধ্যে ১৫০ থেকে ২০০ মিলিলিটার পর্যন্ত গরম বা ঠাণ্ডা জল ঢালা সম্ভব। খাদ্য সমস্ত জল শুষে নেয় এবং তখন সেটি খাওয়ার যোগ্য হয়।

সারা দিনে যতো খাদ্য খাওয়া হয় তার ক্যালরির পরিমাপ ৩১০০ থেকে ৩২০০। বিজ্ঞানীদের মতে এই পরিমাণ ক্যালরি থাকাটাই শরীরকে সুস্থ রাখার পক্ষে যথেষ্ট।'

মহাকাশের বিপদ

স্পুৎনিক আকাশে ওঠার অনেক আগে থেকেই জানা ছিল যে বাইরের মহাকাশ মানুষের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। সেখানে সবচেয়ে বড়ো বিপদ ও আশঙ্কা হচ্ছে মহাজাগতিক বিকিরণ, যা চোখে দেখা যায় না। আমাদের সূর্য থেকে ও দূরের গ্যালাক্সি থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণিকার স্রোত আলোর বেগে ধাবিত হয়। এই হচ্ছে মহাজাগতিক বিকিরণ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও চৌম্বক ক্ষেত্র থাকার জন্য পৃথিবীর মাটিতে এই বিকিরণ পৌঁছতে পারে না—তাই পৃথিবীর জীবন এই প্রাণঘাতী বিকিরণ থেকে বেঁচে গিয়েছে। বায়ুমণ্ডল এই বিকিরণকে শুষে নেয়, চৌম্বক ক্ষেত্র এই বিকিরণের কণিকাগুলোকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। তাই মহাকাশে মানুষ পাঠাবার আগে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে খোঁজখবর নিতে হয়েছিল বিকিরণের বিপদ কতখানি। গোড়ার দিকে স্পুৎনিক ডিসকভারার ও একস্‌প্লোরার জাতীয় উপগ্রহ-গুলোর একটি কাজ ছিল এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো। লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, মহাজাগতিক বা কসমিক বিকিরণের বিপদ যতোটা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়ে কম। যদি ঠিকমতো আড়াল তোলার ব্যবস্থা থাকে তাহলে কসমিক বিকিরণের এলাকাতেও মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। তবে এও জানা গিয়েছে, সূর্যে যখন ঝলক ঘটে তখন এই বিপদ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। প্রতি চার বা পাঁচ বছর পরে-পরে উচ্চতর শক্তির ঝলক ঘটে থাকে এবং কয়েক দিন ধরে চলে। মাঝারি বা নিচু শক্তির ঝলক প্রতি বছরে বারকয়েক ঘটে। তবে সূর্যের ওপরে যদি নজর রাখা যায় তাহলে আগে থেকেই এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া সম্ভব।

গোড়ার দিকের উপগ্রহ থেকে অন্য আরেকটি হতবুদ্ধিকর আবিষ্কার হয়েছিল—ভ্যান অ্যালেন বলয়। বিজ্ঞানীরা তার আগে

ভাবতেও পারেন নি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বাঁধা পড়ে গিয়ে কোটি কোটি বৈদ্যুতিক কণিকা পৃথিবীকে ঘিরে তীব্র বিকিরণের দুটি বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে।

চোদ্দ কিলোগ্রামের উপগ্রহ এক্‌সপ্লোরার-১ আকাশে উঠেছিল ৩১ জানুআরি ১৯৫৮ তারিখে। তার কক্ষটি ছিল অতিমাত্রায় উপবৃত্তাকার। কক্ষ-পরিক্রমার কিছু সময়ে এই উপগ্রহ থেকে এমন সব তথ্য আসতে লাগল যা থেকে ধরে নিতে হয় উপগ্রহটি তীব্র বিকিরণের এলাকা পার হচ্ছে। এবং এলাকাটি পৃথিবীর যথেষ্ট কাছে। ২৩শে মে পর্যন্ত উপগ্রহটি সক্রিয় ছিল, কিন্তু ততোদিনে লব্ধ তথ্য থেকে ভ্যান অ্যালেন বলয় সম্পর্কে মোটামুটি পরিষ্কার একটি ধারণা লাভ হয়ে গিয়েছে। তারপরে ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে যতো সোভিয়েত ও আমেরিকান উপগ্রহ আকাশে উঠেছিল তার প্রায় সবকটিতেই বিকিরণ নিয়ে পরীক্ষাকার্য চালাবার ব্যবস্থা ছিল। জানা গিয়েছিল, কিছুটা আড়ালের ব্যবস্থা রেখে একজন নভশ্চর নিরাপদেই ভ্যান অ্যালেন বলয় পার হতে পারে। বিকিরণের যতোটুকু ছোঁয়াচ তার শরীরে লাগে তা মারাত্মক মাত্রার চেয়ে প্রায় দু-শো ভাগের একভাগ। কাজেই, মহাকাশে যাত্রা করতে হলে ভ্যান অ্যালেন বলয় কোনো বাধা নয়। কিন্তু স্থায়ী স্পেস-স্টেশন স্থাপন করতে হলে ভ্যান অ্যালেন বলয় অবশ্যই একটা সমস্যা।

উচ্চ বায়ুমণ্ডলে নিউক্লিয়র পরীক্ষাকার্য যদি চলতে থাকে তাহলেও মহাকাশের একটি বিপদ তৈরি হয়ে থাকতে পারে। অ্যাপোলো-৮ যেদিন পৃথিবীতে ফিরে আসছিল সেইদিনই চীনারা উচ্চ বায়ুমণ্ডলে একটি বিস্ফোরণ ঘটায়। ভাগ্যক্রমে অ্যাপোলো-৮ নভশ্চরদের কোনো বিপদ ঘটেনি।

মহাকাশের অপর এক বিপদ—উল্‌কাপিণ্ডের সঙ্গে ব্যোমযানের সঙ্ঘর্ষ ঘটা। ভূপৃষ্ঠে আমরা বায়ুমণ্ডলের নিচে আছি বলে এই বিপদ থেকে মুক্ত। কিন্তু মহাশূন্যে এই বিপদ অবশ্যই থাকতে পারে। উল্‌কা-পিণ্ড হতে পারে ধুলোর কণা থেকে শুরু করে কয়েক টন ওজনের

পাথরের চাঁই পর্যন্ত যে-কোনো আকারের। ধুলোর কণার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ অনবরতই ঘটে থাকে, কিন্তু তার দরুন কোনো ক্ষতি হয় না। ৩০ গ্রাম বা তারও বেশি ওজনের বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ঘটার ঝুঁকির জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা চলে। তবে সঙ্ঘর্ষ অবশ্যই এমনভাবে হিসেবের বাইরে হয়ে যেতে পারে যার ফলে বিপর্যয় অনিবার্য। একগ্রাম পর্যন্ত ওজনের মাঝারি আকারের উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি। এক্ষেত্রে ব্যোমযানের কাঠামোকে দুই-দেওয়ালের করে বিপদ ঠেকানো হয়। দেখা যাচ্ছে, ১২ই ফেব্রুআরি তারিখে ভোস্তোক-১ ব্যোমযানে যুরি গাগারিনের কক্ষ-পরিক্রমার পরে বহুসংখ্যক স-মনুষ্য ব্যোমযান আকাশে উঠেছে ও বহুদিন ধরে থেকেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ঘটার দরুন বড়ো রকমের কোনো বিপদ ঘটেনি।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

২২ এপ্রিল তারিখে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও আরো ১৯টি দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বলা হয়েছে, 'দুর্ঘটনা, আপদবিপদ, জরুরী অবস্থা, বা অনিচ্ছাকৃত অবতরণ ঘটলে নভশ্চরদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা করা হবে।' তারপরে ২৪মে তারিখে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও প্রেসিডেন্ট কোসিগিন একটি সহযোগিতার কর্মসূচীর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কর্মসূচীর বিষয় ছিল আমেরিকার অ্যাপোলো ব্যোমযানের সঙ্গে সোভিয়েতের সয়ুজ ব্যোমযানের ডকিং বা সম্মিলন।

ব্যাপারটি সহজ ছিল না। দুই দেশের ব্যোমযান ছিল দুই প্রকারের। একটির সঙ্গে অপরটির মিলন ঘটাতে হলে অনেক কিছু ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। অথচ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যদি মহাকাশ-গবেষণার কর্মসূচী হাতে নিতে হয় তাহলে

সবচেয়ে আগে মহাকাশের কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যোমযানের মধ্যে মিলন ঘটানো চাই। এমনকি, এক দেশের নভশ্চর যদি বিপদে পড়ে আর অন্য দেশের ব্যোমযান নিয়ে উদ্ধারকার্য চালাতে হয় তাহলেও আগে চাই বিপদগ্রস্ত ব্যোমযানের সঙ্গে উদ্ধারকারী ব্যোমযানের মিলন।

১৭ই জুলাই তারিখে পৃথিবীর কক্ষপথে সয়ুজ-১৯ ব্যোমযানের সঙ্গে অ্যাপোলো ব্যোমযানের ঐতিহাসিক মিলন ঘটেছে (তার জন্য খরচ করতে হয়েছে ৫০ কোটি ডলার)। সয়ুজের অন্যতম নভশ্চর ছিলেন আলেক্সি লিওনভ, যিনি মার্চে কক্ষ-পরিক্রমারত ভোস্তক-২ থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বের প্রথম মানুষ হিসেবে মহাশূন্যে সঞ্চরণ করেছিলেন। অ্যাপোলোর অন্যতম নভশ্চর ছিলেন টমাস স্ট্যাফর্ড, যিনি মে মাসে অ্যাপোলো-১০ ব্যোমযানে চাঁদে ঘুরে এসেছিলেন। এই দুই ঐতিহাসিক পুরুষ মহাশূন্যে এসে পরস্পরের করমর্দন করেন, পরস্পরের ভাষায় কথা বলেন ও পরস্পরের খাদ্য গ্রহণ করেন। সয়ুজের অপর নভশ্চর ছিলেন ভালেরি কুবাসভ এবং অ্যাপোলোর অপর দুই নভশ্চর ছিলেন ভান্স ব্র্যাণ্ড ও ডোনাল্ড স্লেটন।

এই ঘটনা ঐতিহাসিক আরো এই কারণে যে এখানেই মহাকাশ যুগের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হল বলা চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্যাটার্ন রকেট ও অ্যাপোলো ব্যোমযানের এই ছিল শেষ আকাশ-গমন।

অতঃপর আমেরিকা কয়েক বছর ধরে শাট্‌ল ব্যোমযান নিয়ে গবেষণা চালাবে। এবং সম্ভবত প্রথম পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করবে।

আমরা আমাদের আলোচনায় অনেকগুলো মহাকাশ-অভিযানের বেলায় ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করেছি। লক্ষ করার বিষয়, ব্যয় অতি বিপুল। তার একটি কারণ, একটি ব্যোমযান আকাশে ওঠে তো তার প্রায় সবটাই খোয়া যায়, নভশ্চর মাটিতে নামে মাত্র একটু খোলস নিয়ে। অ্যাপোলো ব্যোমযান যখন রওনা হয়েছিল তার

দৈর্ঘ্য ছিল ১০৮ মিটার, ফিরে এসেছিল মাত্র সাড়ে-ছয় মিটারের একটি খোলস। অ্যাপোলো ও সয়ুজ ধরনের ব্যোমযানকে মাত্র একবারই ব্যবহার করা চলে। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে অনেকটা এই এই রকম: এক ভদ্রলোক ব্যারাকপুর থেকে কলকাতায় আপিস করেন, কিন্তু প্রতিদিনই তাঁকে একটি করে নতুন মোটরগাড়ি কিনতে হচ্ছে, এক গাড়ি দু-বার ব্যবহার করতে পারেন না। আমেরিকার শাট্‌ল-ব্যোমযান ভূপৃষ্ঠ ও পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত স্পেস-স্টেশনের মধ্যে বারে বারে যাতায়াত করতে পারবে।

আশা করা হচ্ছে, শাট্‌ল-ব্যোমযান প্রবর্তিত হলে মহাকাশে পাড়ি দেবার খরচ দশ ভাগের নয় ভাগ কমবে। এবং, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নভশ্চর যাঁরা নন তাঁরাও এই শাট্‌ল-ব্যোমযানের যাত্রী হতে পারবেন।

চাঁদে মানুষ

চাঁদ আমাদের কাছ থেকে মোটামুটি চারলক্ষ কিলোমিটার দূরে। এটা খুব যে বেশি দূরত্ব তা নয়। বার দশেক পৃথিবীকে চক্কর দিয়েছেন যে বৈমানিক তিনি পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়ার চেয়েও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছেন।

তবুও চাঁদে যাতায়াত এখনো পর্যন্ত সহজ নয়। আমেরিকান নভশ্চররা ছ-ছ'বার চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছেন, তবুও কথাটা বলতে হচ্ছে। অ্যাপোলো অভিযানে যে-কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, এবং দুর্ঘটনা ঘটলে ত্রাণকার্যের কোনো পাল্টা ব্যবস্থা ছিল না। অ্যাপোলো-১৩-র দুর্ঘটনা যদি যাবার পথে না হয়ে ফেরার পথে হত তাহলে তিন নভশ্চরকে কিছুতেই বাঁচানো যেত না। কেননা, ফেরার পথে হলে চন্দ্রযানটি সঙ্গে থাকত না, সেটিকে চাঁদেই রেখে আসতে হত। যাবার পথে হয়েছিল বলেই এই চন্দ্রযানে আশ্রয় নিয়ে নভশ্চররা প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন। অ্যাপোলো-১৭-র পরে চাঁদে মানুষ পাঠাবার কর্মসূচী শেষ করে দিয়ে ন্যাসা যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। চাঁদে যদি আরো গোটাকতক অ্যাপোলো অভিযান চলত তাহলে, প্যাট্রিক মূর বলছেন, দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল। তাছাড়া বিজ্ঞানের দিক থেকেও বিশেষ লাভ হচ্ছিল না। প্রতিবারের অভিযানে কিছু মাপজোকের যন্ত্র চাঁদের মাটিতে নতুন নতুন জায়গায় রেখে আসা যাচ্ছিল এবং সেখান থেকে চাঁদের পাথর সংগ্রহ করে আনা হচ্ছিল। কিন্তু তার জন্য বারে বারে চাঁদের মাটিতে মানুষ নামাবার দরকার কি? বিশ্বের বহু বিজ্ঞানীই সেদিন এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছিল, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা লুনা ব্যোমযানকে চাঁদের মাটিতে ধীরে অবতরণ করাচ্ছেন, লুনা থেকে গবেষণা-যান লুনোখোদকে চাঁদের মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছেন, যন্ত্রের সাহায্যে খনন-

কার্য চালিয়ে চাঁদের পাথর লুনাতে তুলে নিয়ে সেই লুনাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনছেন। চাঁদের দেশে যদি এমনিভাবেই অনুসন্ধান চালানো যায় তাহলে এত ঝুঁকি নিয়ে মানুষ পাঠাবার দরকারটা কি ?

প্যাট্রিক মূর বলছেন, প্রশ্নটা এভাবে রাখা ভুল।• হয় এটা, নয় ওটা, এভাবে দেখা একেবারেই ঠিক নয়। দুই-ই দরকার। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা চাঁদের দেশ অনুসন্ধানে দুই দেশের প্রয়াসের কথা বলব।

চাঁদের দেশে রকেট পাঠাবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় আমেরিকায়, ১৭ আগস্ট ১৯৫৮ তারিখে। কিন্তু এই রকেটটি আকাশপথে মাত্র ১৫,০০০ মিটার উঠেই মাটি-ছাড়ার ৭৭ সেকেণ্ড পরে ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

চাঁদের দেশের উদ্দেশে দ্বিতীয় আমেরিকান রকেট যাত্রা শুরু করে ১১ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখে, নাম পায়োনিয়র-১। রকেটটি প্রায় ১,২৮,০০০ কিলোমিটার উঁচুতে উঠে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে যাবার মতো বেগ রকেটটির ছিল না।

প্রায় একমাস পরে ৮ নভেম্বর তারিখে তৃতীয় রকেট পায়োনিয়র-২ চাঁদের দেশের উদ্দেশে পাঠানো হয়। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য এই রকেটটির বেগ ঘণ্টায় ২৫,৬০০ কিলোমিটারের বেশি হতে পারেনি (প্রয়োজন ছিল ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার) মাটি ছাড়ার ৪৫ মিনিট পরেই রকেটটি ফিরে আসে।

চাঁদের দেশে পৌঁছবার ক্ষমতা নিয়ে প্রথম যে রকেট পৃথিবী ছেড়ে চাঁদের দেশের উদ্দেশে রওনা হয় সেটি সোভিয়েত দেশের লুনিক-১। রওনা হবার তারিখ ২ জানুআরি ১৯৫৯। জ্বালানি ফুরিয়ে যারার পরে শেষ পর্বে ওজন ছিল ১৪৭২ কিলোগ্রাম। রকেটটি শেষপর্যন্ত ৬,৪০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে চাঁদকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে এবং সৌরমণ্ডলের নতুন একটি গ্রহ হয়ে উঠেছে। মানুষের তৈরী

এই প্রথম গ্রহের কক্ষ-পরিক্রমা ৪৫০ দিনে। উপবৃত্তাকার কক্ষ, পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় এক-ডিগ্রী কোনাকুনি, কক্ষের উৎকেন্দ্রতা ০·১৪৮, অনুসূর ১৪·৬ কোটি কিলোমিটার, অপসূর ১৯·৭ কোটি কিলোমিটার।

তারপরে আমেরিকান বিজ্ঞানীরাও দুটি কৃত্রিম গ্রহ তৈরি করেছেন—পায়োনিয়র-৪ ও পায়োনিয়র-৫। প্রথমটির যাত্রা শুরু ৩ মার্চ ১৯৫৯ তারিখে, দ্বিতীয়টির ১১ মার্চ ১৯৬০ তারিখে। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে বলার কথা, এটি পৃথিবী থেকে ভিতরের দিকের গ্রহ, তার কক্ষপথ শুক্র ও পৃথিবীর মাঝখানে, কক্ষ-পরিক্রমা ৩১১ দিনে।

তারপরে সোভিয়েত লুনিক-২ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯) ও লুনিক-৩ (৪ অক্টোবর ১৯৫৯)। প্রথমটি চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়ে, দ্বিতীয়টি চাঁদকে চক্কর দেয় এবং চাঁদের বিপরীত দিকের ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠায়।

চাঁদের দেশে তার পরের সাফল্যমণ্ডিত অনুসন্ধান কেপ ক্যানাভেরাল (আমেরিকার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র) থেকে। শেষ তিনটি রেঞ্জার (পৃঃ ১৩২ দ্রষ্টব্য) চাঁদের উপরিতলের অতি চমৎকার ফটো পাঠিয়েছিল। তারপরে লুনা-৯ (৩১ জানুআরি) চাঁদের মাটিতে ধীরে অবতরণ করেছিল এবং তারপরেও পৃথিবীতে তথ্য পাঠিয়ে চলেছিল। এই ব্যোমযানটির চাঁদের মাটিতে ধীরে অবতরণের পরেই একটা কথা খুব শোনা গিয়েছিল যে চাঁদের সাগর এলাকা নাকি এমনই নরম ও গভীর ধুলোয় ঢাকা যে যে-কোনো ব্যোমযান সেখানে নামতে চেষ্টা করলেই ধুলোয় একেবারে ডুবে যাবে। কথাটা যে ঠিক নয় তা বহু পর্যবেক্ষক সেই সময়েই জোর গলায় বলেছিলেন।

তারপরে চাঁদের মাটিতে আরো অনেক ব্যোমযান ধীরে অবতরণ (পৃঃ ১৩২-৩৮ দ্রষ্টব্য) করেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য আমেরিকার পাঁচটি অরবিটার—চাঁদের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে তারা চাঁদের গোটা উপরিতলের ফটো তুলে পাঠিয়েছিল।

চাঁদের মানচিত্র আঁকার যে কাজ গ্যালিলিও শুরু করেছিলেন তা এখানে শেষ হল।

ঠিক এই সময়ে, যখন সকলেরই আশা যে প্রকাণ্ড একটা কিছু ঘটতে চলেছে, চাঁদের দেশে অনুসন্ধানে সোভিয়েত ও আমেরিকান কর্মসূচী ভিন্নমুখী হয়ে গেল। আমেরিকা চাঁদে মানুষ পাঠাক, তার সঙ্গে সোভিয়েতের কোনো প্রতিযোগিতা নেই, সোভিয়েত প্রয়াস নিবদ্ধ থাকল মনুষ্যবিহীন অনুসন্ধানী ব্যোমযান পাঠিয়ে চাঁদের দেশে অভিযানে।

আমেরিকার তিন নভশ্চর সালের বড়োদিন কাটালেন অ্যাপোলো-৮ ব্যোমযানে চাঁদকে চক্কর দিতে দিতে। এমন এক কক্ষে যে চাঁদের উপরিতল থেকে তাঁরা মাত্র ১১০ কিলোমিটার ওপরে ছিলেন।

মে মাসে অ্যাপোলো-১০ ব্যোমযানের অধিনায়ক কর্নেল স্ট্যাফর্ড চন্দ্রযান নিয়ে চাঁদের উপরিতলের ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে নেমে আসেন।

তারপরে ২১শে জুলাই তারিখে চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অ্যালড্রিনের পদার্পণ। প্রথমে আর্মস্ট্রং, পরে অ্যালড্রিন। চাঁদের মাটিতে পৃথিবীর মানুষ প্রথম পা ফেলেছিল গ্রীনউইচ সময় ৯ ঘটিকা ১৫ মিনিটে। সেটি ছিল 'একজন মানুষের পক্ষে ক্ষুদ্র পদক্ষেপ, মনুষ্যজাতির পক্ষে বৃহৎ উল্লম্ফন।'

অন্যদিকে সোভিয়েতের লুনা-১৬ (১২ সেপ্টেম্বর) নতুন যুগের সূচনা করেছিল। মনুষ্যবিহীন এই ব্যোমযানটিকে প্রথমে চাঁদের কক্ষে ঘোরানো হয়েছিল, তারপরে চাঁদের উপরিতলে ধীরে অবতরণ করানো হয়েছিল, তারপরে চাঁদের শিলা উত্তোলন করানো হয়েছিল, তারপরে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

তারপরে লুনোখোদ-১ সহ লুনা-১৭ (১০ নভেম্বর), লুনোখোদ-২ সহ লুনা-২১ (৮ জানুআরি)।

চাঁদের দেশে সোভিয়েত অনুসন্ধানের শেষতমটি হচ্ছে লুনা-২৪

(৯ আগস্ট)। ব্যোমযানটি প্রথমে চাঁদের উপরিতল থেকে ১১০ কিলোমিটার উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষে চাঁদের চারদিকে ঘোরে। তারপরে ১৮ আগস্ট তারিখে চাঁদের মাটিতে ধীরে অবতরণ করে, ২২ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট সেখানে থেকে ১·৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খননকার্য চালায় এবং চাঁদের মাটি ও পাথর সংগ্রহ করে, ১৯ আগস্ট তারিখে চাঁদের মাটি ছেড়ে উঠে আসে এবং পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করে, ২২ আগস্ট তারিখে সাইবেরিয়ায় অবতরণ করে।

অতঃপর কী ?

বর্তমান শতাব্দীতে আমেরিকার পক্ষ থেকে চাঁদের দেশে আর কোনো অভিযান না চলবারই সম্ভাবনা। লুনা ধরনের সোভিয়েত অনুসন্ধান অবশ্যই চলবে। চাঁদের দেশে স-মনুষ্য অভিযানের জন্য আরো উন্নত ব্যোমযান ও রকেট চাই। সম্ভবত বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই নিউক্লিয়র রকেট চালু হবে। তারপরে শুরু হবে চাঁদের দেশে ঘাঁটি নির্মাণের কাজ। পৃথিবী থেকে অন্য কোনো গ্রহে মানুষের যাত্রাপথে চাঁদ হবে একটি মধ্যবর্তী স্টেশন।

মহাকাশ গবেষণার যুগ

৪ অক্টোবর ১৯৫৭ তারিখ থেকে নতুন এক যুগের শুরু। মহাকাশ-গবেষণার যুগ। নভশ্চারণার যুগও বলা চলে। এইদিন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা স্পুৎনিক-১ উপগ্রহকে আকাশে তুলেছিলেন। স্পুৎনিক আমাদের কাছে এই নতুন যুগের প্রতীক।

কৃত্রিম উপগ্রহ

মানুষের তৈরি প্রথম উপগ্রহ স্পুৎনিক-১। আকাশে ওঠে ৪ অক্টোবর ১৯৫৭ তারিখে। ওজন ৯২·৮ কিলোগ্রাম, চক্রবেগ সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার। কক্ষ উপবৃত্তাকার, কক্ষ-পরিক্রমা ৯৫ মিনিটে। অনুভূ ২২৭ কিলোমিটার, অপভূ ৯৪১ কিলোমিটার। প্রায় ১৪০০ বার কক্ষ-পরিক্রমার পরে ৪ জানুআরি ১৯৫৮ তারিখে স্পুৎনিক-১ বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে নেমে আসে ও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

স্পুৎনিক-২ আকাশে ওঠে ৩ নভেম্বর ১৯৫৭ তারিখে। ওজন ৫০৩·১ কিলোগ্রাম, চক্রবেগ সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার। অনুভূ ২২৪ কিলোমিটার, অপভূ ১,৬৬১ কিলোমিটার। কক্ষ-পরিক্রমা ১০৩ মিনিটে। ২৩৭০ পরিক্রমার পরে ১৪ এপ্রিল ১৯৫৮ তারিখে স্পুৎনিক-২ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

স্পুৎনিক-৩ আকাশে ওঠে ১৫ মে ১৯৫৮ তারিখে। ওজন ১৩১৬·২৫ কিলোগ্রাম। অনুভূ ১৯৭ কিলোমিটার, অপভূ ১৮৬৯ কিলোমিটার। কক্ষ-পরিক্রমা ১০৬ মিনিটে। ১০০৩৮ বার পরিক্রমার পরে ৬ এপ্রিল ১৯৬০ তারিখে স্পুৎনিক-৩ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির ব্যাপারে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের প্রথম প্রচেষ্টা ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭ তারিখে। ভ্যানগার্ড-১। ওজন প্রায় ১·৬ কিলোগ্রাম। প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তারপরের প্রচেষ্টা ৩১ জানুআরি ১৯৫৮ তারিখে। এক্স্প্লোরার-১। ওজন ১৩·৮৬

কিলোগ্রাম। সফল প্রচেষ্টা। অনুভূ ৩৪৯ কিলোমিটার, অপভূ ২০৫৪ কিলোমিটার। তারপরে ভ্যানগার্ড-২ (৫ ফেব্রুআরি ১৯৫৮) ও এক্সপ্লোরার-২ (৫ই মার্চ ১৯৫৮) আকাশে তোলার চেষ্টা অসফল। তারপরে পর-পর তিনটি সফল উপগ্রহ—১৭ মার্চ ১৯৫৮ তারিখে ভ্যানগার্ড-৩ (ওজন ১.৪৭ কিলোগ্রাম, অনুভূ ৬৫৪ কিলোমিটার, অপভূ ৩৯২৫ কিলোমিটার), ২৬ মার্চ তারিখে এক্সপ্লোরার-৩ (ওজন ৮.৪ কিলোগ্রাম, অনুভূ ১৯৪ কিলোমিটার, অপভূ ২৭৯৪ কিলোমিটার), ২৬ জুলাই তারিখে এক্সপ্লোরার-৪ (ওজন ১১.৬ কিলোগ্রাম, অনুভূ ২৫১ কিলোমিটার, অপভূ ২২০৮ কিলোমিটার)।

এই ছিল শুরু। তারপরে গত দুই দশকে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এত অজস্র উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন যে একটি একটি করে প্রত্যেকটির শুধু নাম উল্লেখ করতে হলেও মস্ত তালিকা দিতে হয়। আমরা বরং বিভিন্ন ধারার গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করি।

কসমস

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার কসমস আকাশে তোলা হয়েছে। উদ্দেশ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরী পরীক্ষাকার্য চালানো এবং সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধন। প্রথম কসমস উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৬ মার্চ তারিখে।

কয়েকটি কসমস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কসমস-১১০ (২২ ফেব্রুআরি)। উপগ্রহে ছিল দুটি কুকুর। তিন সপ্তাহেরও বেশি কাল ধরে ৩৩০ বার কক্ষ-পরিক্রমার পরে কুকুর সমেত উপগ্রহকে নামিয়ে আনা হয়েছিল।

কসমস-১৮৬ (২৭ অক্টোবর)। এই উপগ্রহ স্বয়ং-চালিত হয়ে কসমস-১৮৮ উপগ্রহের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল।

মহাকাশে এইটিই প্রথম স্বয়ংক্রিয় সম্মিলন বা ডকিং। ৩১ অক্টোবর তারিখে উপগ্রহটিকে নামিয়ে আনা হয়।

কসমস-৬৩৭ । ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় সোভিয়েতের প্রথম ভূ-স্থির উপগ্রহ।

কসমস-৬৯০ । পরীক্ষাধীন জন্তুজানোয়ার ও অন্যান্য জৈব পদার্থ সহ কক্ষপথে স্থাপিত জৈব গবেষণার উপগ্রহ।

প্রোটন-১ (১৬ জুলাই)। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যের জন্য ১৩ টন ওজনের বিশাল উপগ্রহ।

ইলেকট্রন-১ ও ইলেক্ট্রন-২ (৩০ জানুআরি)। একই রকেটের সাহায্যে দুই বিভিন্ন কক্ষে দুটি উপগ্রহ স্থাপন।

মল্‌নিয়া-১ (১৬ জুলাই). প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ। দূরপাল্লার টেলিফোন টেলিগ্রাফ ও রেডিও যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত।

উৎক্ষিপ্ত মল্‌নিয়া ছ-টি, আটটি, সাতটি।

মল্‌নিয়া উপগ্রহগুলোর কক্ষ উপবৃত্তাকার। অনুভূ প্রায় ৫০০ কিলোমিটার, অপভূ প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার। কক্ষতল বিষুবতলের ৬৫ ডিগ্রী কোনাকুনি। কক্ষ-পরিক্রমা ১২ ঘণ্টায়। যোগাযোগ উপগ্রহের জন্য এমনি কক্ষই সবচেয়ে উপযোগী। অপভূ উত্তর গোলার্ধে হওয়ার দরুন প্রতি পরিক্রমায় ৮-৯ ঘণ্টা যাবৎ এমনকি মেরুবৃত্তের ভিতরকার স্টেশনগুলিও এই উপগ্রহকে ব্যবহার করতে পারে।

২৯ জুলাই তারিখে উৎক্ষিপ্ত অষ্টম মল্‌নিয়া উপগ্রহের কক্ষ 'ভূ-স্থির'। উপগ্রহটিও নতুন মডেলের। ৩৫,৮৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষে স্থাপিত। কক্ষতল বিষুবতলের ০ ডিগ্রী ৪ মিনিট কোনাকুনি। কক্ষ-পরিক্রমা ২৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিটে।

মিটিওর-১ (২৬ মার্চ)। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম আবহ অনুসন্ধানী উপগ্রহ।

উৎক্ষিপ্ত মিটিওর তিনটি, দুটি, পাঁচটি

এক্সপ্লোরার পর্যায়ের উপগ্রহ

এক্সপ্লোরার উপগ্রহগুলোকে আকাশে তোলা হয়েছিল কতকগুলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য চালানোর জন্য। বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে ও আয়নমণ্ডলে, চৌম্বকক্ষেত্রে ও মহাকাশে, জ্যোতিষিক ও জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা বিষয়ক ব্যাপারে। এই কারণে নানা উচ্চতায় ও নানাভাবে হেলানো কক্ষে তাদের পরিক্রমার পথ রচনা করা হয়েছিল। নির্মাণকার্যের দিকে থেকে অপেক্ষাকৃত সরল এই উপগ্রহগুলো মারফত ঊর্ধ্বাকাশের অনেক জটিল খবর জানা গিয়েছে। যেমন, এক্সপ্লোরার-১ মারফত ভ্যান অ্যালেন বলয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে, এক্সপ্লোরার-৮ মারফত বায়ুমণ্ডলের বিন্যাস সম্পর্কে, এবং অন্য নানা উপগ্রহ মারফত উল্কাপিণ্ড, তাপমাত্রা ও চাপ, বিকিরণ ও চৌম্বক ক্ষেত্র, পৃথিবীর পরিবেশের ওপরে সৌর তৎপরতার ক্রিয়া, আয়নমণ্ডলের গড়ন ও গামা রশ্মি সম্পর্কে।

ভ্যানগার্ড পর্যায়ের উপগ্রহ

ভ্যানগার্ড উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বর্ষের আমেরিকান কর্মসূচীর কিছুটা রূপায়িত হয়েছিল। ভ্যানগার্ড-১ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৭ মার্চ ১৯৫৮ তারিখে, অপভূ ৩৯২৫ কিলোমিটার, অনুভূ ৬৫৪ কিলোমিটার। এই উপগ্রহ মারফত বিশেষ করে জানা গিয়েছে পৃথিবীর আকার। ভ্যানগার্ড-১ এখনো পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এবং আগামী কয়েক-শো বছর ধরে ঘুরে চলবে। উপগ্রহের সৌর ব্যাটারি চালিত একটি ট্রান্সমিটার থেকে এখনো সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। ভ্যানগার্ড-২ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে, ভ্যানগার্ড-৩ ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দ্বিতীয়টি মারফত

আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য জানা গিয়েছে, তৃতীয়টি মারফত পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ও ভ্যান অ্যালেন বলয় সম্পর্কে।

আন্তঃগ্রহ এক্‌সপ্লোরার

এই পর্যায়ের প্রথমটি উৎক্ষিপ্ত হয় ২৭ নভেম্বর তারিখে। এই উপগ্রহগুলোর সাহায্যে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যেকার মহাকাশে বিকিরণ ও চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা ছিল চাঁদের দেশে স-মনুষ্য অ্যাপোলো অভিযানের প্রস্তুতি।

কক্ষ-পরিক্রমারত জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণ

সংক্ষেপে বলা হয় ও-এ-ও। বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে বিশ্ব-পর্যবেক্ষণের জন্য এই উপগ্রহ। কক্ষ বৃত্তাকার, ৮০০ কিলোমিটার উচ্চতায়। সঙ্গে থাকছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র, ফটোমিটার ইত্যাদি।

অনুরূপ উপগ্রহ আকাশে তোলা হচ্ছে কক্ষ-পরিক্রমারত সৌর পর্যবেক্ষণের জন্য (ও-এস-ও) এবং কক্ষ-পরিক্রমারত ভূ-পর্যবেক্ষণের জন্য (ও-জি-ও)।

ডিস্‌কভারার পর্যায়ের উপগ্রহ

ডিস্‌কভারার-১ উৎক্ষিপ্ত হয় ২৮ ফেব্রুআরি ১৯৫৯ তারিখে। এটি ছিল মেরু থেকে মেরু কক্ষে স্থাপিত প্রথম আমেরিকান উপগ্রহ। তারপরের ছ'টি ডিস্‌কভারার উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়েছে সমুদ্রে বা মধ্য-আকাশে ব্যোমযানের খোলস উদ্ধার করার বিষয়ে পরীক্ষাকার্য চালাবার জন্য। সমুদ্রে প্রথম উদ্ধারকার্যটি সম্পন্ন হয় ১১ আগস্ট ১৯৬০ তারিখে ডিস্‌কভারার ১২ থেকে। মধ্য-আকাশে প্রথম উদ্ধারকার্য সম্পন্ন হয় ১৮ আগস্ট ১৯৬০ তারিখে ডিস্‌কভারার ১৪ থেকে। মহাকাশে মানুষের যাত্রা শুরু হবার আগে এই পরীক্ষাকার্য-গুলো খুবই জরুরী ছিল।

প্রায়োগিক উপগ্রহ

বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে নানাভাবে প্রয়োগ করার জন্য বহু উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়েছে। তার ফলে একদিকে যেমন উদ্দীপনা এসেছে নতুন শিল্পগত প্রক্রিয়া পদ্ধতি ও সামগ্রী সৃষ্টিতে, নিত্যকার জীবনে এসেছে নতুন ব্যাপ্তি, অন্যদিকে সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেবার জন্য, যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য, নৌ-চলাচলে সহায়তা করার জন্য।

এই পর্যায়ের অনেকগুলো উপগ্রহ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যথা, একো, রিলে, সিন্‌কোম, টেলস্টার, টাইরস, নিম্‌বাস ইত্যাদি।

সোভিয়েত ও আমেরিকান, উভয় উপগ্রহের গোড়ার দিককার কয়েকটির উল্লেখ করা হল মাত্র। এই দুটি দেশের সহযোগিতায় অন্য কয়েকটি দেশ থেকেও কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়েছে। বিশ্বে উপগ্রহ-উৎক্ষেপণকারী দেশ বর্তমানে মাত্র সাতটি, ভারতকে নিয়ে। উপগ্রহ উৎক্ষেপণের খরচ এত বেশি, এতই বেশি যে ছোট দেশের পক্ষে বা নির্ধন দেশের পক্ষে এই কাজে হাত দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। অতএব বহুকাল ধরে কৃত্রিম উপগ্রহের জন্য এই দুটি দেশের ওপরেই নির্ভর করে চলতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি যদি থাকে তাহলে এক্ষেত্রেও কোনো কিছুতে আটকায় না। বিষয়টাই এমন যে আন্তর্জাতিক চরিত্র নিতে বাধ্য।

অতঃপর সত্তরের দশকে বহু বহু উপগ্রহ আকাশে উঠেছে—কি সোভিয়েত, কি আমেরিকান। নানা উদ্দেশ্যে নানা উপগ্রহ। সব মিলিয়ে সংখ্যায় সম্ভবত কয়েক হাজার।

মহাকাশে মানুষ

১৫ জুন ১৯৬০ তারিখে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা একটি সাড়ে-চার টন ওজনের ব্যোমযান আকাশে তুলেছিলেন। রকেট বাদ দিয়ে শুধু ব্যোমযানেরই ওজন ছিল সাড়ে-চার টন। অপভূ ৩৬৮ কিলোমিটার, অনুভূ ৩১০ কিলোমিটার। কক্ষ-পরিক্রমা ৯১'২ মিনিটে। ব্যোমযানে যন্ত্রপাতি ছিল দেড় টন ওজনের। একজন মানুষ যাত্রী থাকলে ব্যোমযানের মধ্যে যতো রকমের সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হত, সবই এই ব্যোমযানে ছিল। এমনকি একজন নকল মানুষও ছিল। যাত্রী-ট্রেন রওনা হবার আগে অনেক সময়ে যেমন পাইলট এঞ্জিন রওনা হয়, এই ব্যোমযানের যাত্রাও সেই পর্যায়ের। এ-থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের রকেট-বিজ্ঞান সেই গোড়ার যুগেই কতখানি উন্নত ছিল।

দ্বিতীয় সোভিয়েত ব্যোমযান আকাশে ওঠে ১৯ আগস্ট ১৯৬০ তারিখে, ৪৪৮ কিলোমিটার উচ্চতায় এই ব্যোমযানেও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা প্রথম ব্যোমযানের মতো। তবে এই ব্যোমযানে জীবন্ত যাত্রী ছিল। স্ত্রেল্‌কা ও বেল্‌কা নামে দুটি কুকুর, কয়েকটি ইঁদুরছানা, গাছগাছড়া ও ফসলের দানা। আকাশ-পথে ৬,৯৬,০০০ কিলোমিটার চলার পরে ২১ আগস্ট তারিখে ব্যোমযানটিকে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানের মাত্র সাড়ে-দশ কিলোমিটারের মধ্যে নামিয়ে আনা হয়। ব্যোমযানের যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

তৃতীয় সোভিয়েত ব্যোমযান আকাশে ওঠে ১ ডিসেম্বর ১৯৬০ তারিখে। যাত্রী দুটি কুকুর। ওজন সাড়ে-চার টন। ব্যোমযানটিকে মাটিতে ফিরিয়ে আনা যায়নি, বায়ুমণ্ডলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

চতুর্থ ব্যোমযান আকাশে ওঠে ৪ ফেব্রুআরি তারিখে। ওজন সাড়ে-ছয় টন। অনুভূ ছিল ২২২ কিলোমিটার, অপভূ ৩২৫

কিলোমিটার। কক্ষ-পরিক্রমা নব্বুই মিনিটে। ব্যোমযানটির পরিণতি কী হয়েছে তা জানা যায়নি।

১২ এপ্রিল ও য়ুরি গাগারিন

মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এই তারিখে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি অবশ্য এক লাইনে লিখে ফেলা চলে। সোভিয়েত নাগরিক মেজর য়ুরি গাগারিন সাড়ে-চার টন ওজনের ভোস্তোক-১ ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর ১৭৫ থেকে ৩০০ কিলোমিটার উঁচু দিয়ে ৮৯'১ মিনিটে পৃথিবীর চারদিকে পুরো একবার ঘুরে আবার এই পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন। এমনি ধরনের একটি ঘটনা যে ঘটতে চলেছে তার আয়োজন অবশ্য অনেক দিন ধরেই চলছিল। তবুও, ঘটনাটি যে সত্যি সত্যিই ঘটতে পারে তা যেন বিশ্বের মানুষের ধারণায় ছিল না। এখন ঘটনাটিকে এক লাইনেই লিখে ফেলা যাচ্ছে, তারপরের আরো বড়ো ঘটনা ঘটে যাবার পরে গোড়ার এই ঘটনাটিকে পড়তেও সাধারণ মনে হচ্ছে—কিন্তু সব মিলিয়ে ভাবতে গেলে এখনো অবাক লাগে।

আর সবকিছু ছেড়ে দিলেও, অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন য়ুরি গাগারিন। মাত্র একবছর আগে নকল মানুষ মহাকাশ থেকে ফিরে আসতে পারেনি। মাত্র পাঁচমাস আগে দুটি কুকুর মাটিতে নামবার সময়ে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তবুও তিনি ইতস্তত করেন নি।

ঘটনাটি আরো একবার বলা যাক। ব্যোমযানটির নাম ছিল ভোস্তোক-১, ওজন ছিল সাড়ে-চার টন। মানুষটির নাম ছিল মেজর য়ুরি গাগারিন। কক্ষপথে পৃথিবীকে তিনি প্রদক্ষিণ করেছিলেন মাত্র একবার। আকাশে ছিলেন সবসুদ্ধ ১০৮ মিনিট। দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন ৪১,০০০ কিলোমিটার। য়ুরি গাগারিনই প্রথম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে রকেট উৎক্ষেপণের সময়ে ত্বরণযুক্ত বেগের দরুন যে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে হয়—যার ফলে অনেক সময়ে

মানুষের ওজন যোলগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে—উপযুক্ত অনুশীলনের দ্বারা সেই সহ্যক্ষমতা মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব। আরও প্রমাণ করলেন যে পরবর্তী কালের ভারহীন অবস্থাতেও সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যেতে পারে। য়ুরি গাগারিনই প্রথম মানুষ যিনি অনেক উঁচু থেকে পৃথিবীকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। একটিমাত্র মন্তব্যে তাঁর তখনকার মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছিল। বলেছিলেন, কী সুন্দর এই পৃথিবী! বলেছিলেন, "আমি নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম পৃথিবীর আকার গোল।" আকাশকে কালো দেখেছিলেন, সেখানে ছিল জ্বলজ্বলে তারা। দিগন্তকে দেখেছিলেন অসাধারণ সুন্দর, পৃথিবী যেন নরম নীল আভায় পরিবৃত ছিল। সাধারণ এক বিমান-দুর্ঘটনায় এই যুগ-প্রবর্তক মানুষটি মারা যান।

শেপার্ড ও গ্রিসম

মহাকাশ-অভিযানে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের প্রথম আংশিক সাফল্য মেজর য়ুরি গাগারিনের মহাকাশ-যাত্রার ঠিক তেইশ দিন পরে (৫ মে) যাত্রী—কমাণ্ডার অ্যালান শেপার্ড। যে আধারটিতে তিনি ছিলেন তার সর্বোচ্চ বেগ হয়েছিল ঘণ্টায় ৬,৪০০ কিলোমিটার (সেকেণ্ডে দুই কিলোমিটারেরও কম)। ২০০ কিলোমিটার উঁচু থেকে ফিরে এসেছিলেন। আকাশে ছিলেন ১৬ মিনিট, তার মধ্যে কয়েক মিনিট ভারশূন্য অবস্থায়। যাত্রার শুরুতে তাঁকে এগারো অভিকর্ষের চাপ সহ্য করতে হয়েছিল। ষোল মিনিট পরে তিনি আধার-সমেত আটলান্টিক সমুদ্রের জলের ওপরে নেমে এসেছিলেন। এই ষোল মিনিটের আকাশ যাত্রার জন্য খরচ হয়েছিল চল্লিশ কোটি ডলার।

তারপরে ২১ জুলাই তারিখে একই ধরনের আকাশ-যাত্রা করেছিলেন ভার্জিল আই গ্রিসম। একই ধরনে নেমে এসেছিলেন আটলান্টিক সমুদ্রে।

শেপার্ড্ বা গ্রিসম দুজনের কেউই কক্ষে স্থাপিত হননি। তাঁদের আধার একটি অধিবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল। গোলকীপারের লাথিতে ফুটবল যেমন আকাশে উঠে আবার নেমে আসে, তেমনি। কক্ষে স্থাপন করতে হলে আধারটিকে ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি বেগে ছুট দেওয়াতে হত। আধারের বেগ ছিল অনেক কম। কৃত্রিম উপগ্রহ বলতে আমরা যা বুঝি—শেপার্ডের বা গ্রিসমের আধার কোনো সময়েই তা হতে পারেনি। যতো সামান্যভাবেই হোক, এই ছিল আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মহাকাশ-যাত্রার শুরু।

এইচ তিতোভ

তারপরে যিনি আকাশে উঠেছিলেন ও কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন তিনি সোভিয়েত নাগরিক, নাম তিতোভ। ব্যোমযানের নাম ভোস্তোক-২। আকাশে ওঠার তারিখ ৬ আগস্ট । এবারে একবার নয়, পুরো সতেরোবার কক্ষ-পরিক্রমা। কক্ষপথে অবস্থানের সময় ১৮ ঘণ্টা নয়, ২৫ ৩ ঘণ্টা। দূরত্ব অতিক্রম ৪১,০০০ কিলো-মিটার নয়, ৭,০০,০০০ কিলোমিটার।

অর্থাৎ গাগারিনের চেয়ে তিতোভ সব দিক থেকেই অনেকখানি অগ্রগতি। তিতোভ আকাশে উঠেছিলেন ৬ আগস্ট তারিখে আর নেমে এসেছিলেন ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট পরে। যে কক্ষে আবর্তিত হয়েছিলেন, পৃথিবী থেকে তার সবচেয়ে কাছের দূরত্ব (অনুভূ) ছিল ১৭৭ কিলোমিটার ও সবচেয়ে দূরের দূরত্ব (অপভূ) ২৫৫·৫ কিলোমিটার। গাগারিন ও তিতোভের কক্ষ-পরিক্রমা পৃথিবীর প্রায় গা ঘেঁষে, তড়িতাবিষ্ট কণিকার বলয়ের অনেক নিচু দিয়ে।

প্রোজেক্ট মার্কারি

১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি যাত্রীহীন মার্কারি ব্যোমযানকে পরীক্ষামূলকভাবে আকাশে ওঠানো হয়েছিল। পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল।

একই বছরের ২৯ নভেম্বর তারিখে আরেকটি মার্কারি ব্যোমযান আকাশে ওঠে একটি শিম্পাঞ্জী যাত্রী সমেত। এই ব্যোমযানের আধারটিকে শিম্পাঞ্জী সমেত নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়।

পরের দুটি অভিযান ২০ ফেব্রুআরি ও ২৪ মে তারিখে। অভিযাত্রী ছিলেন লেফটেনেণ্ট কর্নেল গ্লেন ও কমাণ্ডার স্কট কার্পেণ্টার। কক্ষ-পরিক্রমা উভয় ক্ষেত্রেই তিন। গ্লেনের ব্যোমযানের নাম ফ্রেণ্ডশিপ-৭, অনুভূ ১৩৮ কিলোমিটার, অপভূ ২২৬ কিলোমিটার, বেগ ঘণ্টায় প্রায় ২৮,০০০ কিলোমিটার। কার্পেণ্টারের ব্যোমযানের নাম অরোরা-৭।

৩ অক্টোবর তারিখের পঞ্চম অভিযানের নায়ক ছিলেন কমাণ্ডার শিরা। তাঁর কক্ষ-পরিক্রমা ছ-বার।

তারপরে গর্ডন কুপার। ১৫ ও ১৬ মে তারিখে বাইশবার কক্ষ-পরিক্রমা করেছিলেন।

মানুষ যাত্রী সমেত প্রথম যে চারটি ব্যোমযান আমেরিকা থেকে আকাশে উঠেছিল তা বিশেষ একটি প্রকল্পের রূপায়ণ। প্রকল্পটির নাম প্রোজেক্ট মার্কারি। প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল তিনটি: (১) একটি মনুষ্যবাহী ব্যোমযানকে পৃথিবী-পরিক্রমারত কক্ষে স্থাপন, (২) মহাকাশে মানুষের শারীরগত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার পরীক্ষা এবং (৩) যাত্রী ও ব্যোমযানের নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন। প্রকল্পটি রূপায়িত হয়েছে পাঁচ বছরের মধ্যে সাতাশটি প্রধান উৎক্ষেপণের মাধ্যমে।

যুগল পরিক্রমা

মার্কারি প্রকল্প যখন সবে কার্পেণ্টার পর্যন্ত এগিয়েছে সে-সময়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কক্ষপথে দুটি ভোস্তোকের যুগল পরিক্রমা ঘটিয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১১ ও ১২ আগস্ট তারিখে। ১১ তারিখে মহাকাশে যাত্রা করেছিলেন সোভিয়েত নভশ্চর নিকোলায়েভ ও ১২ তারিখে পোপোভিচ।

কক্ষপথে নিকোলায়েভ ছিলেন ৯৪ ঘণ্টা ১২ মিনিট, ৬৪ বার কক্ষ-পরিক্রমায়। মোট দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন ২৬,৪০,০০০ কিলো-মিটার। কক্ষপথে পোপোভিচ ছিলেন ৭০ ঘণ্টা ৬৭ মিনিট, ৪৮ বার কক্ষ-পরিক্রমায়। আর মোট দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন ১৯,৮০,০০০ কিলোমিটার।

দুটি ভোস্তোককে একই কক্ষে স্থাপন করা হয়েছিল। মাঝখানে দূরত্ব ছিল মাত্র ৬·৫ কিলোমিটার। কক্ষপথে এত কাছাকাছি অবস্থানে দুটি ব্যোমযানের পরিক্রমা ঘটিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিকোভ্স্কি ও তেরেশ্কোভা

বছর ঘুরবার আগেই ঘটেছিল ভোস্তোক-৫ ও ভোস্তোক-৬ ব্যোমযানের যুগল-পরিক্রমা। অন্য একটি কারণে এই ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। ভোস্তোক-৬-এ যে-মানুষটি আকাশে উঠেছিলেন ও কক্ষপথে এই পৃথিবীকে আটচল্লিশবার পরিক্রমা করেছিলেন তিনি পুরুষ নন, নারী। নাম ভালেন্তিনা তেরেশ্কোভা। মহাকাশ-জয়ের কীর্তিতে এই বিশ্বে তিনিই প্রথমা। ১৬ জুন তারিখে মস্কো সময় দুপুর সাড়ে-বারোটায় ছ-নম্বর ভোস্তোকের যে-যাত্রা শুরু হয়েছিল তার চিহ্নরেখা পৃথিবীকে আটচল্লিশটি প্রদক্ষিণেই শেষ হয়ে যায়নি, বিশ্বের নারীসমাজকে নতুন মহিমায় ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে। এই অতুলনীয়া নারী কলকাতাতেও এসেছিলেন। তার কিছুকাল আগে নিকোলায়েভের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। মহাকাশ-বিজয়িনী নববধূ অনায়াসেই বাংলার হৃদয় জয় করে-ছিলেন।

তাই বলে কক্ষপথে তেরেশ্কোভার সঙ্গে যুগল-পরিক্রমায় যিনি সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁর কৃতিত্বও কিছুমাত্র ম্লান হচ্ছে না। নাম ভালেরি বিকোভ্স্কি। ভোস্তোক-৫ ব্যোমযানে যাত্রা শুরু করেছিলেন ১৪ জুন তারিখে। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন ৮১ বার,

কক্ষপথে অবস্থান করেছিলেন ১১৯ ঘণ্টা, মোট দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন ৩৩,০০,০০০ কিলোমিটার। তখনো পর্যন্ত এইটিই কক্ষপথে দীর্ঘতম সময়ের অবস্থান।

ভোস্তোকের পরে ভোস্খদ। প্রথমটি ১২ অক্টোবর তারিখে, দ্বিতীয়টি ১৮ মার্চ তারিখে। ভোস্তোকে যাত্রী থাকতে পারত একজন আর ভোস্খদে তিনজন। প্রচণ্ড শক্তিশালী রকেটের সাহায্য না পেলে তিনজন নভশ্চরের উপযোগী ব্যোমযান আকাশে তোলা সম্ভব ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় স্পুৎনিক-১ আকাশে ওঠার সাতবছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে রকেটবিজ্ঞানের কী অগ্রগতি হয়েছিল।

প্রথম যে-তিনজন নভশ্চর একই সঙ্গে ভোস্খদ-১ ব্যোমযানে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁদের নাম কর্নেল ভ্লাদিমির কোমারভ, ডাঃ বোরিস ইয়েগোরভ ও কনস্তানতিন ফেওক্তিস্তোভ।

ভোস্খদ-১ ছিল প্রথম ব্যোমযান যেটিকে ধীরে অবতরণ করানো হয়েছিল (soft landing)। ভোস্তোকের বেলায় নভশ্চরকে ব্যোমযান থেকে বেরিয়ে আসতে হত ও প্যারাস্যুটের সাহায্যে নামতে হত। ভোস্খদকে ধীরে অবতরণ করাবার জন্য রকেট চালিয়ে গতির বিপরীত দিকে ঠেলা সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

ভোস্খদ-২ ব্যোমযানে নভশ্চর ছিলেন দুজন—আলেক্সি লিওনভ ও পাভেল বেলিয়ায়েভ। আলেক্সি লিওনভ ব্যোমযান থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচ মিনিটের জন্য মহাশূন্যে সঞ্চরণ করেছিলেন। পৃথিবীর মানুষের এই প্রথম মহাশূন্যে সঞ্চরণ।

জেমিনি প্রকল্প

জেমিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল দুই-যাত্রীর ব্যোমযানকে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমা করানো ও নভশ্চরদের প্রশিক্ষণ-দান। প্রথম দুটি জেমিনি ব্যোমযানের উৎক্ষেপণ ছিল পরীক্ষামূলক ও মনুষ্যবিহান। তারপরে পর-পর তিনটি জেমিনি ব্যোমযান আকাশে উঠেছিল,

তিনটিই। ২৩ মার্চ তারিখে জেমিনি-৩, ৩ জুন তারিখে জেমিনি-৪, ২১ আগস্ট তারিখে জেমিনি-৫। তিনজোড়া নভশ্চর ছিলেন যথাক্রমে মেজর ভার্জিল আই গ্রিসম ও লেফটেনেণ্ট-কমাণ্ডার জন ডবলু ইয়ং, মেজর জেমস এ ম্যাকডিভিট ও মেজর এডওআর্ড এইচ হোয়াইট, লেফটেনেণ্ট কর্নেল গর্ডন কুপার ও লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডার চার্লস কনরাড।

তিনের কক্ষ-পরিক্রমা ছিল ৩ বার, ৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে। এখানে বিশেষভাবে বলার কথা এই যে প্রতিটি পরিক্রমাতেই ব্যোমযানের কক্ষ পরিবর্তন করা হয়েছিল। চারের কক্ষ-পরিক্রমা ৬২ বার, ৯৭ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে। ৩ জুন তারিখে তৃতীয় পরিক্রমার সময়ে নভশ্চর হোয়াইট ব্যোমযান থেকে বেরিয়ে এসে মহাশূন্যে সঞ্চরণ করেছিলেন। তাঁর শরীর সোনামোড়া দড়ি দিয়ে ব্যোমযানের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আর মহাশূন্যে চলাফেরা করার জন্য তাঁর হাতে ছিল রকেট-পিস্তল। পাঁচের কক্ষ-পরিক্রমা ১২০ বার, ১৯০ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে। মহাশূন্যে এত দীর্ঘ সময় তখনো পর্যন্ত আর কোনো নভশ্চর কাটান নি।

তিনটি ব্যোমযানই আটলান্টিক মহাসাগরে অবতরণ করেছিল।

জেমিনি প্রকল্প এখানেই শেষ নয়, বারো পর্যন্ত চলেছিল। কিছু বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

ব্যোমযান	তারিখ	নভশ্চর	কক্ষ-পরিক্রমা	কক্ষে অবস্থান ঘ. মি.
জেমিনি-৭	ডিসেম্বর ৪-১৮	ফ্রাঙ্ক বোরম্যান জেম্স এ লোভেল	২০৬	৩৩০ : ৩৫
জেমিনি-৬	ডিসেম্বর ১৫-১৬	ওয়াল্টার এম শিরা টমাস পি স্ট্যাফর্ড	১৫	২৫ : ৫১
জেমিনি-৮	মার্চ ১৬	নীল এ আর্মস্ট্রং ডেভিড আর স্কট	৬½	১০ : ৪২
জেমিনি-৯	জুন ৩-৬	টমাস পি স্ট্যাফর্ড ইউজিন এ সেরনান	৪৪	৭২ : ২১

ব্যোমযান	তারিখ	নভশ্চর	কক্ষ-পরিক্রমা	কক্ষে অবস্থান
				ঘ. মি.
জেমিনি-১০	জুলাই ১৮-২১	জন ডবলু ইয়ং মাইকেল কলিন্স্	৪৩	৭০ : ৪৭
জেমিনি-১১	সেপ্টেম্বর ১২-১৫	চার্লস কনরাড (জু) রিচার্ড এফ গর্ডন (জু)	৪৪	৭১ : ১৭
জেমিনি-১২	নভেম্বর ১১-১৫	জেম্স্ এ লোভেল (জু) এডউইন ই অ্যালড্রিন (জু)	৫৯	৯৪ : ৩৫

এরই মধ্যে অনেকগুলো নতুন ব্যাপার ঘটানো হয়েছিল। জেমিনি-৭-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তার ৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে এসে গিয়েছিল জেমিনি-৬। মহাশূন্যে এই ছিল প্রথম 'যোগাযোগ'। জেমিনি-৮ সম্পন্ন করেছিল প্রথম সংযোজন বা ডকিং। জেমিনি-১১ সম্পন্ন করেছিল সংযোজনের পরীক্ষাকার্য। জেমিনি-১২ থেকে নভশ্চর অ্যালড্রিন বেরিয়ে এসে ১২৯ মিনিট মহাশূন্যে সঞ্চরণ করেছিলেন।

এক নতুন পর্যায়ের বহু আসনবিশিষ্ট সোভিয়েত ব্যোমযানের নাম সয়ুজ। ব্যোমযানটি বিশেষভাবে উপযুক্ত একটানা কক্ষ-পরিক্রমণ, কক্ষ থেকে কক্ষে গমন ও কক্ষপথে অন্য ব্যোমযানের সঙ্গে সংযোগ-সাধনের জন্য। সয়ুজ ব্যোমযানের সাহায্যে পৃথিবীর আকাশে বহু বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী অনুসন্ধান চালানো হয়েছে এবং কক্ষ-পরিক্রমাকারী স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে।

সয়ুজ-১ আকাশে ওঠে ২৩ এপ্রিল ১৯৬৭ তারিখে, নভশ্চর ছিলেন ভ্লাদিমির এম কোমারভ। ১৮টি পরিক্রমায় ২৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট আকাশে থাকার পরে সয়ুজ-১ অবতরণ করে। ব্যোমযানটি যখন মাটি থেকে ৭ কিলোমিটার উঁচুতে তখন তার প্রধান প্যারাসুট খোলার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ফিতে জড়িয়ে যাওয়ার দরুন প্যারাসুট খোলে না। প্রচণ্ড বেগে সয়ুজ-১ ভূ-পাতিত হয় এবং কোমারভ মারা যান।

মহাশূন্যে এইটিই প্রথম দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। তার আগে, ২৭ জানুআরি তারিখে, আমেরিকার রকেট-উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে অ্যাপোলো ব্যোমযানে পরীক্ষাকার্য চলার সময়ে তিনজন আমেরিকান নভশ্চর আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন। সেই দুর্ঘটনা রকেট উৎক্ষিপ্ত হবার আগে, মাটিতে।

সয়ুজ-২ কক্ষে স্থাপিত হয় ২৫ অকটোবর তারিখে। এই ব্যোমযানে কোনো নভশ্চর ছিল না। একদিন পরে নভশ্চর গেওর্গি বেরেগোভয়কে নিয়ে আকাশে ওঠে সয়ুজ ৩। কক্ষে স্থাপিত হবার পরে সয়ুজ-৩ রেডিও-সংকেত পাঠিয়ে সয়ুজ-২ ব্যোমযানকে অনুসন্ধান করে এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সয়ুজ-২ ব্যোমযানের দিকে অগ্রসর হয়ে ২০০ মিটারের মধ্যে এসে পৌছয়।

মহাশূন্যে দুই স-মনুষ্য ব্যোমযানের মধ্যে প্রথম সংযোগ বা ডকিং সম্পন্ন হয় ১৬ জানুআরি তারিখে। একটি সালিয়ুৎ-৪, ১৪ জানুআরি উৎক্ষিপ্ত, নভশ্চর একজন—ভি এ শাতালভ। অপরটি সয়ুজ-৫, ১৫ জানুআরি তারিখে উৎক্ষিপ্ত, নভশ্চর তিনজন—বোরিস ভলিনভ, আলেক্সি ইয়েলিসিয়েভ, ইয়েভগেনি খ্রুনভ। কক্ষপথে দুই ব্যোমযান সংযুক্ত হবার পরে শেষোক্ত দুই নভশ্চর সয়ুজ-৫ থেকে সয়ুজ-৪ ব্যোমযানে চলে আসেন ও সেই ব্যোমযানেই মাটিতে নামেন। সয়ুজ-৫ ব্যোমযানে একা নামেন ভলিনভ।

তারপরে সেই সালেই তিনটি ব্যোমযান ও সাতজন নভশ্চর একসঙ্গে কক্ষ-পরিক্রমা করে। অক্টোবরের ১১ তারিখে সয়ুজ-৬, ১২ তারিখে সয়ুজ-৭, ১৩ তারিখে সয়ুজ-৮। নভশ্চর ছয়ে দুজন (গেওর্গি শোনিন, ভালোরি কুবাসভ), সাতে তিনজন (ভিক্তর গেরবাৎকো, আনাতোলি ফিলিপচেঙ্কো, ভ্লাদিস্লাভ ভোলকভ), আটে দুজন (ভ্লাদিমির শতালভ, আলেক্সি এস ইয়েলিসেয়েভ)। এই নভশ্চররা মহাশূন্যে প্রথম ওয়েল্ডিং-কার্য সম্পন্ন করেন। প্রত্যেকের কক্ষ-পরিক্রমা ৭৫ বার, কক্ষে অবস্থান প্রায় ১১৮½ ঘণ্টা।

সয়ুজ-৯ আকাশে ওঠে ১ জুন তারিখে। নভশ্চর ছিলেন

দুজন—আন্দ্রিয়ান জি নিকোলায়েভ ও ভিতালি সেবাস্তিয়ানভ। মহাশূন্যে তাঁরা ছিলেন ২৬৮টি পরিক্রমায় ৪২৪ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট। তখনো পর্যন্ত মহাশূন্যে সবচেয়ে বেশি সময় থাকার এই ছিল রেকর্ড।

তারপরে বিভিন্ন সময়ে আরও তেরোটি সয়ুজ ব্যোমযান আকাশে উঠেছে। কিছু বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

ব্যোমযান	তারিখ	নভশ্চর	মন্তব্য
সয়ুজ-১০	এপ্রিল ২২-২৫	ভ্লাদিমির শতালভ আলেক্সি ইয়েলিসিয়েভ নিকোলাই রুকাভিশ্-নিকভ	সালিয়ুৎ-১ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সং-যোজনের পরীক্ষাকার্য। কক্ষে অবস্থান ৪৭ ঘ ৪৬ মি।
সয়ুজ-১১	জুন ৬-২৯	গেওর্গি দোব্রোভোলস্কি ভ্লাদিস্লাভ ভোলকভ ভিক্তর পাৎসায়েভ	সালিয়ুৎ-১ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সংযোজন. নানা পরীক্ষাকার্য সম্পা-দন। কক্ষে অবস্থান ৫৭০ ঘ. ২৩ মি। অব-তরণের সময়ে দুর্ঘটনায় তিনজন নভশ্চরের মৃত্যু।
সয়ুজ-১২	সেপ্টেম্বর ২৭-২৯	ভাসিলি লাজারিয়েভ ওলেগ মাকারভ	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য। কক্ষে অবস্থান ৪৭ ঘ ১৬ মি।
সয়ুজ-১৩	ডিসেম্বর ১৮-২৬	পিওতর ক্লিমুক ভালেন্তিন লেবেদভ	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও জ্যোতিষিক পরীক্ষাকার্য। কক্ষে অবস্থান ১৮৮ ঘ ৫৫ মি।
সয়ুজ ১৪	জুলাই ৩-১৯	পাভেল পোপোভিচ য়ুরি আর্তিউখিন	সালিয়ুৎ-৩ স্পেস-স্টেশ-নের সঙ্গে সংযোজন। স্পেস-স্টেশনে ১৪ দিন অবস্থান।

ব্যোমযান	তারিখ	নভশ্চর	মন্তব্য
সয়ুজ-১৫	আগস্ট ২৬-২৮	গেনাদি সারাফানভ লেভ দিওমিন	সালিয়ুৎ-৩ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সংযোজনের পরীক্ষাকার্য। কক্ষে অবস্থান ৪৮ ঘ. ১২ মি।
সয়ুজ ১৬	ডিসেম্বর ২-৮	আনাতোলি ফিলিপ্‌চেঙ্কো নিকোলাই রুকাভিশ্‌নিকভ	সয়ুজ-অ্যাপেলো সংযোজনের প্রস্তুতি। কক্ষে অবস্থান ১৪২ ঘ. ২৪ মি।
সয়ুজ-১৭	জানুআরি ১১-ফেব্রুআরি ৯	আলেক্‌সি গুবারেভ গেওর্গি গ্রেচ্‌কো	সালিয়ুৎ-৪ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সংযোজন ও নানা পরীক্ষাকার্য। স্পেস-স্টেশনে অবস্থান ৭০৯ ঘ. ২০ মি।
সয়ুজ-১৮	মে ২৪-জুলাই ২৬	পিওতর ক্লিমুক ভিতালি সেবাস্তিয়ানভ	সালিয়ুৎ-৪ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সংযোজন। নানা পরীক্ষা-কার্য। স্পেস-স্টেশনে অবস্থান ৬৩ দিন।
সয়ুজ-২০	নভেম্বর ১৭ ফেব্রুআরি ১৬	মনুষ্যবিহীন	সালিয়ুৎ-৪ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সংযোজন। কচ্ছপ, পতঙ্গ, উদ্ভিদের বীজ ও উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষাকার্য।
সয়ুজ-২১	জুলাই ৬-আগস্ট ২৪	বোরিস ভলিনভ ভিতালি জোলোবভ	সালিয়ুৎ-৫ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সংযোজন ও নানা পরীক্ষাকার্য। স্পেস-স্টেশনে অবস্থান ৪৮ দিন।

ব্যোমযান	তারিখ	নভশ্চর	মন্তব্য
সয়ুজ-২২	সেপ্টেম্বর ১৫-২৩	ভালেরি বিকোভস্কি ভ্লাদিমির আক্সিওনভ	বিশেষ ক্যামেরায় ২,৪০০ আলোকচিত্র গ্রহণ ও নানা পরীক্ষাকার্য। কক্ষে অবস্থান ৮ দিন।
সয়ুজ-২৩	অক্টোবর ১৪-১৬	ভিয়াচেস্লাভ জুদভ ভালেরি রোজ্দেস্তভনস্কি	সালিয়ুৎ-৫ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সংযোজনের প্রয়াস।

অ্যাপোলো প্রকল্প

আমেরিকান বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বৃহৎ ও সবচেয়ে জটিল প্রকল্পটির নাম অ্যাপোলো। এই প্রকল্প অনুসারে আমেরিকান নভশ্চররা পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেছেন আবার চাঁদ থেকে রওনা হয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন (পৃঃ ১৩২-৩৮ দ্রষ্টব্য)। তার আগে বারোটি জেমিনি ব্যোমযানকে পৃথিবীর কক্ষে পরিক্রমা করিয়ে এই অভিযানের প্রস্তুতি চালানো হয়েছে।

জেমিনি ব্যোমযান ছিল দুই-আসনের, আর অ্যাপোলো ব্যোমযান তিন-আসনের। তিনজন নভশ্চর সহ প্রথম যে আমেরিকান ব্যোমযান পৃথিবীর কক্ষে পরিক্রমা করে তা হচ্ছে অ্যাপোলো-৭ (অক্টোবর ১১-২২)। ওয়াল্টার শিরা, ডন আইজেল ও ওয়াল্টার কানিংহাম এই ব্যোমযানে ১৬৩ বার পরিক্রমা করেছিলেন ও পৃথিবীর কক্ষে ২৬০ ঘণ্টা ৯ মিনিট অবস্থান করেছিলেন।

অ্যাপোলো-৯ ব্যোমযানের (মার্চ ৩-১৩) পরিক্রমাও ছিল পৃথিবীর কক্ষে, ২৪১ ঘণ্টা ১ মিনিটে ১৫১ বার। ব্যোমযানের তিন নভশ্চর—জেম্স ম্যাকডিভিট, ডেভিড স্কট ও রাসেল শ্বাইকার্ট – কক্ষে পরিক্রমার সময়ে চন্দ্রযানটি পরীক্ষা করেন এবং ব্যোমযানের এক অংশ থেকে অপর অংশে গমন করেন।

কসমস ৯৩৬

৩ আগস্ট তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে কসমস ৯৩৬। এটিকে বলা হয়েছে মহাশূন্যে আন্তর্জাতিক জৈব গবেষণাগার। গবেষণার কর্মসূচী রচনা করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, জিডিআর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিশেষজ্ঞরা। উপগ্রহের মধ্যে আছে ইঁদুর, পতঙ্গ, উদ্ভিদ ও উদ্ভিদের বীজ। ভারহীনতা, মহাজাগতিক বিকিরণ, ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা জৈব পরীক্ষাকার্য এই আন্তর্জাতিক জৈব গবেষণারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কসমস ৯৩৬ হচ্ছে ভবিষ্যতে মহাশূন্যে বহু মানুষের বাসোপযোগী স্পেস-স্টেশন নির্মাণের প্রস্তুতি-পর্ব।

ন্যাসার উপগ্রহ

ন্যাসার উদ্যোগে অজস্র 'প্রয়োগগত প্রাযুক্তিক উপগ্রহ' (এ-টি-এস) আকাশে তোলা হয়েছে। অধিকাংশই অন্যান্য দেশের জন্য কিংবা আমেরিকার নানা বেসরকারী কোম্পানীর জন্য।

এ-টি-এস উঠেছে ২৫টি—তার মধ্যে আছে কানাডা, ফেডারেল জার্মানি ও ফ্রান্সের যোগাযোগ উপগ্রহ।

২১ ফেব্রুআরি তারিখে তৈরি হয়েছে নৌ-যোগাযোগকারী উপগ্রহ 'মারিসাৎ-এ'।

সব মিলিয়ে পৃথিবীর আকাশে কত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কত-যে উপগ্রহ তোলা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া শক্ত—হাজার কয়েক তো বটেই।

গ্রহলোকে যাত্রা

একটি ব্যোমযান চাঁদে পাঠানো যতো সোজা, যে-কোনো গ্রহে পাঠানো ততো শক্ত। তার কারণ কোনো গ্রহই পৃথিবীর কাছে নয়। পৃথিবীর থেকে চাঁদ যতো দূরে, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহও তার চেয়ে অন্তত একশো-গুণ বেশি দূরে। তাছাড়া, কোনো গ্রহই চাঁদের মতো পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না—ঘোরে সূর্যের চারদিকে। পৃথিবী রয়েছে সূর্য থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে। একথা মনে রেখে পৃথিবী থেকে দূরত্বের হিসেবে গ্রহগুলোকে সাজিয়ে দেখা যাক :

গ্রহ	পৃথিবী থেকে দূরত্ব (লক্ষ কিলোমিটারে)		অনুসন্ধানী ব্যোমযানের
	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	প্রথম সফল যোগাযোগ
শুক্র	৩৮৪	২,৫৯২	মেরিনার-২
মঙ্গল	৫৪৪	৪,০০০	মেরিনার-৪
বুধ	৭৬৮	৩,১৯২	মেরিনার-১০
বৃহস্পতি	৫,৮৫৬	৯,৬০০	পায়োনিয়র-১০
শনি	১১,৮৮৮	১৬,৪৮০	? পায়োনিয়র-১১
ইউরেনাস	২৫,৬০০	৩১,৩৬০	? মেরিনার
প্লুটো	৪২,৫৬০	৭৯,২০০	? আনুমানিক
নেপচুন	৪২,৮০০	৪৬,৫৬০	? আনুমানিক

আগের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, কোনো গ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে তখনো, আমাদের হাতে যে ব্যোমযান আছে তাই নিয়ে, পৃথিবী থেকে সেই গ্রহের দিকে সরাসরি যাত্রা করা সম্ভব নয়। ব্যোমযানকে যাত্রা করাতে হয় সহজতম অতিক্রমণের পথে। রকেট চালু করা হয় ব্যোমযানকে নিষ্ক্রমণ-বেগে ছুট দেওয়াবার জন্য। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে আসার পরে যদি দেখা যায়

ব্যোমযানের ছুটের বেগ কক্ষপথে পৃথিবীর ছুটের বেগের চেয়ে বেশি তাহলে ব্যোমযান যাত্রা করবে বাইরের গ্রহের দিকে। আর কম হলে ভিতরের গ্রহের দিকে।

এমনিভাবেই সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি ব্যোমযান ভিতরের ও বাইরের গ্রহগুলোর দিকে পাঠিয়েছেন। বেশ কয়েকটি ব্যোমযান সেইসব গ্রহের উপগ্রহ হয়েছে বা সেইসব গ্রহের মাটিতে ধীরে অবতরণ করেছে (পৃঃ ২০৪—০৮ দ্রষ্টব্য)।

আগামী বছরগুলিতেও এমনিভাবে ভিতরের ও বাইরের গ্রহ-গুলোর উদ্দেশে অনুসন্ধানী ব্যোমযান যাত্রা করবে। সম্ভবত লুনোখোদ বা মূনরোভার জাতীয় যানও নামানো হবে। মানুষের পদাপর্ণ আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঘটবে না বলেই মনে হয়।

তবে প্রকৃতি একটা ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। সত্তরের দশকের শেষ দিকে বৃহৎ গ্রহগুলোর অবস্থান এমন হয়ে উঠছে যে একই ব্যোমযান একই যাত্রায় সবকটি গ্রহকে ছুঁয়ে যেতে পারে এবং সেখানে আগের গ্রহের টানের দরুন ব্যোমযানে পরের গ্রহের দিকে ঠেলা পড়বে। বৃহৎ গ্রহগুলোর এমন সুবিধাজনক অবস্থান আগামী ১৮০ বছরের মধ্যে আর ঘটবে না। প্যাট্রিক মূর তাঁর বইয়ে বৃহৎ গ্রহগুলোর সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে একটি গ্র্যাণ্ড টুরের পরিকল্পনা করেছেন। সেটি এই :

সেপ্‌টেম্বর ৪। পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণ।
জানুআরি ২৮। বৃহস্পতির এলাকায় (অতিক্রান্ত সময় ১·৪ বছর)।
সেপ্‌টেম্বর ৩০। শনির এলাকায় (অতিক্রান্ত সময় ৩ বছর)।
জানুআরি ২। ইউরেনাসের এলাকায় (অতিক্রান্ত সময় ৬·৪ বছর)।
নভেম্বর ৮। নেপচুনের এলাকায় (অতিক্রান্ত সময় ৯·২ বছর)।

শুধু এই দশ বছরে নয়, আগামী পঞ্চাশ বছরে মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে কী কী ঘটতে পারে তারও একটি ছক প্যাট্রিক মূর তাঁর বইয়ে উপস্থিত করেছেন। সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন আঠারো বছরে তাৎপর্যপূর্ণ কী কী ঘটেছে। শেষের তালিকায় আরও দুটি যোগ করে পুরো ছকটি তুলে দিচ্ছি।

কী কী ঘটেছে

স্পুৎনিক-১ ও নভশ্চারণার যুগ শুরু।
চন্দ্রে প্রথম অনুসন্ধানী ব্যোমযান : সোভিয়েত লুনিক।
মহাকাশে প্রথম মানুষ : য়ুরি গাগারিন।
প্রথম সাফল্যমণ্ডিত গ্রহ-অনুসন্ধানী ব্যোমযান : শুক্রগ্রহে মেরিনার-২।
প্রথম সাফল্যমণ্ডিত যোগাযোগ উপগ্রহ : টেলস্টার।
চন্দ্রের উপরিতলের প্রথম সুস্পষ্ট আলোকচিত্র : অরবিটার।
মঙ্গলে প্রথম সাফল্যমণ্ডিত অনুসন্ধানী ব্যোমযান : মেরিনার-৪।
চন্দ্রে প্রথম সাফল্যমণ্ডিত ধীর অবতরণ : লুনা-৯।
চন্দ্র পরিক্রমায় প্রথম স-মনুষ্য ব্যোমযান : অ্যাপোলো-৮।
চন্দ্রে মানুষ : অ্যাপোলো-১১ ব্যোমযানে আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন।
মনুষ্যহীন ব্যোমযানের চন্দ্রে ধীর অবতরণ, শিলা সংগ্রহ পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন : লুনা-১৬।
প্রকৃত সাফল্যমণ্ডিত প্রথম স্পেস-স্টেশন : স্কাইল্যাব।
বৃহস্পতির এলাকায় প্রথম অনুসন্ধানী ব্যোমযান : পায়োনিয়র-১০।
কাছের থেকে তোলা শুক্র ও বুধের প্রথম আলোকচিত্র : মেরিনার-১০।
বৃহস্পতির একালায় দ্বিতীয় ব্যোমযান : পায়োনিয়র-১১।
মহাশূন্যে সোভিয়েত-আমেরিকান ব্যোমযানের প্রথম মিলন : অ্যাপোলো-সয়ুজ।

মনুষ্যহীন ব্যোমযানের শুক্রে ধীর অবতরণ এবং আলোকচিত্র গ্রহণ: ভেনাস-৯ ও ১০।

মনুষ্যহীন ব্যোমযানের মঙ্গলে ধীর অবতরণ: ভাইকিং-১ ও ২।

কী কী ঘটবে

শুক্রে আঁরও ব্যোমযানের ধীর অবতরণ।

শাট্‌ল-ব্যোমযানের পরীক্ষাকার্য।

মঙ্গলে আরও ব্যোমযান ও মঙ্গলের মাটিতে বিচরণকারী যান।

শনির এলাকায় প্রথম ব্যোমযান: পায়োনিয়র-১১।

বৃহস্পতির এলাকায় নতুন মেরিনার ব্যোমযান।

চন্দ্রের মেরু-কক্ষে উপগ্রহ স্থাপন।

শনির এলাকায় দ্বিতীয় বার ব্যোমযান।

কী কী ঘটতে পারে

এন্‌কের ধূমকেতুতে অনুসন্ধান।

বৃহস্পতির কক্ষে উপগ্রহ।

মঙ্গলে ব্যোমযানের ধীর অবতরণ, নমুনা সংগ্রহ এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন।

শুক্রের উপগ্রহ।

বুধের উপগ্রহ।

পৃথিবীর কক্ষ-পরিক্রমাকারী প্রথম স্থায়ী স্পেস-স্টেশন।

চন্দ্রে সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় স্টে নসমূহের সক্রিয়তা।

বুধে অনুসন্ধানী ব্যোমযানের ধীর অবতরণ।

হ্যালির ধূমকেতুতে অনুসন্ধান।

নেপচুন ও প্লুটোর এলাকায় ব্যোমযান।

পৃথিবীর উপগ্রহ-ব্যবস্থায় পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়তা—আবহাওয়া, যোগাযোগ, অনুসন্ধান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে। একাধিক স-মনুষ্য স্পেস-স্টেশন।

চন্দ্রে পুনরায় মানুষ।

চন্দ্রে মানুষের দীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান।

চন্দ্রে প্রথম ঘাঁটি।

চন্দ্রে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে বৃহদাকার ঘাঁটি।

গ্রহাণুর এলাকায় অনুসন্ধান।

মঙ্গলে উপকরণ ও যন্ত্রপাতি মজুদকরণ।

মঙ্গলে প্রথম ঘাঁটি।

সৌরমণ্ডলের বাইরে

মানুষের তৈরী একটি ব্যোমযান ইতিমধ্যেই সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকে যাত্রা করেছে। সেটি পায়োনিয়ার-১০।
শেষদিকে এই ব্যোমযানটি বৃহস্পতি গ্রহকে অতিক্রম করে গিয়েছে, এখন চলেছে সৌরমণ্ডলকে অতিক্রম করে মহাশূন্যের দিকে। সেখানে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি—উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতেই থাকবে যতোদিন না মহাজাগতিক কোনো বস্তুর সঙ্গে সজ্ঘর্ষে ধ্বংস হয়।

তবুও বলা দরকার, সৌরমণ্ডলের বাইরে অন্য কোনো তারার গ্রহমণ্ডলের কোনো এক গ্রহে ব্যোমযান পাঠানো এতই শক্ত ব্যাপার যে এখনো পর্যন্ত অনেকটা অসম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে। আমরা দেখছি, ঘরের কাছে চাঁদে ব্যোমযান পাঠাতে হলেও কত সূক্ষ্ম হিসেব দরকার। তারপরেও কিন্তু মাঝপথে গতিমুখ সংশোধন করতে হয়, নইলে ব্যোমযান চাঁদের বহুদূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। আর কোনো গ্রহের বেলায় তো এই হিসেব আরো অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও অতিমাত্রায় জরুরী। সেখানে এক সেকেণ্ড এদিক-এদিক হলেও ব্যোমযান ও নির্দিষ্ট গ্রহের মধ্যে কয়েক লক্ষ কিলোমিটারের ব্যবধান ঘটে যায়।

দূরের কোনো গ্রহের বেলায় ব্যোমযানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটাই বড়োরকমের সমস্যা। যেমন, প্লুটোর কাছাকাছি কোনো ব্যোমযান থেকে পৃথিবীতে রেডিও-বার্তা পৌঁছতে সময় লাগার কথা পাঁচ ঘণ্টারও বেশি। সেই বার্তা পাবার পরে যদি মনে হয় ব্যোমযানের গতিমুখ সংশোধিত হওয়া দরকার তাহলে পৃথিবী থেকে সেই বার্তা

ব্যোমযানে পৌঁছতেও অনুরূপ সময় নেবে। আর সৌরমণ্ডলের বাইরে নিকটতম তারার দেশেও যদি ব্যোমযান পাঠাতে হয় তাহলে সেখান থেকে পৃথিবীতে রেডিওবার্তা পৌঁছতে সময় লাগে চারবছরেরও বেশি।

আর মানুষের সশরীরে যাত্রা?

সেখানে আমাদের নির্ভর হচ্ছে রকেট, যার বেগ সেকেণ্ডে ১১˙২ কিলোমিটারের মাত্রা ছাড়িয়ে কিছুটা হয়তো তোলা যায়। তাই নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ শুক্রে যেতেও মেরিনার-২ সময় নিয়েছে একশো সাড়ে-নয় দিন, দূরত্ব পার হয়েছে প্রায় ত্রিশকোটি কিলোমিটার। তাও আবার যে-কোনো সময়ে রওনা হওয়া চলে না, দিনক্ষণের বাছাবাছি আছে—যা নির্ভর করে মহাকাশে পৃথিবী ও শুক্রের বিশেষ অবস্থানের ওপরে। যাত্রার পক্ষে দুই গ্রহের অবস্থানগত অনুকূল অবস্থাটি পাওয়া যায় প্রতি উনিশ মাস পরে-পরে একবার। কাজেই শুক্রগ্রহে যাবার পরে আবার ফিরে আসার জন্য উনিশ মাস অপেক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে। শুক্রগ্রহের বেলাতেই এই, দূরের কোনো গ্রহে যেতে হলে আরো অনেক অনেক বেশি সময় লেগে যায়। নিচে একটা হিসেব দেওয়া হল:

গন্তব্য গ্রহ	যাত্রা শুরুর বেগ (কি.মি./সে.)	অতিবাহিত সময় (শুধু যাওয়ার জন্য)
বৃহস্পতি	১৪˙২	২ বছর ২৫০ দিন
শনি	১৫˙২	৬ বছর ১৮ দিন
ইউরেনাস	১৫˙৯	১৬ বছর ১৪ দিন
নেপচুন	১৬˙২	৩০ বছর ২১৫ দিন
প্লুটো	১৬˙৩	৪৫ বছর ১৪৯ দিন

এখনো পর্যন্ত আমাদের হাতে যে-ধরনের রকেট আছে তাই নিয়ে সৌরমণ্ডলের গ্রহ প্লুটোতে যেতে হলেও এক পুরুষের আয়ু দরকার।

আর যদি পৃথিবীর নিকটতম তারার দেশে যেতে হয়? এই রকেটে? তাহলে সময় লাগার কথা অন্তত পক্ষে আশিহাজার বছর।

আশিহাজার বছর! মানুষের আয়ু একশো বছর হলে তাকে অন্তত আটশো বার নতুন করে জন্মাতে হবে। এই হিসেবটি মনে রাখলে মনে হতে পারে, তারার দেশে যাত্রার কথা বলাটা এখনো হাসির ব্যাপার।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই হাসির ব্যাপারটা নিয়েও গুরুগম্ভীর আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞানীদের মতে, তিনভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। একটি সাধারণ বুদ্ধির সমাধান। বলা হয়েছে যে আশি হাজার বছরই যদি মহাকাশে কাটাতে হয় তাহলে একদল মেয়েপুরুষ একসঙ্গে যাত্রা শুরু করুক। আটশো পুরুষ ধরে মহাকাশেই তাদের জন্ম ও মৃত্যু হোক। এইভাবে বংশানুক্রমের বিপুল একটি ধারা পার হয়ে কেউ না কেউ শেষপর্যন্ত নক্ষত্রলোকে পৌঁছতে পারবেই। তারপরে একই ইতিহাস পার হয়ে কেউ না কেউ আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেই।

বলা বাহুল্য, এই সমাধানটি নিতান্তই সাধারণ বুদ্ধির, এতে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার কোনো পরিচয় নেই।

অন্য দুটি সমাধান যেমন চমকপ্রদ তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

বলা হয়েছে, নক্ষত্রলোকে মানুষ যাত্রা করবে এমন একটি রকেটের যাত্রী হয়ে যার বেগ হবে আলোর বেগের প্রায় সমান। আলোর বেগ ঘণ্টায় প্রায় তিনলক্ষ কিলোমিটার। এই দুর্ধর্ষ বেগে একটি রকেট ধাবিত হচ্ছে ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। বিজ্ঞানীরা কিন্তু ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন এবং আলোর প্রায় সমান বেগে ধাবমান এই রকেটটির নাম দিয়েছেন ফোটোন রকেট।

একদল বিজ্ঞানী বলেছেন, আজকের দিনের রকেটের যাত্রী হয়েই মানুষ নক্ষত্রলোকে যাত্রা শুরু করতে পারে—তবে বিশেষ একটি শারীরিক ব্যবস্থায়, যাকে বলা হয় জীবন্মৃত অবস্থা। মানুষের শরীরকে যদি ক্রমেই শীতল করা যায় তাহলে শেষপর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় পৌঁছনো চলে যখন তার শরীরের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ

প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থারই নাম জীবন্মৃত। নক্ষত্রলোক-গামী রকেটের কামরায় রক্ত-মাংসের শরীরের যাত্রীকে রাখা হবে এমনি জীবন্মৃত অবস্থায়। তার শরীরের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। হাজার, লক্ষ বা কোটি বছর পরে রকেটের গন্তব্যে পৌঁছবার পরে ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় জাগিয়ে তোলা হবে তাকে।

ফোটোন রকেটের ব্যাপারটি আরো কৌতূহলোদ্দীপক।

মনে করা যাক একটি ফোটোন রকেট পৃথিবী থেকে লুব্ধক তারার দিকে যাত্রা করেছে। রকেটটির বেগ একটু কম করেই ভাবা যাক, আলোর বেগের এগারো ভাগের দশ-ভাগ, অর্থাৎ সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটারের এগারো-ভাগের দশ-ভাগ, অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় ২,৭৩,০০ কিলোমিটার। ফোটোন রকেট নিয়ে যে-সব বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন তাঁদের ধারণা, এগারো-ভাগের দশ-ভাগ কেন, একশো-ভাগের নিরানব্বুই-ভাগ বা হাজার-ভাগের নশোনিরানব্বুই-ভাগ বা আলোর বেগের আরো কাছাকাছি মাত্রার বেগ অর্জন করা ফোটোন রকেটের পক্ষে অসম্ভব নয়। যাই হোক, আমরা অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার বেগটিকেই ধরে নিচ্ছি।

এবার মনে করা যাক. পৃথিবীর একজন মানুষ এই ফোটোন রকেটটির যাত্রী। তা: বয়স কুড়ি। এই মানুষটি যখন লুব্ধক তারায় পৌঁছবে তখন পৃথিবীর হিসেবে পঞ্চান্ন বছর পার হয়েছে। অর্থাৎ রকেটের মানুষটির বয়স হওয়া উচিত পঁচাত্তর।

তা হয় না। মানুষটির মনে হয়, ইতিমধ্যে মাত্র এগারোটি বছর পার হয়েছে। এগারোটি বছর পার হয়েছে শুধু ঘড়ি বা ক্যালেণ্ডারের হিসেবে নয়, শারীরিক দিক থেকেও। অর্থাৎ, একত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছলে চুল দাঁত ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি মিলিয়ে মানুষটির শরীরের যে-অবস্থা দাঁড়াত, সে রয়েছে ঠিক সেখানেই। মানুষটি যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে? তাহলে পৃথিবীর মানুষের হিসেবে আরো পঞ্চান্নটি বছর পার হবার কথা। অর্থাৎ তার বয়স এবারে হওয়া উচিত ছিল একশো-ত্রিশ। কিন্তু সে এসে পৌঁছয় বেয়াল্লিশ বছর

বয়সের শরীরটি নিয়ে। তার রওনা হওয়ার দিন যে মানুষটির জন্ম হয়েছিল সে খুব সম্ভব তখন আর বেঁচে নেই। আর যদি ঘটনাচক্রে বেঁচেও থাকে তার বয়স হয়েছে একশো দশ!

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন, আলোর বেগের যতো কাছাকাছি বেগে রকেটটি ছুটতে পারবে, পৃথিবীর হিসেবে মানুষটির পরমায়ুও ততো বাড়বে। এমনিভাবে চলতে চলতে রকেটের বেগ এমন মাত্রাতে পৌঁছতে পারে যখন এই ভাগ্যবান মানুষটির পক্ষে লক্ষ বা কোটি জীবনের পরমায়ু লাভও অসম্ভব নয়।

এসবই কল্পনা। কিন্তু আগেই বলেছি, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কল্পনার চেয়েও চমকপ্রদ হচ্ছে বাস্তব। হয়তো এখন আমরা যা কল্পনাও করতে পারছি না, তাও ঘটবে। তবে যাই ঘটুক না কেন এটুকু ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে করা চলে যে স্থান ও কালের বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির দিনটি আসন্ন। এই ভবিষ্যতের চিন্তা করলে মনে হয়, আমরা এই বিশ শতকের মানুষরা সবে যেন শৈশবের দিনগুলো পেরিয়ে বাইরের জগতের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছি। এতদিনে যেন আমরা জানতে পেরেছি কোথায় আমাদের জায়গা, কতটুকু তার পরিসর, আর কী বিপুল এই বিশ্ব। কিংবা এখনো হয়তো সবটুকু জানতে পারিনি—যতোই জানব ততোই আরো বেশি বেশি জানতে হবে। ষোলো শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথম জেনেছিলেন যে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে না। সেই জানার মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। কিন্তু সেই জানার যে শেষ কোথায় তা তখন কেউ কল্পনা করতে পারেনি। তার পরের তিনশো বছরে মানুষ আরো অনেক কিছু জেনেছে—এমনকি এই গ্রহের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হবার স্বপ্নও দেখেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই তিনশো বছরের জানাটাও নভশ্চারণার যুগের জানার তুলনায় সামান্য। আমাদের জানার শেষ নেই আর মানুষ হিসেবে এই তো আমাদের মহিমা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "নক্ষত্র-জগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই

গ্রন্থপঞ্জী

(যে-সব বই থেকে বিশেষভাবে সাহায্য নিয়ে এই বইটি লেখা)

1. The Stars in their Courses—James Jeans
2. Life on other Worlds—H. Spencer Jones
3. The Universe—A. Oparin and V. Fesenkov.
4. A Theory of Earth's Origin—O. Schmidt
5. The Origin of the Earth and Planets—Boris Levin
6. Astronomy for Entertainment—Y. Perelman
7. Meteors—V. Fedynsky
8. The Creation of the Universe—George Gamow
9. Solar Physics—A. Severny
10. Rays from the Depths of Space—G. Zhdanov
11. The Sleep Walkers—A. Questler
12. Astronomy Explained—A. E. Fanning
13. Astronomy—Patrick Moore
14. The Planets—Patrick Moore
15. Astronomy and Spaceflight—G. A. Chisnall & Gilbert Fielder
16. The Background of Astronomy—Henry C. King
17. Basic Astronomy—H. Haysham
18. Paths of the Planets - R.A.R. Tricker
19. Every man's Astronomy—Edited by R. H. Stoy
20. Introducing Astronomy—J. B. Sidgwick
21. Astronomy Today—Fred Hoyle
22. Astronomy—Callin A. Ronan
23. Astronomy for O. Level—Patrick Moore
24. The Sun and the Amateur Astroner—W. M. Boxter
25. The Radio Universe—J. S. Hey
26. The Voyages of Apollo—Richard S. Lewis
27. Man on the Moon—John M. Mansfield
28. Space Biology—C. F. Stoneman
29. বিজ্ঞানের ইতিহাস—সমরেন্দ্রনাথ সেন

নির্ঘণ্ট